প্রকাশক :

শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি.

২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর :

শ্রীমোদনারায়ণ দাস

মুদ্রক মণ্ডল লিঃ

১১৪, ১১৬, বলরাম দে স্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদভূষণ :

মনীন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

মোহন প্রেস

করিশ চার্চ লেন,

কলিকাতা—৯

ভাদ্র, ১৩৬৪

ঝড় আর যুদ্ধ। একটি প্রাকৃতিক আর-একটি রাজনীতিক দুর্যোগ। দুয়েরই সংজ্ঞা এক—একটি আর একটির রূপক। প্রকৃতির ভাঙচুর ঝড়, যুদ্ধ সমাজের। সে পুরানো মূল্যমান ভেঙেচুরে দেয়, নতুন মূল্যমান সৃষ্টি করে। আর তা চারিয়ে পড়ে সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে। চীনে সেদিন এমনি ঝড় এসেছিল। সে জাপানী যুদ্ধের ঝড়, পীত ঝড়। চ্যাঙ-শাসনের নির্যাতন-নিপীড়ন তার সঙ্গে মিশে তাকে করে তুলেছিল আরো ভয়াল। সেদিন চীনা মানুষ দলাদলির পালা শেষ করে, যত বিরোধ গোর-চাপা দিয়ে এসে জমায়েৎ হয়েছিল কুওমিনতাঙের নীল ঝাণ্ডার তলায়। তাদের সে নির্দেশ দিয়েছিল মানবতা মন্ত্রের পুরোহিত চীনা গোর্কি লুসুনের অন্তিম বাণী :—চীনের আজ আর কোনো সমস্যাই নেই, জাতীয় জীবন রক্ষা করতে হবে এই একমাত্র সমস্যা। সেই বাণী শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন শিল্পীরা। তাঁরা সাংহাই আর পিকিং-এর আকাশচুম্বী মিনার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, ছড়িয়ে পড়েছিলেন সারা চীনে। বনে-জংগলে প্রতিরোধ-সংগ্রামীর আশ্রয়ে, সৈন্যদলে, চাষীর পর্ণকুটীরে, শত্রুর এলাকার অন্তরালে তাঁদের ঠাঁই হয়েছিল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সংকীর্ণতা খসে পড়েছিল, এসেছিল নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন উপলব্ধি। যুদ্ধের হাঁপরে ঢালাই হয়ে, গালাই হয়ে সে জন্ম দিয়েছিল নতুন সাহিত্য। সাহিত্যিক কুয়োমোজো যে সাহিত্যের কথা বলেছিলেন ১৯২৫ সালে, এ সেই সাহিত্য। এ সাহিত্য বাস্তব, আবার চীনের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

এ সাহিত্যের এক মহতী সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তিয়েনচুন-এর **Village in August**-এ। এ এক যুদ্ধকাব্য (ব্যাপক অর্থে), খণ্ড হোক, ছিন্ন হোক, তবু উত্তর চীনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই কাব্য চীনের মানুষকে মিলিয়ে দিয়েছিল প্রতিরোধ সংগ্রামে।

তাঁরই পরিপূরক হিসেবে এলেন লা-[illegible]

লা-অ-চা-অ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজিবী শিল্পী, কিন্তু সরকারী নির্যাতন তাঁকে নিচুতলায় উপিয়ে নিয়ে গিছলো, যুদ্ধ তাঁকে মিলিয়ে দিয়েছিল জনগণের সঙ্গে। তিনি তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন বলেই তাঁর মাথার উপর ঝুলছিল সরকারী পুরস্কার, মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা। তিনি অন্তরালে বসে নিজের কাজ তবু করে চলেছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে লেখা হোল ইয়াং-চে-ফু (রিক্সাওয়ালা); যুদ্ধের শান্তিপর্বের শুরুতেই সে বই বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়ে সাড়া জাগালো দুনিয়ায়। অবাক হোলো মানুষ—এ কোন চীন? মার্কিনী পার্লবাকের বইয়ের পাতার চীন তো নয়, চীন তো নয় চীনা সাহেব লিন ইউ তাং-এর রচনার। এ যে খাঁটি চীনার চীন—অসমাপ্ত বিপ্লবের ধোঁয়া-চোয়ানো চীন—মহা চীন (আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা স্যাটারডে রিভিউ অফ লিটারেচারের এই অভিমত)।

রিক্সাওয়ালা নিচু নগরের পাঁচালী। শুধু নিচু নগর, নেই সেখানে বিভিন্ন স্তরের কাহিনী। কিন্তু শিল্পী সে আফশোষ রাখেননি। 'নগরীতে ঝড়'-এ তিনি এনে হাজির করলেন সারা চীনকে। একটা গলি হয়ে আছে সে চীনের প্রতীক। জাপানী যুদ্ধের ঝড় বইছে। গলি টলমলো, সমাজ টলমলো। বৃদ্ধ কবির গজদন্তের গম্বুজ ঝড়ে ধসে পড়লো, তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন; তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পেল নতুন মূল্যবোধ। মেরাপ-বাঁধিয়ে, রিক্সাওয়ালা, পরামাণিক সবাই হাঁতড়ে হাঁতড়ে খুঁজছে মূল্যমান—আঁকড়ে ধরতে চাইছে, দেশাত্মবোধে সবাই উদ্দীপ্ত। কেউ বা ঘর ছাড়লে, কেউ বা প্রাণ দিলে, কেউ আবার দৈনন্দিন সংসারের জোয়াল কাঁধে বইতে লাগলো; সাংসারিক বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দিলে সংগ্রামের প্রেরণাকে। কেউ বা দেশের এই অপমানের ভিতরে সৌভাগ্যের সোজা সড়ক বেছে নিলে জাপ-তাঁবেদারিতে; গোয়েন্দাগিরি করলে। কেউ বা তাঁবেদারি নিলে চরিত্রের দুর্বলতায়, অবস্থার ফেরে। কিন্তু এতো শুধু কাহিনী নয়, জীবন্ত এক দলিল—সেদিনের চীনের ইতিহাস। এ ইতিহাস সামাজিক বাস্তবতায় ভাস্বর,—চীনের এক 'মহাভারত'।

এই 'মহাভারতে'র ভাষাও অপূর্ব। ইংরাজী অনুবাদে তার আমেজটুকু বজায় রেখেছেন বিদেশী অনুবাদক। বাংলায়ও বজায় রাখার চেষ্টা করা হোলো। জনগণের মুখের কথা পাই-হুয়াকে লুস্যুন ঠাঁই দিয়েছিলেন সাহিত্যের দরবারে। অভিজাত মানুষের মরা ভাষা সেদিন খসে পড়েছিল তার সবখানি বিকৃতি নিয়ে। সেই পাই-হুয়ার এক 'আশ্চর্য খেল' আজ দেখাচ্ছেন চীনের

শিল্পীরা। লা-অ-চা-অ তো তাঁদেরই একজন। তাঁর হাতে এই ভাষা কোথাও যেন শাণিত ঝলক তুলে ছুটে চলেছে, কোথাও বা সে শল্যবিদ হয়ে মানুষকে কাটাই-ফাঁড়াই করছে, কোথাও বা সে গর্জে উঠছে, আবার বিদ্রূপে হুল ফোটাচ্ছে; কোথাও আবার সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। এক কথায় এ তো ভাষা নয়, চীনের জনগণ এসে উজাড় করে দিয়েছেন তাঁদের সত্তার উৎস-মুখ, বলেছেন নিজেদের কথা—শিল্পী হয়েছেন তাঁদেরই কমলচী। মহৎ সাহিত্যের সেই তো নিরিখ, আর তাইতো তিনি সার্থক, আর সার্থক তাঁর সৃষ্টি।

লা-অ-চা-অ-এর দেশে পীতঝড় কবে থেমে গেছে। চ্যাঙ-সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নের পালাও শেষ। বিপ্লবের অগ্নিশুদ্ধি এনেছে নতুন দিন। সেই নতুন দিনের কথা লিখছেন লা-অ-চা-অ। তাঁর সেই লেখার আশায় আমরা পথ চেয়ে আছি। তাঁর কলম যেমন নির্জিত জাতির ব্যথাকে দিয়েছে অমর সম্মান, তেমনি তার নব-জাগরণকেও দিক—এই আমাদের কামনা।

অশোক গুহ

পুঃ—অনুবাদক হিসাবে একটি কৈফিয়ৎ এখানে পেশ করছি। ইংরেজী অনুবাদে বইটির নাম ছিল 'পীতঝড়' (The yellow storm), বাংলা অনুবাদে নামটি তেমন খাপ খায় না, যুতসই হয় না, তাই পিকিং-এর যে গলিতে এই মহা নাটকের অভিনয়, তারই নামে এর প্রথম সংস্করণের নামকরণ হয়েছিল 'খুদে খাটালের গলি'। কিন্তু নতুন সংস্করণে নামটা পালটেই দেওয়া হ'ল। কারণ, 'ঝড়টাই' এখানে বড় কথা। এ ঝড়ে মূল্যমান বদলে যায়, পলিস্তর পড়ে জমিতে। এ ঝড় সাক্ষাৎ ক্রান্তি না হলেও ক্রান্তিকারী। তাই ঝড়ের স্বরূপ স্মরণ করেই নাম পালটে দিলাম। এ অধিকার মৌলিক লেখকের যেমন আছে, অনুবাদকর্তারও তেমনি আছে বইকি। আশা করি, রসিক-সুজনের দরবারে নামটি গ্রাহ্য হবে।

এক

বুড়ো দাদু চি কাউকে ভয় পান না। শুধু আশী বছরের জন্মতিথির উৎসব হবে না এই যা তাঁর ভয়। তাঁর যখন তাকদ ছিল, তখন তিনি মিত্র-শক্তির আট-আটটি জাতিকে পিপিং-এ চড়াও হতে আর ঢুকতেও দেখেছেন। তারপরে মাঞ্চু-সম্রাটকে দেখেছেন সিংহাসন ছাড়তে; আর তারপরে তো অন্তঃসংঘর্ষের আর শেষই ছিল না। হঠাৎ নগরের ফটক বন্ধ হয়ে গেল, রাইফেল আর কামানের শব্দের দিনরাতে আর কামাই নেই! আবার হঠাৎ একদিন ফটকগুলি খুলে গেল, সদর সড়ক দিয়ে বিজয়ী সময়-নায়কের দল বড় বড় গাড়ি আর মস্ত মস্ত ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটে পালালেন।

না, যুদ্ধের ভয় বুড়ো দাদুর নেই; শান্তির সময়ে একেবার অতিরিক্ত সুখে গা ঢেলে তিনি দেন না। যে সময়ে যে উৎসব আসে, করে যান, প্রতি নতুন বছরে পূর্বপুরুষদের পূজা করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দেন তিনি নিজের অবস্থা নিয়ে সুখী, খুশী, এক কথায় তুষ্ট নাগরিক। নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। একটু নিরিবিলি হলেই হোল, খাওয়া-পরার উদ্বেগ না থাকলেই যথেষ্ট;—এই-ই তিনি চান। এমন কি যদি ফৌজের উৎপাত কি ঘোড়সওয়ারের ঘূর্ণি এসেও দেখা দেয়, তার জন্যে তাঁর ছক করা আছে। আসল ব্যবস্থা হচ্ছে শস্য আর নোনা শাকসব্জীর রসদ বাড়িতে সব সময় মজুদ রাখা—যাতে গোটা পরিবারের মাস তিনেক চলে যায়। গুলী যদি হাওয়ায় বোঁ বোঁ করে ছুটতে থাকে, আর সৈন্যের দল যদি পথে দাঙ্গা বাঁধায়, তিনি তাহলে বাড়ীর উঠোনের দরজাটা বন্ধ করে দেবেন; আর তার পাশে পাথর-বোঝাই হাঁড়ি-কলসী এনে জমা করবেন। এমনি করেই হাঙ্গামা থেকে মুক্তি তিনি পেয়েছেন, বিপদও কেটে গেছে।

কিন্তু বুড়ো দাদু চি শুধু কেন তিন মাসের জন্যে শস্য আর নোনা শাক-সব্জী কিনে ভাঁড়ারে জমিয়ে রাখেন? এর কারণ এই যে, তিনি মনে মনে জানেন, পিপিং-এর দেয়াল দুনিয়ার সব দেয়ালের চাইতে বেশী দুর্ভেদ্য, তাই বিপদ যতই আসুক, তার আয়ু তিন মাসের বেশী নয়। তিন মাসের ভিতরেই মিলিয়ে যাবে, নগরে আবার ফিরে আসবে শান্তি। পিপিং-এর

এই বিপদ যেন মানুষের মাথাধরা আর অল্প অল্প জ্বরের মতো। এগুলি তো হবেই, আবার ক'দিনের ভিতরে সেরেও যাবে। বিশ্বাস না হয়, নিজেরাই খতিয়ে দেখি না! আঙুলের কর গুণে অতীতের হিসেব করে বুড়ো দাদু চি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন। আনওয়েই আর হুপেইর যুদ্ধবাজ সর্দারদের লড়াই ক'মাস থাকবে? আবার হুপেই আর মুকদেনের দলের বিরোধ থাকবে কতদিন? শোনই না আমার কথা। আমাদের পিপিং-এর বিপদ তিন মাসের বেশী থাকে না গো, থাকে না।

১৯৩৭ সালটা ছিল সাতে-সাতে লড়াইএর বছর। বুড়ো দাদু চি'র বয়েস তখন পঁচাত্তর বছর। তিনি তখন আর সংসারের ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামান না। তখন উঠোনে ফুলের টবে জল দেওয়াই তাঁর সেরা কাজ। আর কাজ পুরানো দিনের গল্প বলা আর খাঁচার ক্যানারী পাখীর আদার জোগানো; আর প্রপৌত্র-প্রপৌত্রীর হাত ধরে আস্তে আস্তে তিনি হু কো স্থর মন্দিরেও যান—জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনি। কিন্তু মার্কোপোলো সাঁকোর তোপটা যখন গর্জে উঠলো, তিনি বাড়ীর মাথা হিসেবে একটু যে উদ্বিগ্ন হয়ে না উঠলেন তা নয়। বুঝি বা ভাবতেও বসলেন। চার পুরুষের মধ্যে তিনিই এখন একমাত্র বুড়ো মানুষ।

ছেলের বয়স এরই মধ্যে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ছেলের বৌ তো সব সময়েই রোগে ভুগছে, চলতে গেলে একপাশে হেলে পড়ে চলে। তাই বুড়ো দাদু চি তাঁর বড় নাতির বৌকে ডেকে পাঠালেন। এই বৌটি তাঁর ভারি প্রিয়। প্রথমে সে এই পরিবারে এসে একটি ছেলে আর মেয়ে বিইয়েছে, আর বুড়ো তারই ফলে মুখ দেখেছেন প্রপৌত্র আর প্রপৌত্রীর; দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ঘরকন্না কি করে করতে হয় সে জানে, আদব-কায়দায়ও দুরন্ত। সে মেজ নাতির বৌটার মতো মোটেই নয়। সে তো মুরগীর বাসার মতো করে চুল কোঁকড়ায়—দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। আর তৃতীয় কথা হচ্ছে, তাঁর ছেলে প্রায়ই বাড়ী থাকে না, ছেলের বৌ প্রায়ই অসুখে ভোগে; তাই বড় নাত-বৌই সংসারে দেখাশুনা করে।

বড় নাতি সারাদিন বাড়ি থাকে না। সে এক ইস্কুলে পড়ায়, সন্ধ্যেয় আবার ক্লাসের পড়া তৈরী করতে বসে বা ছাত্রদের খাতা দেখে। তাই পরিবারের সমস্ত ঝুঁকি—মায় কাপড়-চোপড়, খাবার-দাবার, চা-উৎসব—

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সামাজিকতা করা,—সব ভারই এসে পড়েছে বড় নাত-বৌয়ের উপর। সে একাই সব করে। কাজটা সহজ নয়, স্বর্গ আর দুনিয়ার তাগদ একসঙ্গে মেলানো চাই। তাই বুড়ো তাকে ভালবাসেন। আবার মাঞ্চু আমলের বনেদী আচার-ব্যবহার তাঁর ভাল লাগে। 'ছেলের বৌ যখন শ্বশুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, সহবৎ তাকে জানতে হবে; এক পায়ে সে শ্বশুরের হুকুমের জন্যে খাড়া হয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁর ছেলের বৌয়ের বয়েস পঞ্চাশের উপরে, আর সব সময়েই রোগে ভোগে। বুড়ো যদি তাকে এই নিয়মগুলি পালন করতে না দেন, তাহলে পারিবারিক আচার-ব্যবহার লঙ্ঘন করা হয়। আবার পালন করতে দিলেও তিনি মনে সুখ পান না। তাই বড় নাত-বৌয়ের সঙ্গে জরুরী ব্যাপারে পরামর্শ করাই তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বুড়ো চির পিঠ একটু কুঁজিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর শরীরখানা এখনো পরিবারের আর সবার চাইতে ঢ্যাঙা। যখন গায়ে জোর ছিল, যেখানেই গেছেন, সেখানেই সবাই বলেছে জাঁদরেল মানুষটি। লম্বা দেহ আর লম্বাটে মুখখানা নিয়ে তাঁকে বেশ জাঁদরেলই দেখাত বোধ হয়, কিন্তু চোখ দুটি তাঁর খুদে—একেবারে কুতকুতে। হাসলে তো দুটো আঁচড় মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তাই লোকে ঢ্যাঙা শরীরটা দেখে ভাবতেও পারত না যে, এর ভিতরে ভয় পাবার বা সম্মান করবার মতো কিছু আছে। বুড়ো হয়ে বরং চেহারা খোল্‌তাই হয়েছে। হলদে মুখে জৌলুসহীন চামড়া, তুষারের মতো সাদা ভুরু আর দাড়ি। চোখের কোণে আর গালে ভাঁজ পড়েছে, এতে মনে হয় তিনি সারাক্ষণ হাসছেন। তাঁর খুদে চোখ সব সময়েই এই ভাঁজের আর সাদা ভুরুর অতলে তলিয়ে থাকে। লোকে তাঁকে দয়ালু আর হাসিখুশী মানুষ বলে মনে করে। যখন তিনি সত্যই হাসেন, তাঁর খুদে চোখ থেকে একটু আলো ঠিক্‌রে পড়ে। দেখে মনে হয় তাঁর অগাধ জ্ঞান, একসঙ্গে সে-জ্ঞান বিলিয়ে দেওয়া যায় না।

তিনি বড় নাত-বৌকে ডেকে পাঠালেন। গোঁফ আঁচড়াবার ছোট চিরুণীখানা দিয়ে সাদা দাড়ি আঁচড়াতে লাগলেন কিছুক্ষণ ধরে। কথা নেই মুখে। বুড়ো তাঁর যৌবনে সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রত্রয়ী আর বিচিত্র ষষ্ঠ বর্ণমালা পড়েছিলেন মাত্র। যখন গায়ে শক্তি ছিল, সব রকম ধকলই তিনি

পুইয়েছেন। একা তিনি নিজের চেষ্টায় বাড়ী কিনে সংসার ফাঁদেন। তাঁর ছেলেও মাত্র তিন বছর এক বেসরকারী ইস্কুলে পড়ে, তারপরে এক জায়গায় শিক্ষানবিশীতে ঢোকে। যখন পরিবার ধাপে ধাপে এসে পৌছলো নাতিদের যুগে, হালের ভাবধারার চাপে পরিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার রেওয়াজ দেখা দিল। এখন তিনি যদিও পূজ্য প্রপিতামহ, তবু তিনি জানেন ছেলের মতো তাঁর জ্ঞান নেই (যদিও তিনি এখনো কনফ্যুসিয়াসের নীতিশাস্ত্রের বয়েৎ দু-একটি আওড়াতে পারেন, আর দু-একটি ছকও ফাঁদতে পারেন—যা দেখে গণকরা খুশী হয়); আর নাতিদের তুলনায় তো তাঁর বিদ্যেবুদ্ধি আরো কম। তাঁর ভয় তাঁর ছেলে আর নাতিরা বুঝি তাঁকে একটু হেয় জ্ঞান করে। তাই, যখন হাল আমলের ছেলেদের সঙ্গে বাৎচিত্ করেন, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। ভাবটা দেখান যেন তাঁরও ভাববার ক্ষমতা আছে। কিন্তু বড় নাত-বৌয়ের সঙ্গে এসব ভান করার দরকার হয় না। সেও দু-চারটে হরফ জানে। কিন্তু ছেলেমেয়ের পালকে ডাকা ছাড়া তার মুখে ভোর থেকে রাত অবধি তেল, নুন, গম, সিরকা ভিন্ন অন্য কথা নেই। কিন্তু বুড়ো দাদুর অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই বড় নাত-বৌকেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হোল। উপায় কি!

বড় নাত-বৌ কখনো ইস্কুলে যায়নি, তাই ইস্কুলের নাম তার নেই। বিয়ের পরে তার স্বামী তার একটা নাম রেখেছে। নামটি য়ুন মেই, সুন্দর আঙুর মঞ্জরী। এ যেন এক সম্মানিত খেতাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু য়ুন মেই বা আঙুর-মঞ্জরী নামটি পরিবারে শিকড় গাড়তে পারেনি। শ্বশুর-শাশুড়ী, আর বুড়ো চির নাম ধরে ডাকার অভ্যেস নেই। অন্য সবাই তাকে গৃহিণী বলেই জানে, তারা অত সৌন্দর্য্য বা আঙুর-মঞ্জরীর ধার ধারে না। তাছাড়া, বুড়ো দাদু মনে করলেন, য়ুন মেই সুন্দর আঙুর-মঞ্জরী আর কয়লাটানা গাড়ী য়ুয়ান মেই একই কথা, ধ্বনিটা তো একই। তাই তিনি বলেছিলেন, ও তো সব সময়েই ব্যস্ত। তোমরা এত নিষ্ঠুর যে ওকে দিয়ে আবার কয়লা টানাবার ফিকির করছ! তারপরে তার স্বামীও ও নাম ধরে ডেকে আর স্বস্তি পায় না। তাই 'বড় নাত-বৌ' ছাড়া, 'মা' আর পরিবারে 'খুদে ধন'-এর মা বলেই তার প্রসিদ্ধি। 'খুদে ধন' তারই বাচ্চা ছেলে।

খুদে ধন-এর মা দেখতে খারাপ নয়। মাঝারি গোছের মানুষ, গোলগাল মুখ, দুটি জলজলে চোখ। হাঁটা চলা, কথা বলা, খাওয়া, কাজ করা—সব ব্যাপারেই সে চটপটে। চটপটে হলে কি হবে তাতে শ্রী-ছাঁদ আছে। চুল সে ভাল করে আঁচড়ায়, মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি সে পাউডার ঘসে নেয়; পাউডার যদি দৈবাৎ ঠিক ঠিক ঘসা হয়, তখন তাকে আরো সুন্দর দেখায়। দৈবাৎ যদি পাউডার বেশী হয়ে যায়, তেমন সুন্দর তাকে দেখায় না। যখন পাউডারের মাত্রা বেশি হয়ে যায়, সবাই ঠাট্টা করে। কিন্তু সে বিরক্ত হয় না, নিজেও ওদের সঙ্গেই হেসে ওঠে, নিজেকে ঠাট্টা করে। স্বভাবতই সে ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ।

বুড়ো দাদু চির দাড়ি আঁচড়ানো শেষ হলো, এবার হাত দিয়ে দাড়ি দু'বার আঁচড়ে নিয়ে খুদে ধনের মাকে বললেন, আমাদের শস্য কেমন মজুদ আছে?

খুদে ধনের মা এদিক-ওদিক তাকালে তার বড় বড় চোখ তুলে। বুড়োর মনে কি আছে সে বুঝতে পেরেছে। তাই চটপট উত্তর দিলে, তিন মাস চলে যাবে।

সত্যিই বাড়িতে তেমন খাবার মজুদ নেই, কিন্তু বুড়োকে সত্যি কথাটা সে বলতে চায় না, তাতে আরো তাঁর উদ্বেগ বেড়ে যাবে। বুড়ো আর তার নিজের ছেলেমেয়ের কাছে কি কৌশল খাটাতে হয় সে জানে।

আর নোনা শাকসব্জী? দ্বিতীয় জরুরী প্রশ্ন করলেন বুড়ো।

আগের চেয়েও চটপট উত্তর দিলে, যথেষ্টই আছে। শুকনো আর নোনা মূলো, পেঁয়াজ, নুনে মজানো ডুমুর—সবই আছে। সে জানে, এগুলিও বেশী নেই, বুড়ো যদি দেখতে চান, সে বাজারে গিয়ে এক সময় কিনে আনবে।

বেশ, বেশ! বুড়ো খুশি হলেন। ঘরে যখন তিন মাসের শস্য আর নোনা শাকসব্জী আছে, চি-পরিবার আকাশ ভেঙে পড়লেও টিকে যাবে। কিন্তু এতেই উদ্বেগের শান্তি নেই বুড়োর। তিনি বড় নাত-বৌকে এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানাতে চান।

জাপানী শয়তানগুলো আবার গোল বাঁধাচ্ছে। গোল বাঁধাক গে। বক্সার বিদ্রোহের বছরে আট-আটটা জাত মিলে পিকিঙে এসে চড়াও হয়েছিল, এমন

যে সম্রাট তিনিও তো পালিয়ে গেলেন, কিন্তু আমার মাথা তো ওরা কাটতে পারেনি। আট-আটটা জাতই পারলে না, তা এ তো ক'টা জাপানী খুদে শয়তান! কতদূর আর ওরা করবে? আমাদের এ শহর পবিত্র স্থান। এখানে গোল বাঁধুক আর হৈ-চৈ হোক, তিন মাসের বেশী থাকবে না। কিন্তু আমাদের একেবারে দিশেহারা হলে হবে না, আবার খুব জারিজুরি দেখিয়েও লাভ নেই। অন্তত নিজেদের খাবার জন্যে ময়দার রুটি আর নোনা সব্‌জি মজুদ রাখা চাই। এই বুড়োর মতবাদ বা দর্শন।

বুড়ো চি কথা বলছিলেন, আর খুদে ধনের মা মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে বা হাঁ-হুঁ করে যাচ্ছিল। এর মধ্যে অন্তত বার পঞ্চাশেক সে কথাটা শুনেছে, কিন্তু এমন ভাব দেখালে যেন এই প্রথম শুনছে, নতুন শুনছে। বুড়োও খুশি, যাহোক একজন অন্তত আছে যে তাঁর পরামর্শ শোনে, তারিফ করে। তবু তিনি গলার স্বর একটু না চড়িয়ে পারলেন না—এতে আরো কথাটা জোরদার হবে।

তোমার শ্বশুরের তো বয়েস পঞ্চাশ পার হয়ে গেল, কিন্তু সংসারের ব্যাপারে একেবারে কাঁচা, আমাদের ঢের ঢের পেছনে পড়ে আছে। তোমার শ্বাশুড়ী-ঠাকরুণ তো এক রোগের বাণ্ডিল। তাঁর সঙ্গে কখনো কথা কইতে গেলে তিনি শুধু কঁকিয়ে উঠবেন। এই পরিবারের ভার তোমার আর আমার উপরে। আমরা যদি মাথা না ঘামাই তো ওদের পরণের কাপড়টুকুও জুটবে না। কি—ঠিক বলিনি?

খুদে ধনের মা 'হাঁ'ও বলতে চায় না, 'না'ও বলতে চায় না। সে চোখ নীচু করে হাসলো।

বুড়ো জিজ্ঞেস করলেন, রে স্যুয়ান এখনো ফেরেনি? রে স্যুয়ান তাঁর বড় নাতি।

নাত-বৌ জবাব দিলে, আজ তাঁর চার-পাঁচটা ক্লাস আছে।

হুঁ—তোপ দাগলো আর এখনো ও চটপট বাড়ি ফিরে এল না! রে ফেঙ আর ওর ঐ পাগলা বৌটা? বুড়ো তাঁর মেঝ নাতি আর নাত-বৌয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বৌটা মুরগীর বাসার মতো এলোমেলো করে কেয়ারী করে চুলে।

ওরা দু'জন—খুদে ধনের মা ভেবে পেলে না কি বলবে। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন যেন মধুর ভিতরের তেলালো জিনিসের মতো, একদণ্ড আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। কারো ঠাট্টা-তামাসার ভয়ও করে না।

খুদে ধনের মা হাসলো, হালের স্বামী-স্ত্রীরাই এমনি।

বুড়ো তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, কিন্তু এটা তো ঠিক নয়। তোমার শাশুড়ীই বৌকে নাই দিয়ে মাটি করেছেন। আমি তো এমন আর দেখিনি বাপু! একটি বিয়ে-হওয়া মেয়েমানুষ খালি লেক, পার্ক, বাজার আর—ঐ যে কি সিনেমায় না কিসে যাবে—সেটা কি ভাল কথা!

আমি তো জানি না। সে সত্যিই জানে না। তার সিনেমায় যাওয়ার সুযোগ কখনো হয়নি।

আর সেজ ছোকরা কোথায়? সেজ ছোকরা রে তাও। বুড়ো তাকে সেজ ছোঁড়া বলে ডাকেন। এখনো তার বিয়ে হয়নি বলে ছোঁড়া নাম ঘোচেনি। সে শীগ্‌গিরই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুবে।

সেজ ভাই তো খুদে নিয়ু নিয়ুকে নিয়ে বেড়াতে গেছে। খুদে ধনের বোন খুদে নিয়ু নিয়ু।

আজ ইস্কুলে যায়নি?

সেজ ভাই তো এতক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। সে আমাকে বললে, আমরা এখনো যদি জাপানীদের সঙ্গে লড়াই না করি, তাহলে পিপিংও আর রাখা যাবে না। খুদে ধনের মা খুব তাড়াতাড়ি স্পষ্টভাবে কথাটা বললে। বলতে বলতে সেজ ভাইয়ের মুখ-চোখ কি লাল হয়ে উঠলো! ঘুষি পাকালে, হাত মোচড়ালে, কিন্তু আমি তাকে কত বললাম, আমরা চি-পরিবার জাপানীদের চটাইনি, তারা নিশ্চয়ই আমাদের উপর জুলুম চালাবে না। আমি ওর রাগ থামাবার জন্যেই কথাটা বললাম। তা আমি কি করে জানব? আমার দিকে কটমট করে তাকালে, যেন আমি জাপানীদের দলে ভিড়ে গেছি, এক কাট্টা হয়ে গেছি। আর কিছু বলবার সাহসে কুলালো না। সেজ ভাই নিয়ু নিয়ুর হাত ধরে রেগেমেগে বেরিয়ে গেল। দাদু, আমার দোষ কি বলুন?

বুড়ো চি একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, ঐ সেজ ছোঁড়াকে নিয়ে আমার শান্তি নেই। আমার কি ভয়

হয় জানো, আজই হোক, কালই হোক, ও একটা গোল বাধিয়ে বসবে।

এই সময়ে খুদে ধন উঠোন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, দাদু, দাদু এসেছ? আমার জন্যে পীচ ফল এনেছ? কি—আননি? একটাও না। তুমি ভারি দুষ্টু দাদু!

খুদে ধনের মা ঘর থেকে বললে, খুদে ধন, দাদুর সঙ্গে অমন করে না! আবার অমনি করলে আমি কিন্তু মারব।

খুদে ধনের আর সাড়াশব্দ নেই। চি তিয়েন ইয়ু এবার বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন। ইনি ঠাকুর্দা। খুদে ধনের মা তাড়াতাড়ি গেল চা আনতে।

ঠাকুর্দা চি তিয়েন ইয়ুর পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়েস। মাঝারি গোছের লম্বা মানুষটি, একটু মোটাসোটা, মুখখানা গোলগাল, চোখ বড় বড়। গোঁফ ঘন আর কালো—দোকানের ম্যানেজারের সম্ভ্রান্ত চেহারাই বটে! সত্যিই তিনি এখন এক কাপড়ের দোকানের ম্যানেজার। থপ্‌থপ্‌ করে তিনি চলেন; চলার তালে তালে গালের মাংস নড়ে নড়ে ওঠে। বহুদিন কারবারে আছেন, তাই বিনয় তাঁর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁর নাকের উপর সব সময়েই হাসির কুঞ্চন। কিন্তু আজ মুখের ভাব তেমন নয়, কেমন যেন বদলে গেছে। কষ্টে হাসি টেনে আনছেন মুখে, কিন্তু চোখের ভাবে হাসির লেশমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। এমন কি যখন হাসছেন, তখনো মাথা তুলে তাকাতে পারছেন না। সে সম্ভ্রান্ত ভাব আর বজায় নেই।

কি—বড়র কি খবর? বুড়ো চি সাদা দাড়িতে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলেন।

কালো গোঁফওয়ালা বড় ছেলে কোনো রকমে বসে পড়ল। সাদা দাড়ি-ওয়ালা বুড়ো বাপ যেন তাঁকে বকেছেন এমনি ভাবখানা। বাবার দিকে তাকিয়ে চোখ নীচু করে আস্তে আস্তে বললেন, অবস্থা ভাল নয়।

লড়াই হবে নাকি? খুদে ধনের মা শুধালো।

মানুষের আর শান্তি নেই!

বুড়ো আস্তে আস্তে উঠে পড়ে বললেন, খুদে ধনের মা, হাঁড়ি-কলসী তৈরী রাখো, সদর ফটকে গড় দিতে হবে।

দুই

শহরের পশ্চিমে চি-দের বাড়ি। জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মন্দিরের কাছেই বাড়িটি। রাস্তাটার নাম ভেড়ার খুদে খাটাল। যারা এখানকার বাসিন্দা তারা জানে না অতীতে এখানে কি ছিল। হয়তো ভেড়ার খাটালই ছিল। পিপিং-এর অন্যান্য পথের মতো এটি সোজা নয়। এ যেন এক কোমর সরু লাউ। লাউয়ের গলাটা পশ্চিমে গিয়ে শহরের সদর সড়কে পড়েছে। সে কি সরু পথ, কি নোংরা আর লম্বা! পথের মুখটা এমন সরু যে, কেউ যদি সাবধানে তাকাতে তাকাতে না যায়, বা পিওনের কাছে জিজ্ঞেস না করে তাহলে পথ সে গুলিয়ে ফেলবেই। আর ঢুকেই এগুতেও সাহস হবে না। হাঁ, দেয়ালের পাশে জঞ্জালের স্তূপ দেখলে তবে সে হদিস পাবে যে এখানে লোক থাকে, আর তখন তার এগুবারও সাহস হবে। সমুদ্রের স্রোতে ভেসে-আসা উদ্ভিদ দেখে কলম্বাসের যেমন মনে হয়েছিল, কাছেই লোকালয় আছে, এও যেন ঠিক তাই।

তবে তখনো থাকবে সংশয়। দশ পা খানেক এগোলেই চোখ জ্বলজ্বল করে উঠবে—এবার দেখা যাবে লাউয়ের মাঝখানটা। ফাঁকা জমি—পূবে আর পশ্চিমে দুশো ফুট ধরে ছড়িয়ে আছে, উত্তর আর দক্ষিণে আছে দেড়শো ফুট। তারি মাঝখানে দুটো বড় বড় লোকাস্ট গাছ (এই গাছের পাতা জন্তুর শিঙের মতো দেখায়)। এই ফাঁকা জমির তিনদিকে ছ-সাতটি বাড়ির ফটকগুলি।

লাউয়ের মাঝখান থেকে একটা সরু গলি বেরিয়েছে—তারই পিছনে আবার একফালি ফাঁকা জমি। আগের জমির চেয়ে দু-তিন গুণ বড়। এইটেই লাউয়ের পেট। এই বুক আর পেট মিলিয়ে একদিন বোধ হয় ছিল রাজকীয় ভেড়ার খাটাল। কিন্তু এখন তা নিশ্চিত বলা যায় না, তার জন্য ঐতিহাসিকদের গবেষণার উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে।

চি-পরিবারের বাড়ি—পাঁচ নম্বর—একেবারে লাউয়ের বুকের মাঝখানে। উঠোন মুখিয়ে আছে পশ্চিমে। একটা লোকাস্ট গাছের কোণাকুণি বাড়িটা। বুড়ো চি যখন বাড়ি খুঁজছিলেন, এই জায়গাটার সংস্থান দেখেই তিনি কিনে

ফেলবেন ঠিক করেন। জায়গাটির সংস্থানটি তাঁর খুব পছন্দ। সদর সড়ক থেকে ঢোকবার মুখটা এত সরু যে, কেউ এ পথটা লক্ষ্যই করবে না, আর এতে তিনি খানিকটা নিরাপদেই থাকবেন—এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। তা ছাড়া ছ-সাতটা বাড়ির ঘেরা উঠোন দেখেও তিনি বেশ খুশি হয়ে উঠেছিলেন। ছেলেমেয়েরা দুটো মস্ত গাছের তলায় খেলা করতে পারবে, ওখানে গাড়ি-ঘোড়া আসতে পারবে না। লোকাস্টের কুঁড়ি ফুল আর সবজে শুঁয়ো পোকা হবে ছেলেদের খেলনা। আর গলি-ঘুঁজি হলে কি হবে, কেনা-কাটার সুবিধেও আছে। পশ্চিমে পথ মিশেছে গিয়ে সদর সড়কে; তার পিছনে জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মন্দির। মন্দিরের আঙিনায় মাসে ছ'-দিন মেলা বসে। এই সব ভেবে-চিন্তেই বুড়ো এখানে বাড়ি কিনবেন ঠিক করেন।

বাড়িটা এমন কিছু নয়। প্রচলিত সুসমঞ্জস রীতিতে গড়া নয়, আঙিনা তো পুবে-পশ্চিমে বেশ লম্বা, আবার উত্তর-দক্ষিণে চাপা। এমন লম্বা আর সরু যে উত্তর আর দক্ষিণ দিকের বাড়িগুলো ঠিক মুখোমুখি নেই। ওগুলো মুখোমুখি থাকলে আঙিনাখানা ফালি পথ হয়ে দাঁড়াতো। সে হোত ঠিক যেন ইস্টিমারের সিঁড়ি। দক্ষিণের বাড়িটা উত্তর দিকে মুখিয়ে আছে—এটা সদর ফটকের কাছে। দুটি মাত্র পাঁচ-কামরাওয়ালা ঘর। উত্তরের বাড়িটা দক্ষিণের দেয়ালের মুখোমুখি। আঙিনার একেবারে পূব কোণে পূবের কামরা দুটি। পূবের বাড়ির উত্তরে একফালি একটু জমি—সেখানে পায়খানা।

দক্ষিণ দেয়ালের বাইরে ধূপকাঠি আর মোম তৈরির কারখানা। সেখানে ধূপকাঠি শুকোবার জন্যে উঠোনটা ব্যবহৃত হয়। উঠোনে একসার উইলো গাছ। চি-পরিবারের পক্ষে এ এক সৌভাগ্য। এই গাছগুলি না থাকলে দক্ষিণের দেয়ালের পরে তাঁরা শুধু ফাঁকা জমি দেখতে পেতেন। ঘর থেকে বেরুলেই চোখে পড়ত শূন্যতা।

উঠোনের বাড়িগুলো তেমন ভাল করে তৈরি নয়। উত্তরের বাড়ির কাঠের কাজ ছাড়া অন্য কোন বাড়ির তারিফ করবার কিছু নেই। বুড়ো চি মালিক হবার পরে দক্ষিণের বাড়ির পাশের দেয়াল আর পূবের বাড়ির পেছনের দেয়াল ক'বার ধসে পড়েছে। তাঁদের বাড়ি আর প্রতি-

বেণীদের বাড়ির মাঝখানের দেয়াল খোয়া দিয়ে তৈরি, বর্ষায় তার কিছুটা ফি-বারই ধ্বসে পড়বেই। আঙিনায় মাটি, বাঁধানো পথও নেই। বর্ষায় জল আঙিনায় জমে এক ফুট দাঁড়ায়, আর সবাইকে খালি পায়ে যাওয়া-আসা করতে হয়।

বুড়ো চি বাড়িখানাকে ভালবাসেন। তার আসল কারণ, তিনি এই সম্পত্তি কিনেছিলেন, তাই বাড়ি বেঢপ হোক আর পাকা-পোক্ত না হোক, এ তাঁর গর্বের বস্তু। তাছাড়া, বাড়ি কেনবার পর থেকে, পরিবারে পোষ্য বেড়েছে। এর মধ্যে একজনও মরেনি। এখন তো বাড়িতে চার পুরুষ একই সঙ্গে আছে।

যখন বড় নাতি রে স্যুয়ান বিয়ে করে, তখন সারা বাড়িখানা মেরামত করা হয়। চি তিয়েন ইয়ুর টাকায়ই তা হয়। চি তিয়েন ইয়ু তাঁর বাবার কেনা বাড়িখানা এক প্রাসাদদুর্গে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, যাতে তা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করা যায়। তাহলে উর্ধ্বতন (বুড়ো চি) ও অধস্তনের পুরুষের (তার ছেলে আর নাতিদের) প্রতি কর্তব্য করা হবে। পচা কাঠ খুলে সেখানে তাই বসানো হয়েছিল নতুন মজবুত কাঠ, ভাঙা ইটের বদলে মজবুত ইট। কাঠের উপরে নতুন রং আর বার্নিস পড়েছিল। এমনিভাবে পুনর্গঠনের পরও বাড়ির বাইরের চেহারা ফেরে নি, কিন্তু মজবুতের দিক থেকে বাড়িটি হয়ে উঠেছিল এই খুদে খাটালের পয়লা বা দোসরা বাড়ি।

বুড়ো চি নতুন করে গড়া বাড়ির দিকে তাকিয়ে খুশি হয়েছিলেন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস বুক ঠেলে উঠেছিল। তারপর ষাট বছরের জন্মতিথির দিনে তিনি ঠিক করলেন, এবার অবসর নেবেন। তারপর থেকে চলছে অবসর। আঙিনার শোভা বাড়াতেই এখন তাঁর সমস্ত শ্রম ব্যয় হয়। দক্ষিণ দিকের দেয়ালের গা ঘেঁসে তিনি বেগুনিয়া, পদ্ম আর তুষারগোলক লাগিয়েছেন। ব্যাঘ্রকর্ণ ঘাস লাগিয়ে দিয়েছেন, ওটা জ্বর সারাবার ওষুধে লাগে। আঙিনার মাঝখানে দুটি টবে মস্ত ডালিম গাছ, দুটো করবীর টব আর নানা গাছপালা আছে; এগুলিতে ফুল ধরে সহজে। বাড়ির সামনে দুটো খেজুর গাছও লাগিয়েছেন। একটায় বড় বড় সাদা খেজুর ফলে, আর একটায় ফলে কাঁচা-মিঠে খেজুর। দেখতে সেগুলি পদ্মের বীচির মতো।

নিজের বাড়ি, ছেলে, নাতি, ফুল, লতাপাতার দিকে তাকিয়ে বুড়ো চি ভাবেন, না, তাঁর জীবন বৃথা যায়নি। এ সব তো তাঁরই সৃষ্টি। পিপিং-এর প্রাচীর যেমন অনন্তকালের, তেমনি তাঁর এই বাড়ি। এ বাড়ি ধ্বংস হবে না।

তিনখানা বাড়িতে সবশুদ্ধ ন'-খানা কামরা। তিয়েন ইয় আর তাঁর স্ত্রী খুদে ধনকে নিয়ে থাকেন দক্ষিণের বাড়িখানায়। উত্তরের দিকের পাঁচ-কামরাওয়ালা বাড়িখানার মাঝখানের কামরাটি বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পূবে আর পশ্চিমে রে স্বয়ান আর রে ফেঙ-এর শোবার ঘর। একেবারে পূব আর পশ্চিমের ঘরের দরজা খুললে উঠোন। পূবের ঘরে থাকেন রে তাঙ, আর পশ্চিমের ঘরে বুড়ো দাদু চি। পূব দিকের একটা ঘরে রসুই, একটা ভাঁড়ার ঘর—সেখানে শুধু কয়লা, জ্বালানি কাঠ মজুদ থাকে। শীতের দিনে করবী আর ডালিমের টবগুলো এখানে এনে রাখা হয়।

যখন বুড়ো চি এই বাড়ী কেনেন, তিনি পূব আর পশ্চিমের বাড়ী দু'খানা ভাড়া দিতেন। আঙিনা ফাঁকা থাকবে একথা তখন তিনি ভাবতে পারতেন না। আজ আর সেদিন নেই। এখন তাঁর ছেলে-নাতি-নাতনী এত যে আঙিনায় আর ধরে না। নিজের লোকেই কামরাগুলো ভর্তি, তাই মনে তাঁর সুখও যথেষ্ট। তিনি যেন এক প্রাচীন বনস্পতি, শাখা-প্রশাখায় ভরে দিয়েছেন আঙিনা।

খুদে খাটাল নিয়েও তিনি সুখী। এখানে এক নাগাড়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর কেটে গেল, অথচ পড়শীরা তো আজ আসে, কাল চলে যায়। দশ-বিশ বছর যারা থাকে তাদের সংখ্যা তো খুব কম। তারা থাকে, এখানে মারা যায়; কেউ বা ধনী ছিল, যা কিছু ছিল সব হারিয়ে ফকির হয়ে যায়। শুধু বুড়ো চি-ই শেকড় গেড়ে বসেছেন এখানে। যাঁরা এখানে ধনী হয়ে এমন একটা গরীব পাড়া ছেড়ে চলে গেছেন, চি তাদের সঙ্গে মাখামাখি করেন না; আবার সর্বস্ব খুইয়ে এমন হতচ্ছাড়া পাড়ায় থাকবারও যাদের সামর্থ্য থাকে না, তাঁদেরও তিনি সাহায্য করতে এগিয়ে যান না। তিনি জানেন, তিনি এখানে আছেন, এখান থেকে আর নড়বেন না। তাই আস্তে আস্তে তিনি এই খুদে খাটালের মুরুব্বী হয়ে উঠেছেন। গোষ্ঠীপতিও বলা যায়। নতুন যারা আসে, তারা প্রথমেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়ী যায়।

পড়শীদের বিয়ে, অন্ত্যেষ্টি কি ভোজের ব্যাপারে তিনিই সবচেয়ে সম্মানিত অতিথি—এ তাঁর অধিকার। তিনি বৃদ্ধ নক্ষত্র—দীর্ঘায়ুর নক্ষত্র যেন—সমস্ত পাড়ার বংশবৃদ্ধি আর সমৃদ্ধির প্রতীক।

এর চেয়ে কল্পনাকে ছুটিয়ে দিতে আর তাঁর সাহস হয় না। তাঁর শুধু কামনা, তাঁর উঠোনে উৎসবের মেরাপ উঠবে, আর তিনি আশী বছরের জন্মতিথির উৎসব করবেন। আশী বছরের পরে কি হবে সেকথা তাঁর ভাবতেও ইচ্ছা হয় না। যদি স্বর্গীয় প্রপিতামহ তাব পরেও তাঁর আয়ু বাড়িয়ে দেন তো ভাল কথা। আর যদি তিনি তাঁকে ফিরিয়ে নেন, তিনি চোখ মুদে চলে যাবেন। তাঁর ছেলে আর নাতীরা সাদা শোকের পোষাক পরে তাঁকে শহরের বাইরে নিয়ে যাবে।

লাউ-এর বুকে তিনদিকে শুধু পড়শী আছে। পশ্চিমের দিকটা বন্ধ। দক্ষিণ দিকে ছুটি ফটক। এখানকার বাড়ীগুলি পুরানো রীতিতে তৈরী, সামঞ্জস্যও আছে। উত্তর দিকের ছুটি ফটক আর ছুটি উঠোন। ছোট্ট বাড়িগুলি এখানে। এক-একটি বাড়িতে দু-তিন ঘর করে থাকে। তাই দক্ষিণটাকে ভদ্রলোকের এলাকা বলে মনে হবে, আর উত্তর এলাকাটা গরীব-গুরবোদের। পূবে আবার তিনটে ফটক; একেবারে দক্ষিণের ফটক চি-পরিবারের। শুধু একটা দেয়ালের ব্যবধান মাঝখানে। তারপরেই আঙিনা, সেখানে তিনটি পরিবার থাকে। তারপরেই আবার একটা উঠোন—সেখানে সাত-আট ঘবের বাস। এদের অবস্থা ভাল নয়, মানও আগের উঠোনের লোকদের মতো নয়। এ এক ব্যারাক-বাড়ি বা বস্তি-বাড়ি বলা যায়। বুড়ো চি এদের নিজের পড়শী জ্ঞান করেন না। তাই তিনি বলেন, ঐ বাড়িগুলির খানিকটাই লাউয়ের মাঝখানে পড়ে—বেশির ভাগটাই লাউয়ের পেটে—তাই ওদের একেবারে পড়শী বলে ধরা যায় না। তাঁর ভাবখানা যেন—বুক আর পেটে দশ মাইল তফাৎ।

বুড়ো চি নিজে শ্রেণী-বিন্যাস করে নিয়েছেন, সেইভাবেই পড়শীদের সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেন। যেমন যার চাল-চুলো তেমন তার সঙ্গে ব্যবহার। দক্ষিণ দিকের কম্পাউণ্ডের উপর তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা—একেবারে পশ্চিমের এক নম্বরের বাড়িটি তাঁর লক্ষ্য। এখানে চিয়েন পরিবার থাকেন। শ্রীযুক্ত চিয়েন আর চি তিয়েন ইয়ু একই বয়েসী। শ্রীযুক্ত চিয়েনের

দুই ছেলে রে স্থয়ানের সঙ্গে পড়েছে। বড়টির বিয়ে হয়ে গেছে, ছোটটি বাগদত্ত, কিন্তু পড়শীদের চোখে চিয়েন পরিবার এক অদ্ভুত বস্তু। পরিবারের লোকরা অতিমাত্রায় ভদ্র, সে যে কেউ হোক, তাকেই তাঁরা সম্ভ্রম দেখান। দূরে দূরে থাকেন—হয় সবাইকে শ্রদ্ধা করেন, নয়তো কাউকে নয়। তাঁদের পোষাক-আষাক দশ-বিশ বছরের পুরানো ফ্যাসানের। বুড়ো চিয়েন এখনো শীতকালে লাল পশমের টুপি পরেন। পরিবারের মেয়েরা কম্পাউণ্ডের ফটকের বাইরে কখনও পা দেন না। যখন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সুঁচ-সুতো কি শাক-সবজী কিনতে ফটকের কাছে যান, ফটকের দরজাটা একটু ফাঁক করে দেন মাত্র, মনে হয় তাঁদের গোপন রহস্য বাইরে বেরিয়ে পড়বে বলেই তাঁদের ভয়। পুরুষরা অন্যান্য পরিবারের মতোই বাইরে যায় আসে, কিন্তু তারাও ভারি হুঁশিয়ার, তাই কেউ জানতে পারে না তাদের মনে কি আছে।

বুড়ো চিয়েনের কাজকর্ম নেই, তাই কম্পাউণ্ডের বাইরে যান না। যখন মুখে মাতালের লক্ষণ দেখা যায়, তিনি ফটকের বাইরে এসে একটু দাঁড়ান। পরণে থাকে পুরানো ফ্যাসানের পোষাক—লোকাস্ট গাছের ফুল-গুলির দিকে একটু বা মাথা তুলে তাকান, কখনো বা ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা কেমন, পরিবারে সুখ আছে কি নেই, দুঃখ-দুর্দশারই বা মাত্রাটা কতখানি—এসব কথা কেউ জানে না। উঠোন থেকে কখনো টু শব্দটি বেরোয় না। খুদে খাটালে বিয়ে কি অন্ত্যেষ্টির সময়ে, অথবা যখন নাটুকে দল এসে নৌকো-নাচ বা বাঁদর-খেলা দেখায়, পড়শীরা ছুটে যায় উত্তেজনায় ভাগ বসাতে, কিন্তু চিয়েন-পরিবারের ফটক তেমনি আঁটসাট বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যের মতো তাদের জীবনযাত্রা নয়, তারা যেন পাওনাদারের ভয়ে লুকিয়ে থাকে ; অথবা তারা যেন বাস্তু-হারা।

খুদে খাটালে যারা থাকেন তাঁদের মধ্যে বুড়ো চি আর বড় নাতি রে স্থয়ান প্রায়ই চিয়েন পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান, তাঁদের গোপন রহস্য কিছু কিছু তাঁরা জানেন। অবশ্য, গোপন রহস্য তাঁদের কিছুই নেই। আর একথা বুড়ো চি ভাল করেই জানেন, কিন্তু কাউকে বলেন না। চিয়েন পরিবারের সম্পর্কে এ রহস্য জীইয়ে রাখা যেন তাঁর কর্তব্য, এমনি করে নিজের মর্যাদা তিনি বাড়াচ্ছেন।

চিয়েন পরিবারের উঠোন তেমন বড় নয়, কিন্তু ফুলে ফুলে ভরা। বুড়ো চি'র ফুলগাছগুলি ওখান থেকেই আমদানী। বুড়ো চিয়েনের ঘরে ফুল ছাড়া আছে শুধু পুরানো পুঁথি আর বিবর্ণ ছবি। তাঁর দৈনন্দিন কাজ ফুলগাছে জল দেওয়া, ছবি আঁকা আর কবিতা আবৃত্তি করা। যখন খুব খুশি হয়ে ওঠেন, তিনি দু-পাত্র মদ খান। এই মদ তিনি নিজে তৈরী করেন। শ্রীযুক্ত চিয়েন কবি, কিন্তু তাঁর কবিতা কাউকে কখনো দেখান নি; এ কবিতা নিজেরই জন্যে—নিজের উপভোগেরই জন্যে। নিজের জীবন, নিজের আদর্শ-মাফিক তিনি গড়ে তুলেছেন—সে আদর্শ ব্যবহারিক হোক না হোক, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। কখনো কখনো তিনি ক্ষুধার জ্বালা সয়েছেন, কিন্তু ক্ষুধার্ত হয়ে কাউকে ঘৃণাক্ষরে জানান নি।

শ্রীযুক্ত চিয়েনের বড় ছেলে একটা মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয়ে কয়েক ঘণ্টা পড়ায়, বাবাকে সে পছন্দ করে বেশী। মেজ ছেলে পরিবারের মধ্যে সব-চেয়ে অ-কবি। সে ট্রাক চালায়। ছেলের ট্রাক চালানোয় তিনি বাধা দেন না, কিন্তু তার গায়ে তেল-কালির খোসবাই তাঁর ভাল লাগে না। মেজ ছেলে বাড়িতে খুব কমই আসে। বাবার সঙ্গে যে ঝগড়া বা মতবিরোধ আছে তা নয়। আর চিয়েন পরিবারের মেয়েরা যে কম্পাউণ্ডের ভিতরেই বদ্ধ, তাও পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নয়। তাঁদের কাপড়-চোপড় এত পুরানো ফ্যাসানের যে তাঁরা বেরুতে লজ্জাই পান। অন্যের উপরে শাসন করবার স্পৃহা চিয়েন বা তাঁর ছেলেদের নেই, কিন্তু টাকাকড়ির অপ্রতুলতা আর শিল্পের প্রতি অনুরাগে কাপড়-চোপড়ের কথা ভাববার সময় তাঁরা বড় পান না। মেয়েরা অভ্যাসবশেই লুকিয়ে থাকেন, তাঁদের পোষাকের দৈন্য এমনিভাবেই চাপা দিয়ে রাখেন।

বুড়ো চি আর শ্রীযুক্ত চিয়েনের অন্তরঙ্গতার প্রসঙ্গে আসা যাক। বুড়ো চি সব সময়েই চিয়েনের সঙ্গে দেখা করতে যান, কিন্তু শ্রীযুক্ত চিয়েন কখনো বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে আসেন না। যদি বুড়ো চি একটা মদের বোতল শ্রীযুক্ত চিয়েনকে উপহার দেন, শ্রীযুক্ত চিয়েন অমনি তার চেয়ে দেড়া-দুনো দামের একটি উপহার ছেলের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেন। কিছু না দিয়ে কারো কাছ থেকে কিছু নিতে তাঁর বাধে। তিনি হিসেব রাখেন না বলে টাকাকড়ি তাঁর সব সময়েই উপে যায়। যদি হাতে টাকা থাকে, তিনি

খরচ করেন, যখন থাকে না, তখন করেন কাব্য। তাঁর বড় ছেলেরও এমনি ধরন-ধারণ। সে ছবি আঁকবার জন্যে বাড়িতে বসে থাকবে, তবু স্কুলে দু-এক ঘণ্টা আরো বেশি পড়িয়ে আরো টাকা রোজগার করবে না।

স্বভাবে, বিদ্যায় বা পছন্দে বুড়ো চি আর শ্রীযুক্ত চিয়েনের মিতালি পাতানো উচিত নয়, কিন্তু তবু তাঁরা মিতা। বুড়ো চি একজন বুড়োসুড়ো মিতা চান যাঁর কাছে তিনি মনের কথা বলতে পারেন; তাছাড়া শ্রীযুক্ত চিয়েনের বিদ্যা আর অমল চরিত্র তো আছেই। আর শ্রীযুক্ত চিয়েন যদিও মিতালি পাতাতে তত ব্যস্ত নন, কিন্তু কেউ পাতাতে চাইলে তিনি তো আর নারাজ হতে পারেন না। তিনি ভাবুক, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন, কিন্তু কেউ দেখা করতে এলে তিনি ভদ্রতা জানেন।

সাতান্ন-আটান্ন বয়েস হলেও বুড়ো চিয়েন মো ইয়ুর চুলে পাক খুব কমই ধরেছে। তিনি বেঁটেখাটো মানুষটি, একটু মোটাসোটাও। তাঁর মুখে ঝকঝকে সমান দাঁতের সার। তাঁর মোটা শরীর আর সাদাসিধে ধরন-ধারণ তাঁকে মুহূর্তেই প্রিয় করে তোলে। মুখখানা গোলগাল, চোখ বড় বড়, মাঝে মাঝেই সেই চোখ বুজে তিনি ভাবেন। গলার স্বর মৃদু, কিন্তু নম্র আর দয়ার্দ্র। মানুষ তাঁর কাছে এলে খুশি হয়, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

শ্রীযুক্ত চিয়েন বুড়ো চি'র কাছে কবিতা আর হস্তলিপির কথা বলেন। বুড়ো চি বোঝেন না, তিনি কি বলছেন। আর বুড়ো পাণ্টা বলেন নাতির ঘরের পুতের কথা, তার আবার হাম হয়েছে; কি করে মুরগীর বাসার মতো চুল কুঁকড়িয়েছে তাঁর মেজ ছেলের বৌ। শ্রীযুক্ত চিয়েন এতে আরাম পান না। কিন্তু তবু তাদের একটা সমঝোতা হয়ে গেছে! তুমি বলবে, আমি শুনবো; আবার আমি বলব, তুমি শুনবে। শ্রীযুক্ত চিয়েন বুড়ো চিকে ছবি দেখান। বুড়ো চি ঘাড় নাড়েন আর বলেন, বেশ, বেশ! আবার বুড়ো চি পরিবারের দৈনন্দিন কথা পেড়ে বসেন, শ্রীযুক্ত চিয়েন মাঝে মাঝেই বলেন, বেশ, বেশ! তাই নাকি, হাঁ হাঁ! এমনি সব সহজ, সরল উত্তর। যদি কিছু বলবার না থাকে, তিনি চোখ বুজে শুধু মাথা নেড়ে যান।

আলাপের শেষে দু'জনেই বাগানের কথায় চলে আসেন। এবারে দুজনের আলাপের স্রোত যেন নদীর মতো তর্‌তর্ করে বয়ে যায়, দুজনেই শান্তি পান। এও কম পাওয়া নয়। যদিও বুড়ো চির টানটা ডালিম

চারার দিকে, ওর ফল আরো বড় হবে, বেশি ফলবে। আর শ্রীযুক্ত চিয়েনের টানটা ফুল আর রাঙা মঞ্জরীর সৌন্দর্যের দিকে। কিন্তু চাষের প্রণালীতে দুজনেরই প্রয়োজন, তাই তাঁরা কথা কাটাকাটির সুযোগ পান। দামী পাথর ঘসে ঘসে চকচকে করার মতোই যেন তাঁদের এই কথাবার্তা।

ফুলের কথা শেষ করে শ্রীযুক্ত চিয়েন মাঝে মাঝে বুড়ো চিকে খেয়ে যেতে বলেন। সাদাসিধে খাবার। এই সুযোগে বুড়ো চির সঙ্গে বাড়ির মেয়েদেরও আলাপ হয়। নিজেদের পরিবার বড় আর পড়শীদের পরিবার কিসে ছোট এই নিয়েই কথা হয়। এই কথাবার্তার সময়ে শ্রীযুত চিয়েনকেও স্বীকার করতে হয় যে, কবিতা আর ছবি লেখা ছাড়া তেল, নুন, ভিনিগারের সমস্যাও দুনিয়ায় আছে।

রে সুয়ান কখনো কখনো তার দাদুর সঙ্গে চিয়েনদের বাড়ি যায়। কখনো বা একাই যায়। যখন সে একা যায়, বুঝতে হবে বৌ বা কারো সঙ্গে ঝগড়া করেই গেছে। দশবারের মধ্যে ন'বার তো এই কারণেই যায়। সে নিজেকে সংযত রাখতে জানে, যদিও সময়ে সময়ে খুবই চটে ওঠে, তবু চেঁচায় না, তর্জন-গর্জনও করে না। সে নিঃশব্দে চিয়েনদের বাড়ি চলে যায়, তারপর বাপ আর ছেলের সঙ্গে বসে পরিবার আর জাতির কথা বাদ দিয়ে অন্য কথাই পাড়ে। এতে তার বুকের জমাট ক্রোধ রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

চিয়েন-পরিবার ছাড়া বুড়ো চি দু' নম্বর বাড়ির লি-পরিবারকেও পছন্দ করেন ; ওরা চিয়েনদের উল্টো দিকের বাড়িতে থাকে। খুদে খাটালে বুড়ো চি আর বুড়োবুড়ি লি একই যুগের মানুষ। ন'কর্তা লি লম্বায়ও বুড়ো চির চেয়ে ইঞ্চিখানেক ছোট হবেন। তাঁর শরীরটা যে বুড়ো চির চেয়ে ছোট তা নয়—তাঁর কোমর ভাঙা এই যা। পেশার ছাপ আছে তাঁর দেহে, গর্দানের কাছটা ফুলে আছে, এ ফুলো যায় না, যাবে না। বিশ কি ত্রিশ বছর আগে পিপিং-এ এমনি গর্দান-ফোলা মানুষ বহু ছিল। সবারই ছিল তাদের এক পেশা—এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে মালপত্র টেনে নিয়ে যাওয়া। যাদের মূল্যবান সম্পত্তি থাকতো—যেমন চীনেমাটির ফুলদানী, ঘড়ি, কর্পূর কাঠের সিন্ধুক, মজবুত কাঠের আসবাব—তাদের এসব সরাতে হলে এদের ডাক পড়তো। এরা শক্ত করে দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধে, ঘাড়ের উপর সরু তক্তা রেখে, তার উপর জিনিসগুলো তুলে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়

নিয়ে যেত। এদের চলার চাল একই ধরনের। বহুৎ তাকদ ছিল এদের গর্দানায়, তাই তারা হলফ করে বলতে পারত, জিনিস নষ্ট না করে ঠিকানা-মত পৌছে দেবে। এদের লোকে ডাকত কুঁজো গর্দানা বলে; কিন্তু যখন থেকে ছোট ছোট ঠেলা গাড়ির প্রবর্তন হোলো, ওরাই কুঁজো গর্দানা থেকে ঠেলাওলা হয়ে দাঁড়াল। ছোকরারা এখন এই করেই রুজি-রোজগার করছে, কিন্তু গর্দানে তাদের ফুলো আর নেই। ন'কর্তা লি যৌবনে নিশ্চয়ই সুশ্রী ছিলেন। গর্দানা ফুলো আর পিঠ কুঁজিয়ে গেলে কি হবে, এখনো তাঁর লম্বাটে মুখে বলিরেখা পড়েনি, চোখের ঠাহরও তাঁর কম-জোরী হয়ে যায় না। এখনো হাসলে তাঁর চোখ আর দাঁত এমনি ঝলসে ওঠে, যাতে অতীতের সৌন্দর্যের রেশটুকু ধরা পড়ে।

ন'কর্তা লি ছু' নম্বর বাড়িব মালিক, বাড়িব কিছুটা আব ছুটো পরিবারকে তিনি ভাড়া দিয়েছেন। বুড়ো চি ন'কর্তাকে ভাল মানুষ বলেই পছন্দ কবেন। ব্যবসায় ন'কর্তা বুকের দরদ যতখানি পারেন মিশিয়ে দিয়েছেন। গরীব পড়শীদের মালপত্র আনা-নেওয়ার ব্যাপারে শুধু রোজকার-রুজির দাবীই তিনি কবেন, কখনো মজুরীর কথা তোলেন না। পেশার বাইরেও বিপদ-আপদের সময়ে তিনি পড়শীদের সাহায্য করবার জন্য তৈরী। যেমন—পথে যদি বিদ্রোহী সিপাহীর হামলা হয়, তিনিই সদর ফটকে বেরিয়ে গিয়ে গুলীর মুখ থেকে খবর নিয়ে ফিরবেন। এসে বলবেন কি করতে হবে। লোকাস্ট গাছতলা থেকেই চেঁচাতে শুরু করবেন, শহবের ফটক বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেল, এবার ভাড়ারে রসদ জমাও! আবার যখন বিপদ কেটে যাবে, শহরের ফটক খুলবে, তিনি এসে খবর দেবেন, আপদ বালাই কেটে গেল, নিঝুম হলো। এবাব আর চিন্তা নেই।

বুড়ো চি নিজেকে পাড়ার প্রতীক বলে মনে করেন, কিন্তু মানুষের উপকারের ব্যাপারে তিনিও ন'কর্তা লির কাছে লজ্জাই পান। তিনি তাঁর সমান নন। লির ছেলেও কুঁজো গর্দানা। লিদেব উঠোনও জঞ্জালে ভরা, গোলমাল আর পাঁচমিশেলি ভিড়ও সেখানে হরবখৎ লে.গই আছে। কিন্তু যখন ছুই বুড়ো লোকাস্ট গাছের তলায় মুখোমুখি দাঁড়ান, তখনি ছুই পরিবারের ছোকরারা টুল এনে দেয়। তাঁরা জানে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কি ঘটেছে, তাই নিয়ে ওঁরা ছু-এক ঘণ্টা তো গল্প করবেনই।

ন'কর্তা লির পাশে চার নম্বর বাড়ি। এখানেও পাঁচমিশেলি ভিড়। তিন-তিনটে পরিবার থাকে। পরামাণিক সাতসূর্য আর তার বৌ, এক বুড়ি বিধবা, আর তার মেয়ের ঘরের নাতি। পথে ঘুরে ঘুরে কলের গান বাজিয়ে পয়সা রোজগার তার পেশা; তাছাড়া আছে এক রিক্সাওয়ালা, খুদে সুই তার নাম। সাত কোণ, আট পাটওয়ালা খরমুজের মতো তার মাথাটা। খুদে সুই রিক্সা টানা ছাড়া প্রায়ই বৌকে ধরে মারে।

ছ' নম্বর বাড়িও অমনি। ' যেমন ছোট, তেমনি পাঁচ-মিশেলি। তবে চার নম্বরের বাড়ির বাসিন্দাদের চেয়ে একটু উঁচুদরের। পেশা একটু বা উন্নত ধরনের। উত্তরের বাড়িতে—দক্ষিণমুখো সরেস বাড়িখানায় থাকে জন ভিং। লোকটি খ্রীষ্টান। লিগেশন্ স্ট্রীটের ব্রিটিশ দূতাবাসে সে পরিচারক। ব্রিটিশ দূতাবাসকে ওরা বলে ইংরেজদের রাজবাড়ী।

একেবারে উত্তরে আর একখানা ছোট বাড়ি আছে, সেখানে লিউ আর তার বৌ থাকে। মেরাপ বাঁধা তার পেশা। গ্রীষ্মে সূর্যের তাপ থেকে বাঁচবার জন্যে আঙিনাগুলোতে মেরাপ ছাওয়া হয়, তাছাড়া বিয়ে বা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, আর দীর্ঘায়ু কামনায় জন্মতিথিতেও মেরাপ বাঁধা হয়। লিউ এ ছাড়া মুষ্টিযোদ্ধাও; তার রীতি পুরানো, সে এক পুরানো ক্লাবের সদস্য। আঙিনায় যে কোনো সকালে তাকে ব্যায়াম করতে দেখা যায়। তখন সে আক্রমণ আর আত্মরক্ষার পাঁয়তারা কসে; বড় উৎসব হলে সে ক্লাবের সাঙাৎদের সঙ্গে সিংহ-নাচ নেচে দর্শকদের আনন্দ জোগায়। লিউ হয় সিংহের পিছনের একখানা পা।

পূবের বাড়িতে থাকেন ছোট ওয়েন আর তাঁর স্ত্রী। ওরা অপেরায় গান গান। এমনি তাঁরা সৌখিন নট-নটী, কিন্তু গোপনে তাঁরা টাকা নেন।

বুড়ো চি চার আর ছ' নম্বর বাড়ির লোকদের কাছ থেকে সরে থাকেন। খুব দূরেও নয়, আবার খুব কাছেও নয়। এ এক সম্ভাব্য দূরত্ব। এদের জীবনে কোনো বিশেষ কিছু ঘটলে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করেন, আর কিছু না ঘটলে এদের সম্বন্ধে তাঁর নিস্পৃহতাই দেখা যায়।

কিন্তু ন'কর্তা এমনি ধারা লোক নন। যে কাউকেই তিনি সাহায্য করতে পারলে খুশি হন। শুধু নিজের বন্ধুবান্ধব, চার নম্বর আর ছ' নম্বর বাড়ির মানুষই নয়—এমন কি সাত নম্বর বাড়ির সাহায্যেও এগিয়ে আসেন। এই

বাড়ির পাঁচ-মিশেলি ভিড় বুড়ো চির ভাল লাগে না। এরই জন্যে ন'গিন্নীর গঞ্জনাও কম সইতে হয় না। ন'কর্তার একমাথা সাদা চুল আর একজোড়া ক্ষীণদৃষ্টি চোখ। রোজই ন'গিন্নী 'বুড়ো মিনসেটা' বলে তাঁকে গাল দেন। তাঁর মনে হয়, ন'কর্তা যথাসাধ্য পরিবারের জন্য খাটছেন না, তিনি তাই গাল দিয়ে তাঁকে পথ বাত্‌লে দিয়ে তা করাতে চান। খুদে খাটালের ছেলে-মেয়েরা যেমনই হোক, ন'গিন্নীর কাছে সবাই 'খুদে ধন', বড়দের তিনি 'ধন' বলতে পারেন না বটে, কিন্তু মনে তো করেন। ওরা 'বড় ধন'। কে কালো, কে গোরা তা তিনি ভাল করে বুঝতে পারেন না, কে গরীব, কে ধনী তাও বাছ্‌-বিচার করা তাঁর ব্যাপার নয়। ছোকরা আর বুড়ো-হাবড়ায়ও তিনি তফাত বোঝেন না। তাঁর কাছে সবাই করুণা আর ভালবাসার পাত্র, আর সবারই এই বুড়ো-বুড়ির সাহায্য প্রয়োজন। এরই জন্যে খুদে খাটালে, বুড়ো চি-কে শ্রদ্ধা দেখিয়েও ওরা তফাতে সরে থাকে—কিন্তু এই বুড়ো-বুড়িকে সত্যিই ওরা ভালবাসে। দুঃখ পেলে ওরা ন'গিন্নি-ন'কর্তাকে জানায়, যেন হুজুরে জানাচ্ছে—অমনি ন'গিন্নি ন'কর্তাকে ঠেলে পাঠান ওদের সাহায্যে। তাছাড়া ন'গিন্নির সমবেদনার অশ্রু যেমন প্রচুর ঝরে, তেমনি তাতে আর যাই থাক, ভান নেই।

চি আর চিয়েন পরিবারের মাঝখানে তিন নম্বর বাড়ি। বুড়ো চির কাছে বাড়িখানা চক্ষুশূল। চি'দের বাড়ি মেরামতের আগে এইখানাই ছিল খুদে খাটালের সেরা বাড়ি। এখন বাড়ি মেরামত হলেও, তিন নম্বরের ঢের পিছনেই পড়ে আছে। প্রথমত, তিন নম্বরের ফটকের বাইরে, প্রাচীন লোকাস্ট গাছের তলায় একটা পাতলা দেয়াল আছে। সেখানে ঝকঝকে সাদা আর কালো চুনকাম, তার উপরে লাল হরফে লেখা 'ফু'। 'ফু'র মানে সৌভাগ্য। চি-পরিবারের ফটকে এমনি দেয়াল নেই—খুদে খাটালে কোনো বাড়ির ফটকেই নেই। আর প্রাচীন ভঙ্গীতে তার ফটক তৈরী, কিন্তু চি-বাড়ীর ফটক শুধু ইটের পর ইট সাজানো। তিন নম্বর বাড়িতে কম্পাউণ্ডের একটা শ্রী-ছাঁদ আছে, তার চারদিকে বাড়িগুলি তৈরী। এও পুরানো ঐতিহ্য। আঙিনা চৌকো ইট দিয়ে বাঁধানো। তাছাড়া প্রতিবার গ্রীষ্মে তিন নম্বর বাড়ি থেকে ছ' নম্বর বাড়ির লিউর তলব পড়ে, সে উঠোনে মেরাপ ঢেকে ঠাণ্ডা ছাউনি গড়ে দিয়ে যায়। কিন্তু চি-বাড়ির উঠোনে ছায়া দেয়

মাঝারি গোছের খেজুর গাছ দুটি। ছায়া আবার তেমন নয়। বুড়ো চির হিংসে না করে উপায় কি!

তিন নম্বর বাড়ির জীবনধারাও বুড়ো চির দু'চোখের বিষ। তিন নম্বর বাড়ির কর্তা কুয়ান প্রভাত-পদ্ম। তাঁর দুই বৌ। ছোট বউ সিঙ্‌সঙ্‌ (পেশাদার নাচিয়ে গাইয়ে) মেয়ে। মুকদেনী চালে গান গায়, এক সময়ে চা-খানাগুলোতে ওর নাম ছিল পীচ-মঞ্জরী। শ্রীযুক্ত কুয়ানের বয়েস পঞ্চাশেরও উপরে, প্রায় চি তিয়েন ইয়ুর সমবয়েসী, কিন্তু দেখতে দেখায় তিরিশ বছরের ছোকরাটি; আবার তিরিশ বছরের ছোকরার চেয়েও তিনি চটপটে। ফি-রোজ তিনি দাড়ি কামান, দশদিন অন্তর কাটেন চুল। পাকা চুল থাকলে তুলে ফেলাই হয়। তাঁর চীনা আর সাহেবী পোশাক সরেস কাপড় দিয়ে তৈরী; আর সরেস না হলেও একেবারে হাল ফ্যাসানের। বেঁটে মানুষ তিনি, লম্বাটে তাঁর মুখ, খুদে হাত আর পা—খুদে হলেও সমতা বেশ আছে। তাঁর দেহ আর পোশাকের সামঞ্জস্যে তাঁকে ঝকঝকে সদ্য-ওড়ানো খেলনা ফানুসের মতো দেখায়। বেঁটে হলে কি হবে, ধরন-ধারণ ভারি জবর; একেবারে জাঁকালো। বিখ্যাত লোক আর অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর চলাফেরা। বাড়িতে রাঁধুনি, একটি ছুঁড়ি ঝি আছে, সে মখমলের চটি পরে। যখন অতিথি-অভ্যাগত আসেন, তিনি হাঁসের রোস্ট আর বাঁশপাতা রঙের পুরানো মদ আনতে দেন। মা-জঙ্গ তিনি একনাগাড়ে আটচল্লিশ বাজি খেলতে পারেন, খাওয়ার আগে পরে শোনেন জয়ঢাকের বাজনা আর অপেরার গান। যেসব পড়শীর কিছুটা পদ-মর্যাদা আছে, তাঁদের কাছে তিনি নম্র হয়ে থাকেন, কিন্তু উৎসবের সময় ছাড়া অন্তরঙ্গতা দেখান না। কিন্তু ন'কর্তা লি, লিউ, পরামাণিক সাতসূর্য আর খুদে সুইর কাছে দরকার-মাফিক আসেন যান, তাদের মানুষ বলে গ্রাহ্য করেন না। ওহে বুড়ো লিউ, কাল এসে মেরাপটা নিয়ে যেও। ও ন'কর্তা, একবার শহরের পূব থেকে বিকেলে আমার টেবিলটি এনে দিও তো! দেখো, আবার দেরী কোরো না! খুদে সুই, এমন ঢিমে চালে চললে তোমার রিক্সা আর নেব না—শুনছ? এমনি তাঁর কথার ধরন—এমনি তাদের সঙ্গে ব্যবহার; অতি সংক্ষিপ্ত, হুকুমের স্বরই তাতে বেজে ওঠে।

শ্রীমতী কুয়ান লম্বা-চওড়া মেয়েমানুষ। প্রায় পঞ্চাশ বছর তাঁর বয়েস হোল, এখনো লাল পোশাক পরতে তাঁর ভারি সাধ, তাই সবাই ডাকনাম দিয়েছে বড় লাল লঙ্কা। শ্রীমতী কুয়ানের মুখে বলিরেখা আর মেচেতার অন্ত নেই। যতই পাউডার আর রুজ ঘসুন, তিনি না ঢাকতে পারেন বলিরেখা, না মেচেতা। স্বামীর থেকেও তাঁর জাঁকজমকের দমকটা একটু বেশি। তাঁর প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি কাজ চীনের রাজমাতার মতো। তিনি কুয়ানের চাইতেও বন্ধু জোটাতে ওস্তাদ, দু'দিন দু'রাত ধরে তিনি মা-জঙ্গ খেলতে পারেন, কিন্তু তবু তাঁর ডাঁট একটু ভাঙে না।

শ্রীমতী কুয়ান দুটি মেয়েই বিইয়েছেন, তাই শ্রীযুত কুয়ান আবার মোটাসোটা ছেলের আশায় পীচ-মঞ্জরীকে বিয়ে করেছেন। পীচ-মঞ্জরী ছেলে বিয়োয়নি, তবে বড় বৌয়ের সঙ্গে কোঁদল শুরু করেছে। সে এমনই কোঁদল, মনে হয় যেন সে দশটা ছেলের মা। সুন্দরী সে নয়, চোখ আর ভ্রূ তার সুন্দর। সকাল থেকে সন্ধ্যে চোখ আর ভ্রূ মুখময় যেন নেচে নেচে বেড়ায়। কাউদী আর মেদী মেয়ে দুটি খারাপ নয়; দুই মায়ের আদেশ-উপদেশের তোড়ে পড়ে তারা সাজতে আর চোখ নাচাতে শিখেচে।

বুড়ো চির তিন নম্বরের বাড়ির উপর হিংসে হলেও তার মেয়ে-পুরুষের উপর তাঁর শ্রদ্ধা নেই। ওদের পোশাক-আশাক তাঁর ভারি অপছন্দ, আর অপছন্দ তাঁর মেজ নাত-বৌ কুয়ান-পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে এ ব্যাপারে পাল্লা দেয় বলে। সেজ নাতি রে তাঙকে আবার প্রায়ই মেদীর সঙ্গে দেখা যায়।

এইসব ব্যাপারে মেজাজটা তাঁর গরম হয়েই থাকে। আর তিনি ছেলে আর নাতিদের দক্ষিণ দিকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন, ওদের নকল করতে যেও না। ওদের কাছ থেকে ভাল কিছু পাবে না। এইভাবে সেজ ছোকরাকেও আভাসে জানিয়ে দেন, মেদীর সঙ্গে অত মাখামাখি করলে তিনি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

তিন

বুড়ো চি ভাঙা হাঁড়ি-কলসী পাথর ভর্তি করে ফটকের পাশে এনে জমা করালেন।

ন'কর্তা লি লোকাস্ট গাছতলা থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন, ওগো পড়শীরা, এবার ভাঁড়ারে রসদ তোল! শহরের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। এই হুঁশিয়ারি পেয়ে বুড়ো চি'র মনে হোল, তিনি যেন সেই রাজ্যত্রয়ীর দূরদর্শী যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ চু কে লিয়াঙ্‌। নিজের ফটকের পিছন থেকে তিনি ন'কর্তা লিকে জানিয়ে দিতে চাইলেন, আমি প্রস্তুত। মন তাঁর ভারি খুশি।

এই খুশির তোড়ে আশাও এসে দেখা দিল। একটু বা বেশি আশা। তিনদিন যেতে না যেতেই আবার সব শান্ত হয়ে যাবে।

তাঁর ছেলে তিয়েন ইয়ুর দায়-দায়িত্ব ঢের বেশি। শহরের ফটকগুলি যতদিন বন্ধ থাকে, তিনিও ততদিন কাপড়ের দোকানে থাকেন, বাড়ি ফেরেন না।

রোগা, কুঁজো ছেলের বৌ এবার তো জাপানী শয়তানগুলোর কথা শুনে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন—কি বিপদ যে হবে কে জানে! তাঁর মনে ভয়, এই সময়ে তিনি যদি মারা যান, কফিন নিয়ে শহরের বাইরে যাওয়া চলবে না। তাঁর উদ্বেগ এত বেড়েছে যে, তাঁর অসুখও বেড়ে গেল।

রে সুয়ান ভ্রূ কুঁচকে রইলো, একটা কথা কইলে না। সে পরিবারের সবকিছু দেখে, বিপদ-আপদের সময় আস্তে নিঃশ্বাস ফেলারও তার সময় নেই।

রে ফেঙ আর তার 'আধুনিকা' বৌ জাতীয় এই দুর্দৈব বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে চিন্তাই করে না। বুড়ো দাদু বড় ফটক বন্ধ করে দিয়েছেন, তারা আর কি করবে। ঘরে বসে পোকার খেলে সময় কাটায়। এদিকে বুড়ো দাদু উঠোনে বক বক করেন, ওরা এ ওর দিকে তাকিয়ে কাঁধ নাড়ে আর জিভ্‌ বার করে ভেংচায়।

খুদে ধনের মার মাত্র আটাশ বছর বয়েস হলেও বিপদ-আপদের পরীক্ষা তার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। বুড়োর উদ্বেগে তার সম্পূর্ণ সহানুভূতি,

কিন্তু আবার ভয়ও পায় না, অস্থির হয়েও উঠে না। দেহের থেকে মন তার বুড়িয়ে গেছে। বিপদকে সে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করে, তাকে এড়ানো চলে না তো। কিন্তু যদি মানুষকে বাঁচতে হয়, এর মধ্যেই একটু পালাবার পথ খুঁজে নিতে হবে। মানুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, বাকিটা দেবতা ভরসা। এ কালে জন্মেছ, মাঝে মাঝে তো বিপদ-আপদে রুখে দাঁড়াতে হবে, আবার তেমন জায়গায় এড়িয়েও চলতে হবে। সাহস চাই, আবার হুঁশিয়ার হতে হবে। লড়তেও জানা চাই, আবার পিছু হটায়ও পিছনে পড়ে থাকলে চলবে না। দুঃখ সইতে হবে, দুঃখকে জীবনের অংশ করে নিতে হবে, কিন্তু এরই মধ্যে সুখ একটু-আধটু চাই। চেখে নেবে কিছুটা মিষ্টি। এমনি করেই তো মানুষ বাঁচতে পারে, বাঁচে।

বুড়ো চি আর খুদে ধনের মা ভাবনায় পড়েছেন। তাঁরা এই নিয়ে আলাপ করছেন। বিগত বিপদের কথা ভাবছে খুদে ধনের মা, তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। তার কামনা, সামনের বিপদ যেন তাড়াতাড়ি কেটে যায়। বুড়োর সিদ্ধান্ত সে কান পেতে শুনছে, তিন দিনে কেটে যাবে এ বিপদ দেখো। বুড়ো হাসলেন। ঠিক কেটে যাবে। এবার খুদে ধনের মা মনের কথা বললে, জাপানী শয়তানগুলোর মনে কি আছে বুঝি না। আমি তো হলফ করে বলতে পারি, ওদের আমরা চটাইনি। বেশ তো সুখে-শান্তিতে নিরিবিলিতে আছি। আর তলোয়ার আর বল্লম দুলিয়ে লড়বার চেয়ে সে তো হাজার গুণে ভাল! তাই না? আমার তো মনে হয়, জাপানী শয়তানগুলোর হাঙ্গামা বাঁধানোই কাজ। আপনার কি মনে হয় দাদু?

বুড়ো একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমরা যখন ছোকরা ছিলাম, তখন থেকেই দেখেছি আমাদের ঐ খুদে জাপানীরা আমাদের জ্বালাতে পারলে আর কিছু চায় না। এতে ফায়দাটা যে কি তা বুঝি না। এবার হাঙ্গামা না হলে বাঁচি। ওরা আবার সব ব্যাপারে লাভ খোঁজে। এবার মার্কো-পোলো সাঁকোর উপর ওদের নজর।

সাঁকোর উপর আবার নজর কেন—তা আবার মার্কোপোলো সাঁকো? খুদে ধনের মা বুঝতে পারলে না—সে তো পেল্লায় সাঁকো—মুখে পুরেও দেয়া যাবে না, নিয়ে যাওয়াও চলবে না।

কিন্তু ঐ যে সাঁকোর রেলিঙের এক-একটা থামের উপরে রয়েছে একটা করে পাথরের সিংহ, ওরই উপর ওদের তাক্। আমার যদি হাত থাক্‌তো, ঐ পাথরের সিংহগুলো নিয়ে জাপানীদের দিয়ে দিতাম। আর সত্যিই তো ওখানে ওগুলো থেকেই বা কার কি উপকার হচ্ছে।

কিন্তু আমি বুঝি না দাহ্, ঐ সিংহগুলো নিয়ে ওদের কি হবে? এখনো তার মনের ধোঁকা যায়নি!

আরে ঐ জন্যেই তো ওরা জাপানী। যা দেখবে তাই-ই চেয়ে বসবে। বুড়ো জাপানীদের হাল-হদ্দ জেনেছেন বলে খুব খুশি হয়ে গেলেন। জান না তো, বক্সার বিদ্রোহের সময় জাপানীরা এসে পিকিং-এ ঢুকেছিল। জিনিসপত্রের খোঁজে কি তল্লাস করেই না বেড়ালে! প্রথমে চাইত গয়না, ঘড়ি, এমনি সব জিনিস, শেষে তো পেতলের বোতামও নিতে শুরু করলে।

হয়তো পেতলকে ভাবতো সোনা—ওদের চোখ তো এখনো খোলেনি। খুদে ধনের মা চটেই উঠলো—সে ওদের সন্ত বিয়ানো কুকুরছানা বলে গাল দিলে। সে নিজে তো অন্যের একগাছা তৃণও নেবে না।

বড় বৌদি, বড় বৌদি, রে তাঙ হঠাৎ এসে চেঁচিয়ে ডাকলে।

কে! চমকে উঠলো সে। সেজভাই, কি চাও?

একটু চুপ করনা বাপু! তুমি তো মাথা ধরিয়ে দিলে।

বুড়ো দাহুর মুখের উপর সারা পরিবারে একমাত্র রে তাঙ আর খুদে ধনই কথা কইতে পারে। বড় বৌদিকে বললেও, বুড়ো দাহুকে বলাও তার উদ্দেশ্য।

বুড়ো দাহু অমনি কথাটা বুঝে ফেললেন, কি—আমাদের কথা শুনতে ভাল লাগে না? বেশ তো কান বন্ধ করে থাক না!

না, ওসব কথা শুনতে ভাল লাগে না।

রে তাঙ দেখতে ঠিক ওর দাহুর মতো। তেমনি রোগা, ঢ্যাঙা, কিন্তু চিন্তায় তাদের ব্যবধান কয়েক শো বছরের। তার চোখ খুদে হলেও উজ্জ্বল। মণি দুটি যেন কালো দুটি শস্যের দানা। ইস্কুলে বাস্কেটবল খেলায় ওকেই প্রথম সবাই দলে টেনে নিত। ওর শস্যের দানার মতো মণি দুটো বলের সন্ধানে ঘুরতো, চকচক করে উঠতো। বল যখন হাতে আসতো,

মুখের হাঁ-টা বুজে যেত, মনে হোত যেন এক গ্রাস খাবারে মুখ-ভর্তি। তার চোখ আর মুখের ব্যঞ্জনায় চরিত্রের পরিচয় মেলে। চট করে সে রেগে ওঠে, কিন্তু যুক্তিতেও সে দড়। দাদু থেকে বৌদি, আবার বৌদি থেকে দাদুর দিকে সে তাকাচ্ছিল—ওরা যেন তার খেলার মাঠের প্রতিপক্ষ।

জাপানীরা মার্কোপোলো সাঁকে চায়—এ তো বাজে কথা! ওরা চায় পিপিং, তিয়েনসিন, উত্তর চীন—যায় সমস্ত চীন।

সেজভাই, থাক, থাক! বড় বৌ ভয় পেল। বুড়ো দাদু যদি আবার চটে যান!

বুড়ো চি কখনো তাঁর এই নাতির উপর চটেন না, নাতি তো দূরের কথা, নাতির ঘরের পুতও যদি চটে উঠতো, বুড়ো দাদু হয়তো তাহলেও মাপ চাইতেন।

বড় বৌদি, ঐ তো তোমার দোষ। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, সমস্যাটা গুরুতর কিনা, এসব কথা না ভেবেই অমনি থামতে বল।

সেজভাই বড় বৌয়ের উপর রাগ করেনি, কিন্তু তার এই আপস চেষ্টাটাই তার খারাপ লাগে। বড় বৌয়ের কথায়ই সে চটেছে, কিন্তু উষ্মাটা তার উপর নয়—নীতির উপর। ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ না বোঝাটাই তাকে আঘাত করে, আপসও সে পছন্দ করে না।

আমার কথাটা না হয় বেঠিকই হোল সেজভাই, তাতে কি এমন যায় আসে? খুদে ধনের মা সেজভাইয়ের সঙ্গে এবার ঝগড়া শুরু করলে। এতে বুড়ো আর চটে উঠবার ফুরসত পাবেন না। তোমার যখন খিদে পায়, আমার কাছে এসে খাবার চাও। শীত লাগলে চাও কাপড়-চোপড়। আমি কি আর দুনিয়ার তামাম বড় বড় জিনিসের খোঁজ রাখবো!

সেজ চুপ করে গেল। সে যেন বিপর্যস্ত খেলোয়াড়, বল তার বাস্কেটে ফেলতে পারেনি। লম্বা সরু হাত দিয়ে মাথা চুলকাতে লাগলো।

বুড়ো দাদু হাসছেন, তাঁর চোখে দুষ্টুমির ঝলক। ওরে ছোকরা, তোর বৌঠানের কি তুলনা হয় রে! ও আর আমি না থাকলে তোরা তো দু-মুঠো খেতেও পেতিস না। ঐ মুখে আবার দেশের বড় বড় কথা বলিস কি করে?

রে তাঙ দাঁতে দাঁত চেপে বললে, পিপিং-এ জাপানী শয়তান এসে ঢুকলে তখন আর কাউকে খেতে হবে না। সে ঘোর জাপ-বিরোধী।

বক্সার বিদ্রোহের বছরে আট-আটটা জাত—বুড়ো আবার তাঁর সেই পুরানো গল্প শুরু করলেন, বলতে বলতে মাথা তুলে দেখলেন, কখন রে তাঙ উধাও হয়ে গেছে। ছোকরা, তর্কে না পারলে অমনি ছুটে পালায়। আচ্ছা ছেলে!

কে যেন ঘা মারছে সদর ফটকে!

বুড়ো হাঁক পাড়লেন, রে স্থয়ান, ফটকটা খুলে দাও তো! তোমার বাবা বোধ হয় বাড়ি ফিরলো।

রে স্থয়ান রে তাঙকে ডাকলো। তারা দুজনে মিলে পাথর-ভর্তি বড় বড় হাঁড়ি-কলসীগুলো সরালে। ফটক খুলে দেখলে, ফটকের বাইরে তাদের বাবা নয়, দাঁড়িয়ে আছেন কবি চিয়েন। দুই ভাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। শ্রীযুত চিয়েনের দেখা করতে আসা তো অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত ব্যাপার। রে স্থয়ান জানে ব্যাপার ঘোরালো হয়ে উঠেছে, তাই সে অস্থির। রে তাঙও বিপদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, কিন্তু তার ভয় নেই, আছে উত্তেজনা।

শ্রীযুক্ত চিয়েন পরেছেন ঢিলে ফ্যাকাশে হয়ে আসা নীল কোট, হাত আর তার কলারের ধার ছেঁড়া। এখনো নম্র শান্তই আছেন। কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে দেখা করতে আসাই তো তাঁর উদ্বেগের চিহ্ন। আস্তে আস্তে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বুড়ো কর্তা কি বাড়ি আছেন?

আসুন আসুন চিয়েন-খুড়ো, রে স্থয়ান তাঁকে সরে গিয়ে পথ করে দিলে।

রে তাঙ দৌড়ে গিয়ে দাদুকে খবর দিলে, শ্রীযুত চিয়েন এসেছেন!

বুড়ো চি আর পরিবারের সবাই শুনে অবাক হয়ে গেল। বুড়ো চি তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন ফটকে, অভ্যর্থনা করবার ভাষা তিনি খুঁজে পেলেন না।

শ্রীযুত চিয়েন সাদাসিধে মানুষ, ব্যবহারও তাঁর তাই। তিনি প্রথমেই মাপ চাইলেন। এই প্রথম আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। জানেন তো আমি ভারি কুড়ে, নিজের চৌহদ্দির বাইরে যাই না। তাই…

ওঁরা উত্তরের বাড়ির বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। শ্রীযুত চিয়েন রে তাঙকে বললেন, হাজারি, চায়ের দরকার নেই। অতো ভদ্রতা দেখালে আর আসা হবে না।

তিনি সকলকে জানিয়ে দিতে চাইলেন যে, সোজাসুজি কথা পাড়তে চান, একে একে পরিবারের সকলকে কুশল সমাচার জিজ্ঞেস করতে নারাজ।

বুড়ো চি তাঁর কাছে যেটা সবচেয়ে জরুরী সমস্যা, তার কথাই তুললেন, আপনার জন্যেই তো আমার ভাবনা। আমরা অনেক দিনের পড়শী, বন্ধু, আমাদের ভিতরে খোলাখুলি কথা হওয়াই ভাল। আপনার ভাঁড়ারে চাল আছে তো? যদি না থাকে, বলুন। অন্য সব জিনিস না হলেও চলে; চাল না হলে চলে না। না খেয়ে কে থাকতে চায় বলুন!

চাল আছে কি নেই, সেকথা শ্রীযুত চিয়েন বললেন না। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে হাসলেন। তাঁর হাসি দেখে মনে হোল, খাবার যদি ঘরে না থাকে তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না।

আমি, শ্রীযুত চিয়েন চোখ বুজে হাসলেন, আমি এসেছি রে স্যুয়ানের কাছে। ওঁ আমাকে একটু তালিম দিয়ে দিক। তিনি রে তাঙের উপরও চোখ বুলিয়ে নিলেন: কি হবে বল তো? জাতীয় সমস্যার ব্যাপার নিয়ে আমার মতো মানুষ খুব কমই ভাবে। কিন্তু স্বাধীনভাবে আমি থাকতে চাই—আমার দেশ আমাকে এ অধিকার দিয়েছে। ক'দিন ধরে আমি কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না। দারিদ্র্য আর দুর্দশার ভয় আমি করি না, শুধু ভয় পিপিং শহর আমরা হারাব। গাছে ফুল ধরে, দেখতেও সে সুন্দর, কিন্তু সে ফুল যখন ছিঁড়ে আমরা নিই, সে মরে যায়। পিপিং শহরও তাই। সুন্দর শহর। এই শহর যদি আজ শত্রুর হাতে পড়ে, তাহলে সে তো হবে এই ছেঁড়া ফুলেরই সামিল। কি—ঠিক বলিনি?

ওদের জবাব না পেয়ে তিনি বলে চললেন, পিপিং যদি গাছ হয়, আমি তো তার একটা ফুল। যতই নগণ্য হই, পিপিং দখল হলে, আমার আর বাঁচবার দরকার কি!

বুড়ো চি বলতে যাচ্ছিলেন, পিপিং-এর দেয়াল দুর্ভেদ্য, আর তার উপরে তাঁর বিশ্বাসও অটল। সুতরাং, শ্রীযুত চিয়েনের অতো ঘাবড়াবার প্রয়োজন

নেই। কিন্তু বলা তাঁর হলো না। শ্রীযুত চিয়েনের কথার মানে বোঝা যে দায়। এ যেন বাঁধার জিনিসের টিকিটে হিজিবিজি লেখা। দেখতে হরফের মতোই দেখায়, কিন্তু এমন করে লেখা যে মানে বুঝতে গেলে সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। তাই বুড়োর ঠোঁট নড়লেও রা বেরুল না।

রে স্যুয়ানও ক'দিন ধরে আসন্ন বিপদ নিয়ে আলাপ করবার জন্য অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু বুড়ো দাদুর সামনে সব কথা তো সে ভাবে বলা যায় না।

রে তাঙের সে সব বালাই নেই। কি বলতে হবে সে ছকে রেখেছে। কিন্তু শোনাবার তেমন লোক পায়নি। তার বড় ভাইয়ের জ্ঞান আর বোঝবার ক্ষমতা খুব-একটা খারাপ নয়, কিন্তু সে তো চুপ করেই থাকে। তাকে কথা বলতে হলে অনেক কৌশল খাটাতে হয়। আর মেজ ভাই— মেজ ভাই আর মেজ বৌয়ের সঙ্গে শুধু আমোদ-প্রমোদ আর সিনেমা ছাড়া অন্য কথা বলা যায় না। বুড়ো দাদু আর বড় বৌ যতই তেল, নুনের কথা বলুন, ওঁদের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু আরাম পাওয়া যায়, ওদের সঙ্গে বাত-চিত্ করে তাও মেলে না। বুড়ো দাদু আর বড় বৌয়ের কথায় মন টানে না, কিন্তু তবু জীবনধারণেরই ব্যাপার নিয়েই তাঁদের ভাবনা। যা হোক, আলাপের মানুষ আজ মিলেছে। তাও আবার শ্রীযুত চিয়েন। সে জানে শ্রীযুত চিয়েন ভাবুক, তাহলেও তাঁর ভাবধারা আলাদা। রে তাঙ উঠে পিঠ টান করে বললে, আমার মনে হয়, যদি লড়াই না হয়, তাহলে তো পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হবে।

তাই হবে নাকি? চিয়েনের মুখের হাসি নিবে গেল।

তানাকা মেমোরিয়ালের পরে জাপানী যুদ্ধবাজ সর্দাররা চীনে হানা না দিয়ে তো পারে না। ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ায় যে সুবিধে তারা পেয়েছে, তারপরে এ আক্রমণ তো হবেই। তাদের এ অভিযান কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে। তারা দুনিয়া দখল করে আবার হয়তো মঙ্গলগ্রহে হানা দেবার ছক করতে বসে যাবে।

কি—মঙ্গলগ্রহ? দাদুর নাতির কথায় বিশ্বাস হোল না। তিনি তো জানেন না সদর সড়কের কোথায় আছে মঙ্গলগ্রহ।

রে তাঙ দাদুর কথার উত্তর দিলে না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, জাপানের ধর্ম, শিক্ষা, মন, ভূগোল, সামরিক প্রস্তুতি, তার শিল্প,

সংস্কৃতি—সব কিছুই দস্যুবৃত্তির উপর সৃষ্টি—আর আছে যুদ্ধবাজ সর্দারদের অভ্রস্পর্শী কামনা—তাই সব মিলে একই পথে তারা চলেছে—সে পথ আক্রমণের—বিজয়ের। ওরা আমাদের উপকূলে গোপনে এসে হাঙ্গামা তো মাঝে মাঝেই বাধাচ্ছে—এগুলি হচ্ছে আক্রমণের সূচনা। মার্কোপোলো সাঁকোয় যে গুলী চলেছে, সেও তো ওদেরই কাজ। এবার যদি আমরা সহ্য করে যাই, তাহলে দিন দশেক কি মাসখানেকের মধ্যে আবার আর এক জায়গায় হাঙ্গামা বাঁধবে। এবার হয়তো পশ্চিমের ব্যারাক, কি জাতীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরেই শুরু হবে। জাপান বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছে। শুধু গোলমাল লাগিয়ে দিলেই বাঘ দাবড়িয়ে ছোটা চলে।

রে সুয়ান হাসলো, চোখ তার একটু বা সজল।

বুড়ো চি অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের কথা শুনে শিউরে উঠলেন। খুদে খাটালের একেবারে কাছেই তো মন্দির।

শ্রীযুক্ত চিয়েন শান্ত স্বরে বললেন, সেজ ছেলে, আমরা কি করব বল ?

রে তাঙের বলবার কথা খুব কম, সে রেগে উঠেছিল বলে তোড়টা বয়েছে জোরে। রুক্ষ রূঢ় হয়েই গেছে। এবার তাকে দেখে মনে হয়, সে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তার মনে চলেছে দ্বন্দ্ব। একথা আর বলা চলে না। যুক্তি মতো লড়াই হলে জাপানের সঙ্গে চীন যে এঁটে উঠতে পারে না একথা সে জানে। তখন চীন বেশ মুস্কিলেই পড়বে। কিন্তু ভাবাবেগের দিক দিয়ে এখুনি সে প্রতিরোধ করতে চায় তার অগ্রগতি। একদিন দেরী হবে, আর জাপান যে চীনের আরো খানিকটা গ্রাস করে ফেলবে। জাপানীদের তৈরী হওয়া অবধি দেরী করলে, আর পাল্টা আঘাত করা যাবে না। সে চায় প্রতিরোধ করতে। চীন-জাপানের মধ্যে যদি সত্যিকারের লড়াই হোত, সে তার জীবন উৎসর্গ করতো। তার গা দিয়ে ঝরতে লাগল ঘাম। মাথা চুলকে সে বসে পড়লো। মুখখানা তার একটু লাল হয়ে উঠেছে।

রে সুয়ান, তোমার মত কি ?

রে সুয়ান একটু হেসে নীচু গলায় বললে, লড়াই করাই ভাল।

শ্রীযুত চিয়েন চোখ বুজে রে সুয়ানের কথাটা বুঝি চেখে দেখতে লাগলেন।



রে তাঙ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রে স্থয়ানকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, বড় ভাই, বড় ভাই! সমস্ত মুখখানা তার দীপ্ত।

এইবার ছুটে এল খুদে ধন, সে চেঁচিয়ে উঠলো, বাবা, বাবা, ঐ যে—ফটকে—

বুড়ো চি কথা বলার আর ফুরস্থত পেলেন না। নাতির ঘরের পুতির হাত ধরে ফেললেন—যেই ফটক খোলা হয়েছে, অমনি ছুটে গেছিস? আমার কথা তো শুনবি না। জানিস, জাপানী জুজুর ভয় আছে?

খুদে ধন নাকটা একটু কুঁচকে বললে, খুদে জাপানীদের আমি ভয় করি না দাদু। চীন সাধারণতন্ত্র জিন্দাবাদ! সে তার হাত নেড়ে গর্ব ভরে বলে উঠলো।

খুদে ধন— ফটকে কি হয়েছে রে? রে স্থয়ান জিজ্ঞেস করলে।

খুদে ধন বাইরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। রহস্যময় তার হাবভাব। ঐ যে—সেই লোকটা—সে এসেছে—দেখা করতে চায়।

কে?

তিন নম্বর বাড়ির লোক। খুদে ধন লোকটির নাম জানে, কিন্তু তার সম্বন্ধে প্রায়ই সমালোচনা শোনে বলে সেও তার নাম বা খেতাবটা বলতে নারাজ।

কে—শ্রীযুক্ত কুয়ান?

খুদে ধন মাথা নাড়লো।

কে? ওঃ উনি! শ্রীযুক্ত চিয়েন উঠতে গেলেন।

আপনি বস্থন না, বুড়ো চি বললেন।

না, আর বসব না, শ্রীযুক্ত চিয়েন উঠে দাঁড়ালেন।

ওঁর সঙ্গে কথা বলতে না চান, চলুন আমার ঘরে গিয়ে বসি। বুড়ো চি অতিথিকে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখতে চাইলেন।

না, আর একদিন কথা হবে। আমি আবার আসবো। আমাকে এগিয়ে দিতে বাইরে আসতে হবে না। শ্রীযুক্ত চিয়েন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বুড়ো খুদে ধনের কাঁদে ভর করে অতিথির সঙ্গে সঙ্গে বেরুতে যাবেন, এরই মধ্যে তিনি দক্ষিণের বাড়ির খেজুর গাছের তলায় পৌছে গেলেন। রে স্থয়ান আর রে তাঙ ছুটলো তাঁর পিছনে।

প্রভাত-পদ্ম কুয়ানও উঠোনে এসে গেছেন ; নীল রেশমের কামিজ তাঁর পরনে, তার উপরে ড্রাগন আঁকা। ত্রিশ বছর আগে এই ছিল ফ্যাসান, তারপরে পড়ে যায়, আবার চালু হয়েছে। বেশ মানিয়েছে তাঁকে এই পোশাকে, সম্ভ্রান্তই দেখাচ্ছে। কামিজের নীচে ট্রাউজারটি সাদা রেশমের, তার উপর সুন্দর নীল ডোরাকাটা। ট্রাউজারের হাঁটুর কাছটা বাঁধাও নয়, পায়ে আছে সাদা রেশমের মোজা আর কালো মকমলের জুতো, জুতোর তলাও মজবুত। এমনিতর পোশাক যে তাঁর ছায়াও বুঝি ছিমছাম দেখায়। শ্রীযুত চিয়েনকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাঁর নিজের নীল কামিজটা একহাত দিয়ে টানলেন, অন্য হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য। তাঁর মুখে হাসি। মনে হয় যেন বসন্ত-বাতাস হাওয়া করে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে।

শ্রীযুত চিয়েন তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিটি বজায় রাখলেন, কোনো অজুহাতও দেখালেন না। তিনি সোজা ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কুয়ান হাতখানা বাড়িয়েই রইলেন।

কুয়ান রেগে গেলেন, কিন্তু রাগ চেপে, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে, রে স্যুয়ানের হাতখানা নিবিড়ভাবে নিজের হাতে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। রে তাঙের সঙ্গেও করমর্দনের পালা শেষ হোলো।

বুড়ো চি কুয়ানকে দেখতে পারেন না। খুদে ধনকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন তাঁর ঘরে। রে স্যুয়ান আর রে তাঙ অভ্যাগতকে নিয়ে বৈঠকখানায় এল। এইখানেই কথাবার্তা হবে।

শ্রীযুত কুয়ান চি'দের বাড়িতে এসেছেন মোট দুবার। বুড়ি-চি যখন মারা যান তখন এসেছিলেন ধূপকাঠি জ্বালাতে আর মদ উপহার দিতে। এইগুলি সমাজের রেওয়াজ। একটু বসে থেকেই সেবার তিনি চলে যান।

দোসরা বারে এলেন, যখন গুজব উঠলো রে স্যুয়ান মধ্য শিক্ষা ইস্কুলের হেডমাস্টার হতে চলেছে। তিনি তখন এসেছিলেন সম্বর্ধনা জানাতে, বহুক্ষণ ছিলেনও। কিন্তু গুজব গুজবেই রয়ে গেল, ফললো না, তাই তিনিও আর আসেন নি। আজ তিনি শ্রীযুক্ত চিয়েনের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন ; এঁদের সঙ্গেও সেই সূত্রে দেখা করার ইচ্ছে ছিল।

যুদ্ধবাজ সর্দারদের যখন লড়াই চলছিল, প্রভাতপদ্ম কুয়ান তখন সরকারী দপ্তরে কয়েকবার চাকরী পেয়েছিলেন, যদিও খুব বড় চাকরী নয়, তবুও মোদ্দা

আরো বেড়ে গিছলো। শুল্ক বিভাগের কর্তা, একটা বড় জেলার হাকিম, প্রাদেশিক দপ্তরের ছোট কর্তা—এমনি সব চাকরীও মিলেছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে চাকরী পাবার বরাতটা মন্দা-ই যাচ্ছে। তাই নানকিং সরকারের উপর তিনি চটা। রোজই তিনি তাঁর মতো অসন্তুষ্ট মানুষদের বাড়িতে ডেকে আনেন। এঁরা কেউ বা তথাকথিত বিদ্বান, কেউ বা রাজনীতিজ্ঞ, যুদ্ধবাজ সর্দাররাও আছেন। তাঁর আশা, তাঁর সাঙাৎদের মধ্যে কেউ হয়তো আবার জয়ঢাক বাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে ক্ষমতা দখল করে বসবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে টাকাকড়ির বরাতটা আবার খুলে যাবে।

ইদানীং তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করছেন, তন্ত্রেরও গবেষণা চলছে। জঞ্জালের মতো পরিত্যক্ত মানুষই ধর্ম-সংঘগুলিতে ভিড় করে। এরা দেবতাদের কাছ থেকে পুরস্কার চায়, হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে পরিচয় করে। এমনি করেই এদের সময় কাটে। শ্রীযুক্ত কুয়ান এই সংঘগুলির সদস্য হবার দাবী রাখেন। তিনি দেবতা বা বুদ্ধ কাউকেই বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁদের কাজে লাগাতে পারেন—যেমন কাজে লাগান তাঁর গানের গলা আর জুয়াখেলার কৌশল।

কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি একেবারে না-লায়েক। পদ্য বানাতে তিনি জানেন না, প্রবন্ধ রচনাও না। ফুল আর দৃশ্যচিত্র আঁকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যত বিখ্যাত লোককে তিনি জানেন, তাঁরা এ বিষয়ে একেবারে পটু। তিয়েনসিনের বিদেশী এলাকায় যাঁরা থাকেন, রাজনীতিজ্ঞ আর যুদ্ধবাজ নায়কদের মধ্যে যাঁদের এখনো বেশ পুঁজিপাটা আছে, কিন্তু ক্ষমতা নেই—এমন কি তাঁদেরও দু-একটা হুনুর আছে—সুযোগ পেলেই তাঁরা একহাত দেখিয়ে দেন। আর ধনীরা লিখতে বা ছবি আঁকতে না জানলেও তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে ভালবাসেন। এইগুলি হচ্ছে ধনীর অলঙ্কার, যেমন মহিলাদের অলঙ্কার হীরে-মুক্তো।

তিনি বহুদিন থেকেই জানেন, শ্রীযুক্ত চিয়েন পদ্য লেখেন, ছবি আঁকেন, কিন্তু অর্থসম্বল তাঁর তেমন নেই। তাই তিনি কিছুদিন থেকেই ভাবছিলেন, চিয়েনদের কিছু 'প্রণামি' বাবদ টাকা পাঠিয়ে দেবেন। শুয়োরের মাংস যেমন পাইন কাঠের ধোঁয়ায় সুগন্ধি হয়ে ওঠে, তেমনি তিনিও বিদ্যার ধোঁয়ার কিছুটা ভাগ পাবেন। নিজে যে এ কাঠামোয় ছবি আঁকবেন বা পদ্য লিখবেন,

এমন আশা তাঁর নেই। তবে কয়েকটা ধরতাই বুলি শিখে রাখলেই হোল। গোটা কয়েক শিল্পী ও কবিগোষ্ঠীর নাম জানা থাকলে ধনী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মুখ কাচুমাচু করে থাকতে হবে না।

শ্রীযুক্ত চিয়েনের সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে বহু ফন্দি-ফিকিরের কথা তিনি ভেবেছেন, কিন্তু চিয়েন যেন একেবারে গাছের মতো, যতই লুটিয়ে পড় তার তলায়, তবু সাড়াশব্দ নেই। প্রভাতপদ্ম নিজে গিয়ে যে হাজির হবেন তাঁর কাছে, সে সাহসও তাঁর নেই। একবার তাড়িয়ে দিলে আর একবার তো সহজে যাওয়া চলবে না। আজ তিনি দেখেছেন, শ্রীযুক্ত চিয়েন চি'দের বাড়িতে এলেন, তাই ছুটেই এসেছেন। ভেবেছিলেন, চি'দের বাড়িতে পরিচয়টা হয়ে গেলে, তিনি তখনি গোটা কয়েক ফুলের টব কি বোতল দুয়েক ভাল মদ বুড়োকে পাঠিয়ে দেবেন। তাহলেই বিদ্বের ধোঁয়া লাগাবার সুবিধে হবে। তা ছাড়া, শ্রীযুত চিয়েন গরীব হলেও হস্তলিপি আর ছবির সংগ্রহটি তাঁর মূল্যবান। অবশ্য প্রভাতপদ্ম যদি ছবি কিনতে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন তো লিউ-লি-চাঙ মহল্লা রয়েছেই, সেখানে মর্জি-মাফিক ছবি কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ছবি আর কিউরিয়োতে টাকা খরচ করতে তিনি নারাজ। তিনি ভাবলেন, যদি শ্রীযুত চিয়েনের সঙ্গে ভাব জমানো যায় তাহলে হয়তো দু-একখানা মূল্যবান জিনিস হাতে এসে যেতে পারে, আর তাতে খরচও হবে কম। দু-চারখানা কিউরিয়ো দিয়ে সাজানো হলঘরে যখন শুকনো বাঁশপাতা রঙের মদ পরিবেশন করা হবে অতিথিদের, তাঁর পাশে যখন থাকবে সুন্দরী উপপত্নী, তখন তো একটু বেশি জাঁক দেখানো দরকার হবে, তাতে বাড়বে মান। কিন্তু তিনি তো জানেন যে, শ্রীযুত চিয়েনের সঙ্গে ভাব জমাতে যাওয়া আর পেরেকে মাথা ঠুকে মরা একই কথা। মাথা ঠুকেই গেল, তিনি চটে উঠলেন। হাঁ, শ্রীযুত চিয়েন পণ্ডিত মানুষ বটেন, কিন্তু ওঁর চেয়ে ঢের ঢের বড় পণ্ডিতরাও নিজেদের চারদিকে অমন পাঁচিল ঘিরে বসে থাকেন না। 'আমি মুখখানা এগিয়ে দিলাম, আর তুমি কিনা ফিরিয়ে নিলে মুখ! বেশ তো, দেখা যাবে!' প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠলো: হুঁ, যদি সুযোগ পাই, চিয়েন বংশের কিছু-না-কিছু ক্ষতি করে তবে ছাড়ব! কিন্তু বাইরে ঠাণ্ডা ভাবটা বজায় রাখলেন, চি-ভাইদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় মুখে ফুটিয়ে রাখলেন হাসি।

'এ ক'দিন তো পরিস্থিতি খারাপই যাচ্ছে, কিছু খবর আছে নাকি?'

রে সুয়ান কুয়ানকে পছন্দ করে না, কিন্তু কথা না বলে উপায় তো নেই। তাই বললে, না, কোনো খবর নেই। আপনার কি মনে হয়?

শ্রীযুত কুয়ান চোখের পাতা নামালেন, মুখ একটু ফাঁক হয়ে গেল, সবজান্তা ভাব সেখানে। হাঁ, কিছু বলা মুস্কিলই বটে, যাঁদের হাতে ক্ষমতা, তাঁরাই কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ওঁদেব যদি একটা কিছু পরিকল্পনা থাকতো, তাহলে ব্যাপারটা এমনি দাঁড়াত না।

রে তাঙের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। সে অভদ্রভাবেই জিজ্ঞেস করে বসলো, মশাই, আপনি বলুন, আর কিভাবে ওরা আপোসের কথাবার্তা চালাতো?

আমি! কুয়ান একটু হেসে বললেন, আমি কি করে বলব বলুন? রাজনীতিব ধার আমি ধারিনে। এখন বৌদ্ধধর্ম নিয়েই পড়াশুনো করছি, ডুবে আছি। বলি শুনুন, বৌদ্ধধর্মেব আশ্চর্য সৌরভ, এ সৌরভের অন্ত নেই যদি বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে আপনার সামান্য জ্ঞানও থেকে থাকে, যদি তাঁর বাণী আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে আপনি বুঝবেন সে কি জিনিস! যেন এক উত্তম মদিরা, মানুষকে সে শান্তি দেয়, তাকে মাতাল করে তোলে! পরশু মাননীয় সুঙ চিঙের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে ছিলেন মার্শাল ডিং, জেনাবেল লি আব মাননীয় ফেঙ। আমরা পশ্চিম নভ-জননীকে আবাহন করলাম। তিনি এলেন। তাঁর একখানা ছবি তোলা হোল। রহস্যময়ী মা, তাঁর রহস্যের কি আদি-অন্ত আছে! ভাবুন তো একবার, মা নিজে এলেন! ছবিখানা খুবই স্পষ্ট। মার মুখ থেকে মাছের শুঙের মতো দুটো লম্বা নল বেরিয়ে গেছে। মস্ত লম্বা—ঠিক এখান থেকে ওখানে—তিনি তাঁর মুখের এদিক থেকে ওদিক হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—সে একেবারে চমৎকার!

রে তাঙ আবার অভদ্রভাবেই জিজ্ঞেস করলো, এও আপনার বৌদ্ধধর্ম নাকি?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কুয়ান মুখখানা কাঠ-গম্ভীর করে বললেন, বৌদ্ধধর্ম বিরাট, তার তো কোনো সীমারেখা নেই। ভগবান তথাগতের দশ হাঁজার বার জন্ম হয়েছিল। তাঁর তো মৎস্যেও আবির্ভাব হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম নিয়ে আবার বক্তৃতা শুরু হবে, এমন সময় নিজের বাড়ির উঠোনে তিনি গোলমাল শুনতে পেলেন। উঠে পড়ে বললেন, বোধ হয় আমার মেজ মেয়ে ফিরে এল। সে কাল লেক পার্কে গিয়েছিল একটু আমোদ-প্রমোদ করতে, তারপর পার্কের আশেপাশে-সামনে যে রকম বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়, পার্কের ফটকও তখনি বন্ধ করে দেয় কিনা, তাই আর বেরুতে পারেনি। আমার স্ত্রী তো ভেবেই সারা, কিন্তু আমি বিন্দুমাত্র ভাবিনি। যারা বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসী তাদের এই একটা সুবিধে আছে, তাদের মন সব সময়েই বিভোর হয়ে থাকে কিনা, তাই উত্তেজনা সেখানে ঘেঁসতে পারে না। যাই, দেখি গে। আচ্ছা, আর একদিন বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা হবে।

তিনি বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মুখখানায় প্রশান্তি, জোরে চলেছেন পা চালিয়ে।

চি-ভাইরা এগিয়ে এল ফটক অবধি। রে সুয়ান সেজভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল, তার মুখখানা লাল হয়ে গেছে।

ফটকে এসে কুয়ান নিচু গলায় রে সুয়ানকে বললেন, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। যদি জাপানীরা শহরে এসেই যায়, তাহলেও আমাদের একটা উপায় হবেই। কিসের না উপায় হয় বলুন! একদিন আমার ওখানে আসুন! আমরা প্রতিবেশী, একজন আর একজনকে না দেখলে চলবে কেন।

চার

আবহাওয়া গরম, কিন্তু জাতির মন তো ঠাণ্ডা-অবসন্ন। পিপিঙের পতন হয়েছে।

ন'কর্তা লি লোকাস্ট গাছের নিচে বৈঠক বসিয়েছেন। তিনি সবাইকে বললেন, সাদা কাপড় তৈরি রাখো, সাদা নিশানই যদি তুলতে হয়, তাহলে সময় মতো রঙ দিয়ে মাঝখানে একটা গোল বল এঁকে নিলেই হবে। বক্সারের সময় তো আমরা অমনি করে নিশান তৈরি করেছিলাম।

ন'কর্তার স্বরে বিষণ্ণতা ; শক্ত-সমর্থ শরীরে ক্লান্তি। কথা শেষ করে তিনি উবু হয়ে বসলেন। সবুজ শুয়ো পোকারা কিলবিল করছে গাছতলায়, সেদিকে চেয়ে রইলেন।

ন'গিন্নিও উদ্বিগ্ন, বিপদের আভাস পাচ্ছেন ক'দিন ধরে। কি ঘটছে, জিজ্ঞেস করেন নি, কিন্তু আজ জেনেছেন জাপানী ফৌজ ঢুকেছে শহরে। তাঁর বড় চোখ দুটি মিটমিট করছে, মুখখানাও ম্লান। বুড়ো স্বামীকে আর গাল পাড়ছেন না, তিনি বেরিয়ে এসে তাঁরই পাশে উবু হয়ে বসেছেন।

রিক্সাওয়ালা খুদে সুই খালি ঘর-বার করছে! কোনো কারণ নেই, তবু করছে। আজ আর রিক্সা নিয়ে সে বেরুতে পারেনি, ঘরে একটা দানা নেই। ক'বার ঘর-বার করে ন'গিন্নির সামনে এসে দাঁড়ালো।

দিদিমা তোমার তো দয়ার শরীর, কিছু দেবে নাকি?

ন'গিন্নির বকবকানি থেমে গেছে, বাজখাঁই গলায় আর চেঁচাচ্ছেনও না, তিনি নিচু গলায় বললেন, বাছা একটু সবুর করো। আমি কিছুটা ময়দা দিয়ে আসব 'খন।

আহা, আমার ভালো দিদিমা তুমি! তাতেই হবে, খুদে সুই চাপা গলায় বললে।

দেখ বাছা, আর একটা কথা বলি। বৌয়ের সঙ্গে অতো কোঁদল কোরো না! জাপানী শয়তানরা ঢুকেছে শহরে। ন'গিন্নি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

নাপিত সাতসূর্যও বাড়িতে বসে আছে। আজ দোকান-পাট খোলেনি, ব্যবসা বন্ধ। সেলুনে সে কাজ করে না, পাশের রাস্তার দোকানীদের মাস-কাবারী কামায়। পুরোনো দিনের কসরতে সে দোরস্ত! যেমন চোখ আর কান পরিষ্কার, মালিশ আর দাড়ি কামানোয় ভারি পটু। কিন্তু হাল আমলের কসরৎ সে জানে না, জানে না চুল কোঁকড়াতে, চুলে দশ আনা ছ' আনা ছাঁট দিতে। শেখবারও সখ নেই। দোকানীদের কামায়, তাই দরকারও নেই। বাড়িতে বসে আজ একা একা দু-পেয়ালা মদ টেনেছে। মুখখানায় একটু রং ধরতেই সে বেরিয়ে এল। মদের তাকদেই তার এখন তাকদ, তাই হতাশা আর ক্রোধ প্রকাশের চেষ্টা করলে।

ন' খুড়ো, তুমি সবাইকে ডেকে সাদা নিশান ওড়াতে বলছ, ভালই করেছ।' কিন্তু সাদা নিশান যার ইচ্ছে ওড়াক, আমি সাতস্থয্যি, আমি তো ওড়াব না! জাপানী শয়তানদের আমি ঘেন্না করি। ওরা আস্থক না একবার খুদে খাটালের গলিতে, সাতস্থয্যি ওদের দেখে নেবে! হুঁ, তার রাগ তো দেখেনি ওরা!

যদি অন্য সময় হোত, খুদে সুই তর্ক জুড়ে দিত ওর সঙ্গে, আর সে তর্ক শেষ হোত ঝগড়ায়। যখনি ছুনিয়ার কোনো বড় বড় সমস্যা নিয়ে ওরা তর্ক করে, ওরা ঠিক হুজন ছুদিকে যায়।

সাতস্থর্য খুদে সুইকে চলে যেতে দেখে নিরাশ হোলো। তখনো তার আশা, বুড়ো লি তার সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করতে বসে যাবেন। কিন্তু ন'কর্তা লিও চুপচাপ, সাতস্থর্য ভড়কে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ঠায়, ন'কর্তা এবার মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে বললেন, সাতস্থয্যি, যাও বাড়ি গিয়ে ঘুমোওগে! সাতস্থর্য একটু মাতাল হয়েছে, কিন্তু ন'কর্তাকে ঘাঁটাবার সাহস তার নেই। সে একটু হেসে বাড়ি ফিরে গেল।

ছ' নম্বর বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে এল না। ছোট ওয়েন আর তার স্ত্রী এই সময়ে গলা রেওয়াজ করেন, আজ তাঁদের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মেরাপ-বাঁধিয়ে লিউ তার তলোয়ারখানায় জোরে শান দিতে লেগে গেল।

তাঁদের মাথার উপরে আর উড়োজাহাজ উড়ে এল না, নগরের বাইরে থেকেও এল না তোপের শব্দ। চারদিকে সব চুপচাপ, নিঝুম।

রে স্থয়ান একটু মোটাসোটা, তার বাপের মতো দেখতে। তাঁর চেহারায় জাঁকজমকের চিহ্ন নেই, তবে রুচি তার আছে। সারা চি-পরিবারে সেই একমাত্র ভদ্রতা জানে। বুড়ো দাহ্ আর তিয়েন ইয়ু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী; তাঁদের ব্যবহার আর কথাবার্তা সহজ। রে ফেঙ কিছু লেখাপড়া শিখেছে—সে রাতে একাউণ্টেন্সি আর ব্যাঙ্কিং পড়তো, বুড়ো দাহ্ আর বাপকে তার সহ্য হয় না। সে বিলাসীদের অনুকরণ করে। অনুকরণও জবর। আভিজাত্যের পালিশটুকুর প্রতি তার ঝোঁক, কিন্তু সেটুকু রপ্ত হয়নি; আবার অন্যদিকে তার খাঁটি উত্তরাধিকারটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছে। রে ফেঙের স্বভাব যেন ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সর্দার আরদালীর মতো, অথবা সে বুঝি গুণ্ডার সর্দারই হবে। সেজ—রে

তাও একেবারে সোজাসুজি চলে—ঐতিহ্যেরও ধার সে ধারে না, আবার নকল করাও তার ধাতে পোষায় না। রে স্যুয়ান তবু এসব দিকে নজর দেয়—কে জানে কোথায় এসব সে শিখেছে। সে ভদ্র, বিনয়ী, ভান সে করে না। বাবা আর দাদুর মতো কাজ সে মন দিয়েই করে। খরচে সে সাবধানী, একটা পয়সাও বৃথা ব্যয় করে না, কিন্তু আবার দান করতেও জানে। যেখানে দান করাই উচিত, সেখানে সে গণনা-যন্ত্র ব্যবহার করে না। যখন সংকটের সময় আসে, সে যেন বসন্তের মেঘময় দিন হয়েই দেখা দেয়! সবাই নিশ্চিন্ত হতে পারে যে ঝড় উঠবে না, বৃষ্টি ঝরবে না। সুখের সময় সে মুখ টিপে হাসে, অট্টহাসি তার শোনা যায় না। সে যেন আপন মনে হাসে আর ভাবে, কেন, কেন সে খুশি।

রে স্যুয়ান চীনা আর পশ্চিমী সাহিত্য বেশ খেটে খুটে পড়েছে, এ দুই বিষয়ে তার বেশ জ্ঞানও আছে। এ বড় আফসোস যে, এ বিষয়ে আরো পড়বার জন্যে. বিদেশে যাবার সুযোগ ঘটেনি—টাকাকড়িও জোটেনি। ইস্কুলে সে-ই সেরা শিক্ষক, কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রিয় নয়। ছাত্রদের খারাপ লেখায় নম্বর দেয় না। সহযোগী শিক্ষকদের সঙ্গেও তার ব্যবহার নিখুঁত, আলাপে-ব্যবহারে কোথায় থামতে হয় সে জানে। নিজের শ্রমের অন্ন সে খায়, তাই অন্যের তোষামোদ কুড়োবার তার দরকার হয় না।

ভাবনায় রে স্যুয়ান সেজভাইয়ের ধারায় চলে; কিন্তু সে যেন আরো গভীর। সারা পরিবারে শুধু সেজভাইয়ের সঙ্গেই তার কথা হয়। দুজনেরই আবার ধরন-ধারণ আলাদা—নিজের ভাবনা বাইরে প্রকাশ করতে চায় না রে স্যুয়ান। এটা হামবড়া ভাব নয়, 'আমি বেনোবনে মুক্তা ছড়াব না' এ কথাও সে ভাবে না—নিজেকে সে মনে মনে ছোট ভাবে। তার চরিত্রে কতগুলি মেয়েলি ভাব আছে। কিছু করবার আগে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। যেমন—ওর যখন বিয়ের বয়েস হয়, প্রেমজ বিবাহের সার্থকতার কথা ও জানতো, কিন্তু বাপের ঠিক-করা পাত্রী য়ুন মেইকেই শেষ অবধি বিয়ে করলো। যাকে ভালবাসে না তারই বন্ধনে সারা জীবন বন্দী হয়ে থাকা উচিত নয়, একথা ওর জানা ছিল, কিন্তু বুড়ো দাদু, বাবা আর মাকে অসুখী করতে সে চায়নি। তাঁদের চোখের জল আর বিষাদ ডেকে আনতে চায় নি। সে ভেবেছিল পরিবারের বুড়োবুড়িদের দিক থেকে, আর ভাবী

স্ত্রীর পরিবারের দিক থেকে। অনেক ভেবে সে পরিবারের অসুবিধাটা বুঝেছিল, এ তো পৃথিবীর অভাব-অভিযোগেরই অঙ্গ। তাই সে বিয়ে করে বসলো; আর নিজেকে দুর্বল ভেবে পেল তার হাসি। আবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো দাদু আর বাপের মুখ দেখে খুশিও হোল। নিজের গর্ব হোল, আত্মোৎসর্গের এ গর্ব।

বরফ পড়া শুরু হতে রে স্নুয়ান বেড়াতে যায় উত্তর সাগর পার্কে, সাদা পাহাড় তার কল্পনাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় কোন্ সুদূরে। ডাগোবা থেকে যখন নেমে আসে, মনকে সেখানে ফেলে আসে না, হারিয়ে ফেলে না উঁচু পর্বত আর দুরন্ত সমুদ্রের কল্পনায়; সে তখন ভাবে পরিবার আর ইস্কুলের প্রতি কর্তব্যের কথা। ফিরতি পথে কর্তব্যপরায়ণ সন্তান আর স্নেহময় পিতা হিসাবে বুড়ো দাদু আর ক্ষুদে ধনের জন্য কিছু মেঠাই কিনে নিয়ে যায়। যখন দূরে যেতে পারব না, উধাও হতে পারব না আকাশে, তখন বাড়িই ফিরে যাই, বুড়ো আর ছেলেপুলেদের খুশি করি। তার মুখখানা ঠাণ্ডায় লাল হয়ে ওঠে, অজান্তে মুখখানায় হাসি দেখা দেয়।

বদ অভ্যেস তার নেই বললেই চলে। পীত মদ সে এক বৈঠকে পোয়া-ভর টেনে ঠিক থাকতে পারে, কিন্তু নতুন বছরে কি অমনি কোনো উৎসবের দিন ছাড়া ছোঁয়ও না। তামাক সে খায় না। চা আর জলে তার কাছে কোনো প্রভেদ নেই। তার আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে বুড়ো দাদুকে বাগানে ফুলের কেয়ারি করতে সাহায্য করা, আর সপ্তাহে দু-একদিন পিঙ আন সিনেমায় যাওয়া। সে ইংরেজি খারাপ বলে না, কিন্তু আলাপে সড়গড় নয়, তাই ছবি থেকে কথাবার্তা শিখতে চায়। যখন সিনেমায় যায়, আগেভাগে দিয়ে সামনের সীট নেয়। এতে টাকাও যেমন বাঁচে, তেমনি স্পষ্ট শুনতেও পায়। সিনেমায় বসে পিছনে কখনও তাকায় না। সে জানে মেজভাই আর মেজ বৌ বসে আছে প্রথম শ্রেণীতে। সে সামনের সীটে বসে বলে লজ্জা পায় না, কিন্তু ভয় হয়, পাছে মেজভাই আর তার বৌয়ের তাকে ওখানে দেখে অস্বস্তি হয়।

পিপিঙের যখন পতন হোল, রে স্নুয়েনের অবস্থা তখন ভয়ানক। তেঁতে-ওঠা উনুনের গায়ে পিঁপড়ের মতো একবার সে বাইরে যাচ্ছে আর আসছে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার সে শান্ত ভাব আর তখন নেই, আর সে

ভানও করলো না। ঘর থেকে বেরিয়ে একবার মুখ তুলে তাকালে আকাশের দিকে। নির্মল উজ্জ্বল আকাশ,—তার মনে হোল এখনো সে পিপিঙের নীল, উজ্জ্বল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা নোয়ালে, প্রখর সূর্যের আলো যেন তার চোখের সামনে ঘন অন্ধকার হয়ে এল। আকাশ তখনো উজ্জ্বল নীল, কিন্তু পিপিঙ তো আর চীনাদের নেই। তাড়াতাড়ি সে ঘরে ফিরে এল! অতীতের জ্ঞানের নিরিখে সে খতিয়ে দেখতে বসলো, চীন-জাপানের এই যুদ্ধের সঙ্গে পৃথিবীর কি সম্পর্ক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার চললো। হঠাৎ কানে এল বৌ আর খুদে ধনের স্বর। ভয় পেয়ে সে বুঝি চমকে উঠলো, পৃথিবীর পরিস্থিতির মেঘ থেকে সে দৈনন্দিন জীবনে আবার হাবুডুবু খেতে লাগলো। চীন-জাপানের লড়াই হয়তো পৃথিবীর ভূগোল আর ইতিহাস বদলে দেবে, কিন্তু এখন তো পরিবারের নিরাপত্তা, খাওয়া-পরার কথাই জরুরী ব্যাপার। বুড়ো দাদুর প্রায় পঁচাত্তর বয়েস, এখন আর মেহনতি করা তাঁর পোষায় না। তার বাবার আরও কম, তাছাড়া তার বয়েসও পঞ্চাশের উপরে। মা রুগ্না, উদ্বেগ তাঁর সয় না। মেজ ভায়ের যা আয় তাতে স্বামী-স্ত্রীর হাত-খরচা কুলিয়ে যায়। সেজ ভাই এখনো ছাত্র। যদি পৃথিবীতে শান্তি থাকে, তাহলে নির্ঝঞ্ঝাটে তারা খেয়ে-পরে থাকতে পারে। কিন্তু আজ যে পিপিঙ গেল! কি করবে সে? কিছুদিন হোল সংসারের কর্তৃত্ব তার উপরে এসে পড়েছে, কিন্তু এখন তো দায়িত্ব আর অসুবিধে দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তাছাড়া, সে একজন নাগরিক। জ্ঞান-বুদ্ধি তার আছে। দেশের এই দুর্দশায় তার তো বেরিয়ে গিয়ে কিছু করা উচিত। আর এক দিকে আছে পরিবার। বুড়ো আর ছেলেপুলের পাল। এমনিই তারা তার উপর নির্ভর করে থাকে, এখন তো আরো থাকবে। সে কি এখন হাত ঝেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে? না, না, পারে না। কিন্তু যদি চলে না যায়, সে তো থাকবে শত্রুর পায়ের তলায়—পিষে যাবে। 'বিজিত দেশের দাস' হবে। তা তো সহ্য হবে না তার।

যাচ্ছে আর আসছে আর যাচ্ছে—এমন করেও কোনো বুদ্ধি এল না মগজে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা দেখা দিল না। তার বিদ্যাবুদ্ধি তাকে সেরা কর্তব্যের নির্দেশ দেয়, তার সাংসারিক বুদ্ধি তাকে ফিরিয়ে আনে ছোটখাটো সমস্যায়। মোঙ্গোলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তার বংশের বীর ওয়েন তিয়েন সিয়াঙ,

তাঁর কথাই মনে পড়লো ; আরো কত বীর ছিলেন বংশে ! আবার ভাবতে বসলো তু ফুর কথা। মুসাফির তু ফু, অন্তর্বিপ্লবের সময় নির্বাসনে রইলেন, তাঁর মুসাফির জীবন আর গৃহের দুর্নিবার কামনা কবিতায় রূপ পেল !

মেজভাই এখনো তার কামরায় আছে—শুনছে জাপানীদের বেতার ঘোষণা।

সেজভাই উঠোনে। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, দেখ মেজভাই, এখনো যদি ওটা না থামাও, আমি ঢিল মেরে চুরমার করে দেব !

খুদে ধন পেয়েছে ভয়, সে ছুটে দিদিমার ঘরে চলে গেল। দিদিমা ক্ষীণস্বরে ডাকলেন, এই সেজ, সেজ !

রে সুয়ান কথা বললে না, সেজ ভাইকে টেনে ঘরে নিয়ে এল।

দু'ভাই বহুক্ষণ ঠায় বসে রইল, এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনেই কি যেন বলতে চাইছে, কিন্তু কোথায় শুরু করবে জানে না। হঠাৎ সেজভাই ডাকলে, বড় ভাই ! রে সুয়ান নিরুত্তর। খেজুরের আঁটি যেন তার গলায় বিঁধেছে। সেজভাইও কি বলবে ভুলে গেল।

নিস্তব্ধ ঘর, আঙিনাও তাই ; পরিষ্কার দিন, উজ্জ্বল সূর্য, কিন্তু সূর্যের আলোয় মহানগরী যেন পুরানো কবরখানার মতো পড়ে আছে। হঠাৎ শব্দ ভেসে এল, পর্বত থেকে বুঝি কারা গড়িয়ে ফেলছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—তেমনি—তেমনি শব্দ !

শোন, সেজ ভাই শোন ! রে সুয়ান ভাবলে বোমারু বিমানের শব্দ।

সেজ ভাইয়ের মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠলো, শত্রুর ট্যাঙ্ক এসেছে মানুষকে ভয় দেখাতে। তার ঠোঁট কাঁপছে, সে চেষ্টা করছে নিজেকে সংযত করতে।

বড় ভাই কান পেতে রইল, হাঁ তাইত, ট্যাঙ্ক—অনেক···ট্যাঙ্ক। ঠোঁট কামড়ালো রে সুয়ান।

বায়ুমণ্ডলে শব্দ বেড়ে চলেছে, মাটি কাঁপছে। যে চীন শান্তি ভালবাসে, যে পিপিং শান্তিপ্রিয়—অগণন প্রাসাদ, মন্দির আর বেদী যে গড়েছে, গড়েছে মঠ, আবাস, বাগিচা, উচ্চচূড় মিনার আর নব ড্রাগনের যবনিকা উত্তর সাগর উদ্যানে—যেখানে সারি সারি চলে গেছে প্রাচীন সেডার গাছের সার, যাদের বেড় তুমি পাবে না বাহু দিয়ে ; অবনত উইলো আর মার্বেল সেতুর সার,

চার ঋতুর ফুলের সেখানে সমারোহ—যেখানে হাল্কা সূক্ষ্ম কথা মানুষের মুখে, ব্যবহারে ভদ্রতা, ব্যবসায়ে সাধুতা ; যেখানে আছে রাজকীয় অপেরা—এই সেই চীন—আর তার সেরা পিপিং! কেন আজ হঠাৎ তারই আকাশ ছেয়ে যাবে বিমানে, কেন তার পথ কেঁপে উঠবে ট্যাঙ্কের দুঃসহ পীড়নে!

সেজ ভাই আবার ডাকলে, বড় ভাই!

পথে ট্যাঙ্কের সার শব্দ তুলে চলেছে, যেন ভূমিধ্বংসী মাইন বিস্ফুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে উন্মত্ত গর্জনে। রে সুয়ানের কানে তালা লাগলো, বুকেও বুঝি।

বড় ভাই!

রে সুয়ান মাথা হেলিয়ে বললে, বল!

আমি চলে যেতে চাই বড় ভাই। দেশে দাস হয়ে আমি থাকতে পারব না!

হুঁ—রে সুয়ানের মন পড়ে আছে ট্যাঙ্কের দিকে। ট্যাঙ্ক চলেছে দলিত মথিত করে দিয়ে।

আমাকে যেতেই হবে, রে তাঙ আবার বললে।

যাবে—কোথায় যাবে ভাই?

ট্যাঙ্কের শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

যেখানে হোক—শুধু এখানে নয়। উদয়-সূর্যের নিশানের নিচে থাকব না।

ঠিক, ঠিক! রে সুয়ান মাথা নাড়লো! তার পুষ্ট মুখে শিহরণ খেলে গেল।

কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না। কে জানে কি হবে। হয়তো দুদিন পরেই আবার সন্ধি হবে, তাহলে তো চলে যাওয়া বৃথাই হবে। আর তো তোমার পাস দেবার বছরখানেক বাকি।

তোমার কি মনে হয়, জাপানীরা পিপিং গ্রাস করে চুপ করে যাবে?

উত্তর চীন দিয়ে দিলে করবে।

উত্তর চীন গেলে, পিপিং আর রইলো কোথায়?

রে সুয়ান একটু ভেবে বললে, আমি কি ভাবছিলাম জানো—যদি ওদের আমরা অর্থনৈতিক শোষণের অধিকার দিই, ওরা হয়তো বা সৈন্য সরিয়ে নেবে। সৈন্য নিয়ে হানা দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতি বই তো নয়।

দূরে ট্যাঙ্কের শব্দ উঠছে, এ যেন হাল্কা বাজ।

রে স্থয়ান কান পেতে শুনে বললে, তোমাকে আমি বাধা দেব না। শুধু ক'দিন অপেক্ষা কর।

যদি আর চলে যাবার উপায় না থাকে? কি হবে তখন?

রে স্থয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, আমার তো যাওয়া হবে না।

বড় ভাই, চল একসঙ্গে চলে যাই!

রে স্থয়ানের মুখে আবার ম্লান হাসি ফুটে উঠলো, কি করে যাই? সমস্ত পরিবার, ছেলে-বুড়ো সবাইকে কি—

সত্যি বড় ভাই, কি আফসোস! এস গুণে দেখি তো, দেশে তোমার আমার মতো ক'জন আছে। যারা উচ্চশিক্ষা পেয়েছে, ক্ষমতাও আছে, দেশের কাজ যারা করতে পারে—অথচ—

আমার পক্ষে অসম্ভব ভাই, বড় ভাই আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, তুমি দেশের কাজ কর ভাই, আমি সেবা করি আমার পূজনীয়দের।

রে স্থয়ান দুই যুগের ভিতরে আটক, বন্দী। বুড়ো চি পুরানো দিনের চীনের মানুষ। শতকরা একশো ভাগই তাঁর পুরানো, তাঁর ছেলে তিয়েন ইয়ু শতকরা সত্তর ভাগ পুরানো, তিরিশ ভাগ নতুন; আর রে স্থয়ান এসে ঠেকেছে সমান সমান ভাগে। দু'যুগের সমস্যাই সে বোঝে, তার যুক্তি আর মহত্বে তার আস্থা আছে, তাই দু'যুগের দায়িত্বই সে বহন করছে।

ন'কর্তা লি উঠে দাঁড়ালেন। সার্জেণ্ট পাই এসেছে, তার সঙ্গে লোকাস্ট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। সার্জেণ্টের বয়েস চল্লিশ পার হয়ে গেছে। নিখুঁত করে তার দাড়ি কামানো, দেখতে বেশ চটপটে বলেই মনে হয়। ভারি গল্পে লোক। যখন কোন বাড়িতে সে আসে—বিবাদ বা লড়াই লাগলে—সে যেমন গালও দেয়, আবার থামিয়ে দিতেও চেষ্টা করে। এমনি করে বড় বড় সমস্যা হাল্কা করে দেয়, আবার হাল্কা সমস্যা দেয় তুড়ি মেরে উড়িয়ে। এইজন্যে খুদে খাটালের সবাই তার ধারালো জিভকে ডরায়, তবে তার উঁচু মনের খাতির সে পায়।

কিন্তু আজ সার্জেণ্ট পাই মনমরা হয়ে আছে। সে জানে, তার কর্তব্য এখন বিরাট, দায়িত্ব গুরু। পুলিশ যদি না থাকে, শৃঙ্খলা থাকে না। নিজে খুদে খাটাল এলাকার সার্জেণ্ট হলে কি হবে, আজ তার মনে হচ্ছে সারা

পিপিঙের অল্প-বিস্তর দায়িত্ব তার উপর এসে পড়েছে। পিপিংকে সে ভালবাসে। এখনকার পুলিশের চাকরী তার গর্ব। কিন্তু আজ তো জাপানীদের দখলে এল পিপিং, আজ থেকে জাপানীদের হয়েই নগরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। পিপিং যদি বিদেশীর হাতে এসে থাকে, তাহলে এখন আর শৃঙ্খলা কথাটার মানেই হয় না। এটা অবশ্য যুক্তিরই কথা। কিন্তু তবু সে এখনো উর্দি পরে আছে, এখনো সে সার্জেণ্ট। কি করছে সে নিজেই জানে না।

ন'কর্তা লি জিজ্ঞেস করলেন, সার্জেণ্ট, আপনার কি মনে হয়? ওরা যাকে তাকে খুন করবে নাকি?

ন'কর্তা, কিছুই তো বলতে পারছি না, সার্জেণ্ট পাইয়ের স্বর নিচু হয়ে এল। আমি যেন মস্ত বোয়েমের তলায় পড়ে আছি, উপরে তার ঢাকনা আঁটা, মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমাদের তো মেলা সৈন্য ছিল, তারা গেল কোথায়?

ওরা লড়েছিল ঠিকই, কিন্তু শত্রুকে এঁটে উঠতে পারেনি। হাল আমলে লড়াই তো আর সাহসের ব্যাপার নয়, শরীরের তাকদও নয়। ওদের কামান আর বন্দুক একেবারে পয়লা নম্বরের। তাছাড়া আবার আছে উড়োজাহাজ আর ট্যাঙ্ক। আমরা তো—

তাহলে পিপিং গেল!

এই তো মস্ত সব ট্যাঙ্ক চলে গেল, দেখেন নি?

তাহলে সত্যি?

সত্যি।

ন'কর্তার স্বর মৃদু, তাহলে কি করব আমরা? সার্জেণ্ট, আপনাকে বলি, জাপানী শয়তানগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না!

সার্জেণ্ট পাই উঠোনের চারদিকে তাকালো, কেই বা দেখতে পারে বলুন। এখন আসল কথা বলি। ন'কর্তা, আপনি তাড়াতাড়ি চি আর চিয়েন পরিবারে গিয়ে তাঁদের বইগুলো পুড়িয়ে ফেলতে বলুন। জাপানীরা বিদ্বানদের ঘেন্না করে। যদি 'জনগণের তিনটি দাবী' আর ওর থেকেও সাংঘাতিক বিদেশী বই থাকে—তাহলে যেন আর দেরী না করে। এ মহল্লায় ওদের বাড়ি দুটোতেই তো বই-পত্তর আছে। আপনি যান, আমি গেলে হয়তো মন্দই হবে। নিজের উর্দির দিকে সে তাকালো।

ন'কর্তা ঘাড় নেড়ে আস্তে আস্তে 'লাউয়ের কোমরের দিকে' চললেন। যাবার উৎসাহ তাঁর নেই, তবু চললেন।

ন'কর্তা চিয়েনদের বাড়ি গিয়ে ফটকে ঘা দিলেন। জবাব নেই। তিনি জানতেন, চিয়েনের স্বভাব একটু অদ্ভুত, তাছাড়া যখন 'ফৌজী ঘূর্ণি আর ঘোড়সওয়ারের লণ্ডভণ্ড কাণ্ড' শুরু হয়; তিনি এ নিয়ে হৈ-চৈ করতে চান না। তাই ন'কর্তা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে গেলেন চি'দের বাড়ি।

বুড়ো চি আদর করে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন, ন'কর্তা মনে একটু শান্তি পেলেন। তাঁর ভয় ছিল বুড়ো চি হয়তো তাঁর অভ্যেস-মাফিক, 'পুরানো শস্য আর পচা তিসির' গল্প ফাঁদবেন, তাই তিনি নিজের কথা শুরু করে দিলেন। বইয়ের উপর বুড়ো চি'র তেমন দরদ নেই; কিন্তু বই তো টাকা দিয়ে কেনা হয়, সেগুলি পোড়াতে আফসোস কার না হয়! তিনি বললেন, তাঁর নাতিরা বই বাছুক, যেগুলি পোড়াতে হবে সেগুলি বিক্রিওয়ালার কাছে বেচে দিলেই হবে। সে তো ঝোড়া ঘাড়ে করে দোরে দোরে গিয়ে পুরানো জিনিস বেচাকেনা করে।

ন'কর্তা পড়শীদের নিরাপত্তা চান। তাই বললেন, না, না, ওতে হবে না। বিক্রিওয়ালা আজকাল আর আসে না, আর যদি আসেও, বই কেনবার হিম্মৎ তার হবে না। তিনি এবার জানালেন, চিয়েনদের বাড়িতে তিনি ঢুকতে পারেন নি।

বুড়ো চি উঠোনে গিয়ে রে তাঙকে ডাকলেন, রে তাঙ, বই সব পুড়িয়ে ফেল—সব বিদেশী বই পুড়িয়ে ফেল! দামী বই, কিন্তু রেখে কে ঝক্কি পোয়াবে বল?

সেজ ভাই বড় ভাইকে বললে, দেখ—দেখ—বই পোড়াও, বহ্নি-উৎসব কর, পণ্ডিতদের জ্যান্ত কবর দাও! কি করবে এখন?

সেজ ভাই, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমাকে যেতেই হবে, কিন্তু আমি তো যেতে পারব না। এ আমার নিয়তি। তুমি যাও, আমি বই পুড়িয়ে ফেলি, সাদা নিশান ওড়াই, বিজিত দেশে দাস হয়ে বেঁচে থাকি! বড় ভাই আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না, ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললে।

এই সেজ ছোঁড়া, শুনছিস্ আমার কথা? বুড়ো চি হাঁক পাড়লেন।

শুনেছি, এখুনি শুরু করে দেব, বিরক্ত হয়ে উঠলো রে তাঙ। তারপর গলা নামিয়ে রে স্থয়ানকে বললে, বড় ভাই, তুমি যদি এমনি কর, আমি কি করে যাই ?

রে স্থয়ান হাতের তেলো দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললো। তুমি তোমার পথ দেখ ভাই ! শুধু মনে রেখো সেজ ভাই, সব সময়ে মনে রেখো, তোমার বড় ভাইয়েরও মতবাদ আছে। কয়েকবার সে ঢোক গিললো।

পাঁচ

রে তাঙ বই বাছাই আর পোড়ানোর ভার বড় ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিল। বই সে ভালবাসে, কিন্তু এখন অনুভব করলে, বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তার আর ঘনিষ্ঠ নয়। বই রেখে এখন ধরতে হবে লাঙা তলোয়ার আর বন্দুক। পুথি ছাড়, ধর হাতিয়ার ! নিজের বাড়ির উপর টান আছে, নিজের কলেজ আর পিপিংকে সে ভালবাসে, কিন্তু এখন তার মনে তারা আর জুড়ে বসে নেই। তার নওজোয়ানের উষ্ণ রক্তে এখন সুদূরপ্রসারী কল্পনার খেলা চলছে। সে স্বপ্ন দেখছে, গৃহহারা হয়ে সে ঘুরছে। কিন্তু কি করে যাবে, কোথায় যাবে এখনো ঠিক করতে পারেনি। কিন্তু মন দেহের খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। উঠোনে বা নিজের কামরায় বসে সে চেয়ে থাকে উঁচু পাহাড় আর বিরাট নদীর দিকে, ঝাণ্ডা উড়তে দেখে,—বিষণ্ণ বিস্তৃত পৃথিবী, আর রক্তের মতো লাল মাটি। সে ছুটে যেতে চায় দুনিয়ার সেইখানে, যেখানে আছে তরতাজা যৌবনের রক্তধারা, যেখানে বন্দুকের নির্ঘোষ বেজে ওঠে ঘন ঘন। না, না, হেথা নয়, এই বিষণ্ণতায় নয়, অন্য কোনোখানে। সে চায় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে, লড়তে। যদি সে কোনো রকমে যেতে পারে সেখানে, ঐ উদিত সূর্যের পতাকা সে সরিয়ে ফেলবে, সেখানে সে তুলবে আর এক নিশান। নীল আকাশ আঁকা সে-নিশানে, আর আছে শ্বেত সূর্য, দেখবে, সেই ঝাণ্ডা জোরালো হাওয়ায় উড়ছে পত্‌পত্‌ করে।

চীনের শত শত বছরের নিপীড়ণ জন্ম দিয়েছে এমনি নওজোয়ানের। এরা ঘর ছেড়ে যেতে চায়, চায় আজাদী—পরিবারের জুলুম সেখানে থাকবে

না; থাকবে না সমাজের জুলুম। জাতিকে যে শৃঙ্খল বেঁধে রেখেছে, সে শৃঙ্খল ওরা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চায়। আবার মানুষ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। চীনের নতুন ইতিহাস পত্তন করতে না পারলে ওদের জীবন বৃথা; কোনো অর্থই নেই সে-জীবনে। সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়াই ওদের জীবনের সাধনা, ব্রত। রে তাঙ ওদেরই একজন। হাজার হাজার বছর ধরে চীনা পরিবারের যে পবিত্র সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা তার কাছে মামুলি জীবনধারণের সম্বন্ধ মাত্র, প্রাত্যহিকতায় সে ম্লান, ধূলি-ধূসর। তাই দেশের আহ্বান তার হৃদয়ে বেজে উঠছে। কোনো বাধা তার যাত্রাপথ রুদ্ধ করে দাঁড়াতে পারবে না। পক্ষোদ্গত পাখীর মতো সে নীড় ছেড়ে চলে যাবে, তাকাবে না পরিবারের দিকে। বন্ধনবিহীন সে, তার এক বন্ধন মাত্র আছে—সে তার দেশ।

বুড়ো চি যখন ন'কর্তা লি'র কাছে শুনলেন, লি-এর হাঁকডাকেও চিয়েন বাড়ির ফটক খোলেন নি, তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি জানেন চিয়েন পরিবারে বহু পুথি আছে। ভাবলেন, রে তাঙকে পাঠাবেন ওখানে। রে তাঙ বলতে না বলতেই রাজি হয়ে গেল।

সাঁঝবাতির সময় হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড লোকাস্ট গাছ দুটোকে দেখাচ্ছে মস্ত দুটো মুরগীর মতো, তাদের কালো পাখায় ঢেকে দিয়েছে পাঁচ-ছ'খানা উঠোন; পক্ষপুটে যেন আশ্রয় পেয়েছে পরিবারগুলি। আঙিনাগুলো আঁধার, শুধু তিন নম্বরের আঙিনায় আলো চল্‌কে পড়েছে (খুদে খাটালে এই এক বাড়িতেই বিজলী আলো আছে); আঙিনার আলোয় যেন নববর্ষের উৎসবের দ্যুতি। দেওয়ালের উপরে লোকাস্ট গাছের পাতায় যেন সাদা রঙ লেগেছে, সবজে-সাদা রং। রে তাঙ পাতলা পর্দার মতো দেওয়ালটার কাছে এসে দাড়ালো। এক মুহূর্ত কেটে গেল; তারপর সে এসে পৌছলো এক নম্বর বাড়ির সদরে। ফটকে পড়লো ঘা। জোরে ঘা মারতে সাহস হচ্ছে না। দরজার কড়াটা ধরে দুবার টুক্ টুক্ করে নেড়ে দিলে। হাল্‌কা নাড়া, হাল্‌কা শব্দ; কয়েকবার কাসলো খুক্‌খুক্ করে। এবার দরজার আড়াল থেকে নিচু গলায় জবাব এল, 'কে'? চিয়েন খুড়োর গলা।

আমি—রে তাঙ, দরজার ফাঁকে মুখ দিয়ে সে বললে।

কাঠের খিল্ খসে পড়লো তাড়াতাড়ি, দরজা খুলে গেল।

ফটকের পথটা আঁধার। রে তাঙ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। ঢুকবে কি ঢুকবে না। শেষে সে ঠিক করলো, তার আসার কারণ সে বলে ফেলবে। তারপর চিয়েন খুড়ো তাকে ভিতরে ডাকুন আর না-ই ডাকুন সে তাঁর ব্যাপার।

চিয়েন খুড়ো, বলছিলাম কি—আমাদের বইগুলো লুড়িয়ে ফেললেই ভাল হয়। আজ সার্জেণ্ট পাই ন'কর্তার কাছে তাই বলে গেছে।

ভিতরে চল, কথা হবে। চিয়েন দরজা বন্ধ করে দিলেন। এবার রে তাঙের আগে গিয়ে বললেন, উঠোনটা অন্ধকার আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

ঘরের দরজায় এসে তিনি রে তাঙকে অপেক্ষা করতে বলে আলো জ্বালাতে গেলেন। রে তাঙ বললে, 'থাক্ না।' চিয়েন জবাব দিলেন, জাপানীরা এখনো আলো জ্বালানো তো নিষেধ করেনি। একটু যেন কৌতুক তাঁর স্বরে।

আলো জ্বালানো হতে রে তাঙ দেখলো উঠোনে ছোট আর বড় ফুল গাছের মেলা।

এসো, এসো, সেজ, ভিতরে এসো! ভিতর থেকে ডাকলেন চিয়েন। রে তাঙ গিয়ে ঢুকলো ভিতরে। বসতে যাবে, এমন সময় বুড়ো জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? বই পোড়াতে হবে?

রে তাঙ কামরার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, এই তার দিয়ে গাঁথা পুঁথিগুলোর বোধ হয় এ দুর্দশা পোয়াতে হবে না। জাপানীরা ছাত্রদের ভয় করে, যাঁরা নতুন বই পড়েন, তাঁদের ভয় করে। পুরানো পুঁথির ভয় তাদের নেই।

ওঃ—চিয়েন মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলেন, কিন্তু আমাদের ফৌজদের জান তো, ওদের মধ্যে খুব কম লোকই লেখাপড়া জানে, ওরা ভারি ভারি তলোয়ার দোলায়, আর জাপানীদের মাথা কাটে, তাই না?

রে তাঙ হাসলো: যদি আক্রমণকারীরা স্বীকার করতো যে, ফৌজ ছাড়াও মানুষ আছে, আছে আর সবাই; তাদের আছে আবেগ, তারা রেগে গিয়ে জেগে উঠতে পারে, তাহলে তারা আক্রমণই করত না। জাপানীরা প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের কুকুর ছাড়া ভাবে নি। ওরা ভাবে, ওদের লাথি মার, পেটাও, ওরা টু শব্দটি করবে না।

চিয়েন তাঁর অতিথিকে বসতে বললেন ইসারায়, তারপর বললেন, এ তো তাদের মস্ত ভুল। জাতির বড় বড় কথা নিয়ে বলার আমার অভ্যেস নেই। যা জানি না তা নিয়ে কথা বলতেও চাই না। কিন্তু যখন আমার দেশকে ধ্বংস করতে কেউ আসে—তা তো সইতে পারি না। অন্য দেশের মানুষ এসে আমাদের প্রভু হয়ে বসবে এত তো আমি হতে দিতে পারি না। আমার নিজের দেশের মানুষ আমার উপর হুকুম চালাক, যা-ইচ্ছে তা করুক, কিন্তু বিদেশী কেন চেপে বসবে বুকের উপর?...তেমনি নিচু স্বর, কিন্তু নম্র নয়, আবেগে থরথরো। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে থেকে আরো নিচু গলায় বললেন, জানো, আমার মেজ ছেলে আজ ফিরেছে?

মেজভাই, কোথায় সে? ওর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

আবার চলে গেছে, এসেই চলে গেছে, চিয়েন যেন কি গোপন করছেন এমনি তাঁর ভাব।

কি বললে সে?

সে—কি বললে? চিয়েনের স্বর ফিস্‌ফিস্ করে ঝরে পড়ছে, সে আমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছিল।

কোথায় গেল?

বুড়ো মৃদু হাসলেন, আমার মেজ ছেলে আবার এমন মানুষ যে, তার-বাঁধা পুঁথি সে পছন্দ করে না, বিদেশী বাঁধানো বইও তার ভাল লাগে না। কিন্তু তার-কথা, জাপানীর অধীনে সে থাকবে না। বোঝ এবার?

রে তাঙ মাথা নাড়লো, মেজভাই ওদের সঙ্গে লড়তে গেছে। কিন্তু একথা কাউকে বলা ঠিক হবে না।

কেন, ঠিক হবে না? চিয়েনের স্বর চড়ছে। তিনি যেন রেগে উঠেছেন।

উঠোনে চিয়েন-গিন্নী ক'বার কেসে উঠলেন।

কিছু না গো, চি'দের সেজ ছেলের সঙ্গে কথা বলছি। জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে চিয়েন বললেন; আবার তাঁর স্বর মৃদু হয়ে এল, এ আমার গর্ব সেজ, এ আমার গর্ব! যে আমি একটা আগাছা কখনো উপড়ে ফেলিনি, তার ছেলে কিনা এমনি হোল! ভয়ের কি আছে বল তো? শব্দের সম্ভার থেকে আমি শুধু জীবনে কাব্য খুঁজেছি, সেই তো আমার সম্বল—আমার আবার ভয় কি! আমার ছেলে, সে ট্রাক চালায়, তার দেশের এই

দুর্দিনে, তার পরিবারের দুর্দিনে, তার রক্ত ঢেলে দিয়ে নতুন কাব্য রচনা করতে চলে গেল। আমি ছেলে হারালাম, কিন্তু দেশ পেল এক বীরকে। জাপানীরা যখন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার ছেলে কি আমাদের ধ্বংস করেছে? ওদের সঙ্গীনের সামনে বুক পেতে দিয়ে বলব, হাঁ, হাঁ, হাঁ! আরো বলব, তোমরা ঘোড়সওয়ারের ঘূর্ণি তুলতে পার, কিন্তু আমরা তোমাদের একসঙ্গে ছিন্নভিন্ন করে দেব। আমাদের এই দেশে, তোমাদের ঐ গাড়ী, ঐ বাতি, তোমাদের পানীয় আর খাদ্য, সব বিষাক্ত হয়ে উঠবে সেদিন তোমাদের কাছে। এক নিশ্বাসে বলে গেলেন চিয়েন, তারপর চোখ বুজলেন। তখনো কাঁপছে তাঁর ঠোঁট।

রে তাঙ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, সে ছুটে গিয়ে চিয়েনের সুমুখের হাঁটু গেড়ে বসলো, মাথা রাখলো মাটিতে, চিয়েন-খুড়ো, আপনাকে আমি অলস-স্বপ্নবিলাসী বলে ভাবতাম। ভাবতাম, আপনি বুঝি অলস কল্পনাই শুধু করতে পারেন। আমি ক্ষমা চাইছি।

চিয়েন কিছু বলবার আগেই রে তাঙ উঠে পড়ে বললে, চিয়েন খুড়ো, আমিও যাব ঠিক করেছি।

যাবে? চিয়েন রে তাঙের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। যাও, তোমার যাওয়া উচিত। হাঁ, যাও। তোমার হৃদয়ে আছে উত্তাপ, দেহে আছে শক্তি। যাও।

আর কিছু বলবেন না? রে তাঙের মনে হোল চিয়েন খুড়োর মতো এতো আপন দুনিয়ার আর কেউ নেই, তার বাবা, মা, বড় ভাইয়ের চেয়েও আপন—সবার চেয়ে তিনি আপন।

শুধু একটা কথাই বলব, কখনো হৃদয়কে ছাইয়ের গাদা হতে দিও না, যেন নিভে না যায় আগুন তাই দেখো—অনুশোচনাকে দিও না কাছে ঘেঁসতে। যদি বুকে ছাইয়ের গাদা জমে ওঠে, অন্যের ভুলই শুধু দেখতে পাবে, নিজের অবনতি চোখে তো পড়বে না। সেজ, এই কথাটা শুধু মনে রেখো!

রাখব, মনে রাখব। চলে যাবার পরে শুধু মাঝে মাঝে ভাবনা হবে বড় ভাইয়ের জন্যে। উনি তো চিন্তাশীল, যথেষ্ট ওঁর বিদ্যাবুদ্ধি, কিন্তু পরিবারের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছেন। পালাবার উপায় নেই। বাড়িতে এমন কেউ

নেই যার সঙ্গে দু-দণ্ড উনি প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন। পরিবারের কর্তা হিসেবে, তাঁকে মুখে হাসিও ফুটিয়ে রাখতে হয়। আমি চলে গেলে, চিয়েন-খুড়ো আপনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন। উনি তো আপনার ভক্ত।

দেব—দেব, তুমি শান্ত হও। পিপিঙে আছে লাখে লাখে মানুষ, তাদের তো সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। পিছনে থাকবে কত লোক! আমরা তো দুর্বল, বৃদ্ধ, পরিত্যক্ত সৈনিকের দল। কিন্তু আমাদেরও হতে হবে সাহসী, তোমাদের মতোই সাহসী হতে হবে। তোমরা যাবে গুলীর মুখে এগিয়ে, আর আমরা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়বার জন্য প্রতীক্ষা করবো, আমাদেরও শক্তি হারালে চলবে না। এসো, তোমার সঙ্গে বসে একপাত্র মদ খাই।

চিয়েন টেবিলের নিচে হাতড়ে এক বোতল মদ বার করলেন। সবুজ মদ, মূল্যবান মণির মতোই তার রঙের জৌলুস, তেমনি অমল! এ তাঁর নিজের তৈরী জিনিস। পাত্র খোঁজার আর তর সইলো না, তিনি চায়ের দুটি পেয়ালায় ঢেলে দিলেন। মাথা হেলিয়ে দিয়ে পেয়ালা নিঃশেষ করে ঠোঁট চাটলেন।

রে তাঙ-এর সে-শক্তি নেই, কিন্তু দুর্বলতা দেখাতে সেও রাজি নয়। এক চুমুকে সেও শেষ করে ফেললো পেয়ালা। সুরার উগ্রতা জিভ থেকে বুকে চলে গেছে, জ্বলছে বুক।

চিয়েন-খুড়ো, সে কয়েকবার ঢোক গিলে বললে, আবার যে বিদায় নিতে আসতে পারব তা মনে হয় না, আপনি কথাটা গোপন রাখবেন।

পাকস্থলীতে ক্রিয়া শুরু হয়েছে, একটু বা ঝিম ঝিম করছে মাথা। বাইরে যাবার তার ইচ্ছা, ফাঁকা জায়গায় হাওয়া তার ভাল লাগবে। আমি যাই! চিয়েনের দিকে তাকাবার তার ভরসা নেই, সে সোজা কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

চিয়েন বসে রইলেন, হাত এখনো মদের বোতলের উপর! চুপচাপ বসে আছেন। রে তাঙ ঘরের বাইরে আসতেই তিনি উঠে গেলেন। সদর ফটক খুলে দিলেন, সে চলে গেল। এবার আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে।

বড় তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করেছে পেয়ালা, তাই বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় রক্তে যেন ঢেউ উঠলো, যেন বাঁধ ভেঙে গেছে নদীর। প্রচণ্ড ঢেউ ভেঙে

ভেঙে পড়ছে। লোকাস্ট গাছের অন্ধকার ছায়ায় এসে সে দাঁড়ালো। তার মন যেন ম্যাজিক লণ্ঠন, তার সামনে চলেছে ছবির মিছিল। কত তার বলা, কত না-বলা রয়ে গেল—ছায়াছবির ভিড় চলে গেল। অথচ সময় তো বেশি নয়। রাতের খাওয়ার পরের ঘটনা। এখন কয়লাঘাটা ষ্ট্রীটে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো, মেছোবাজারেও তাই, সব জায়গায়ই তাই। মোদো গন্ধ মুখে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে তুলতে মানুষ ভিড় করেছে থিয়েটারে। থিয়েটারে, উজ্জ্বল আলোর নিচে মানুষের মাথা ঘুরছে, যুদ্ধের পালা চলছে অপেরায়। হঠাৎ দৃশ্য বদলালো, পুবের বাজার আর উত্তরের নদীর পার থেকে এল জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী। কাঁধে কাঁধ দিয়ে আসছে, চোখে তাদের ভালবাসার ফুল ফুটেছে। ওরা চলেছে চেনকোয়ঙ, কি, পিং আন, কি কুয়াঙ লু ছবিঘরের দিকে। ওখান থেকে লাউড-স্পীকারে ভেসে আসছে উদ্দাম উন্মত্ত প্রেমের গান। আবার চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো উত্তর সাগর। ছায়ায় ছায়ায় ভেসে চলেছে খুদে ডিঙি, আলো থেকে দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। ঘন পদ্মের বন, পাতায় ঢেকে ঢেকে যাচ্ছে ডিঙি, দেখা যায় না। সেণ্ট্রাল পার্কও আছে, প্রাচীন সেডার গাছের ছায়ায় আধুনিক-আধুনিকরা বেড়াচ্ছে, কেউ বা বসে পড়েছে। এমনি সময়ে তো শহর জীবন্ত, চারিদিকে তার ব্যস্ততা। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাম, মোটর সবই ছুটে চলেছে তাড়াতাড়ি, শব্দ উঠেছে, তুমুল শব্দের ঐক্যতান।

হাওয়ায় মিলিয়ে গেল দৃশ্য। কান পেতে সে শুনছে। পথ নিঝুম। ট্রামের ঘণ্টি, ফেরিওয়ালার হাঁকডাকও আজ রাতে শোনা যাচ্ছে না। পিপিং বুঝি নিঃশব্দে কাঁদছে। চুপি চুপি কাঁদছে।

হঠাৎ লোকাস্ট গাছের নিচে পড়লো আলো। এ যেন স্বপ্নে-দেখা আলো, তেমনি ফস্‌ফরাস-নীল—তেমনি ম্লান। হঠাৎ বাড়িগুলোর বাঁশগাড়ির ডগায় ডগায় আলোর ঝলক দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। এখন আরো অন্ধকার, আগের চেয়েও অন্ধকার। দূরে আকাশে আর-এক ঝলক আলো—আলোর তীর যেন বিঁধে আছে। সে-তীর দেখা দিল, মিলিয়ে গেল। আর একটা রেখা আবার টেনে দিয়ে গেল আলো। আকাশে আলো, নিচে ঘন অন্ধকার। আকাশে দুলছে আলোর রেখা, তারাও নিষ্প্রভ। পিপিঙের কালো রাতের গভীরে আক্রমণকারীদের শ্বাপদ চোখ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রে তাণ্ডের নেশা খানিকটা ছুটে গেছে। কখন যে সে কেঁদেছে জানে না, মুখ ভিজে গেছে চোখের জলে। চোখের জল সে সহজে ফেলে না। কিন্তু মদের নেশা, এই নীরবতা, আকাশের আলোর কম্পন, তার উত্তেজিত হৃদয়, সবকিছু মিলে চোখের জল নিঙড়ে নিঙড়ে বার করেছে আজ। এ জল মুছে ফেলতে সে চায় না। এ জল থাক, এ যেন তার হৃদয়ের শান্তির বারিধারা।

সে শান্ত হবে। কমবে তার ব্যথা।

তিন নম্বরের ফটক খুলে গেল। মেদী এসেছে বাইরে, পথে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা তুলে চারদিকে তাকাচ্ছে। বাপের মতো সে বেঁটেখাটো, ছোট মেয়ে, কিন্তু বড় সুন্দর, বড় ভালো। চোখ তার ভারি সুন্দর, ভারি পাতায় ঢাকা, ঘন পক্ষ্ম তাকে ঘিরে আছে। আর তারই তলায় ঘন কালো মণি দুটি। যখন সে তাকায়, জীবন্ত হয়ে ওঠে চোখ, যেন কথা কয়। চোখ দুটি ওর যদি না থাকতো, তাহলে শরীরের বাঁধুনি থাকলেও মন টানতো না মানুষের। চোখ দুটিই ওর জীবন্ত করে তুলেছে দেহকে। সব খুঁত ঢেকে গেছে। যতই জটিল হোক অনুভূতি, ওর চোখে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবেই। ওরা যেন ছুঁয়ে দিলে ফুল ফোটে! জ্ঞান তার তেমন নেই, সাধারণ, মামুলি তার চরিত্র, গুণও এমন কিছু নেই যা দেখে তারিফ করা যায়, কিন্তু আছে দুটি চোখ, আর তারা সবকিছু যেন জিনে নিয়েছে। ওকে দেখে মানুষ আর সব ভুলে যায়, শুধু ভাবে: সুন্দরী, সুন্দরী মেয়ে! ওর চোখের আলো ছুঁয়ে দিতে পারে মানুষের মন, তাকে পাগল করে দিতে পারে। হাঁ, এমনি ওর চোখ!

সাদা খাটো রেশমি গাউন ওর পরণে, খাটো কিমোনো কিন্তু ঢিলে। কলার নেই, সাদা গলা দেখা যাচ্ছে। তার চিবুক উঁচু, মনে হয় যেন কোনো অপ্সরী, আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে, সেখানে কি ঘটলো। উঠোন থেকে আলো এসে পড়েছে লোকাস্ট গাছের পাতায় পাতায়। তারই ছায়া নাচছে ওর সাদা পোষাকে, যেন রঙ-পেন্সিল দিয়ে হাল্কা টানে কে এঁকে দিয়েছে ছায়া। ছায়ার আল্পনায় ভরে গেছে গাউন, তবু সিল্কের সাদা ঝলক উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

আলো আর ছায়া মিশে কাঁপছে কিমোনো—নরম রেশমের ঢেউ কাঁপছে, ঝল্সে উঠছে থেকে থেকে—যেন এক ড্রাগন-পতঙ্গ পাখা মেলে ঘুরছে হাওয়ায়।

রে তাঙ-এর বুকখানায় দ্রুত স্পন্দন, সে এগিয়ে গেল তার দিকে। তাড়াতাড়ি চলেছে, হাল্কা পায়ে এগুচ্ছে। এবার একেবারে সুমুখে—মুখোমুখি। চমকে উঠলো মেদী, বুকে হাতখানা উঠে এল।

তুমি! হাত সে নামিয়ে নিলে। ভয়ে তার চোখের মণি আরো চকচকে আরো ঘন কালো। রে তাঙ-এর দিকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রে তাঙ সহজ স্বরে বললে, চল, একটু বেড়িয়ে আসি!

মাথা নাড়লো মেয়ে, সে যেন ক্ষমা চাইছে। না—না সেদিন উত্তর সাগর পার্কে গিয়ে তো রাতে আটকা পড়েছিলাম। আজ আর সাহস হয় না।

আর পার্কে দুজনে যাব কিনা তাই বা কে জানে!

কেন? ফটকের দরজায় হাত দিয়ে সে মুখ তুলে তাকালো।

রে তাঙ নীরব। তার বুকে চলেছে তুমুল তোলপাড়।

বাবা তো বলেন, ভয়ের কিছু নেই।

ওঃ—রে তাঙ-এর স্বরে অসন্তোষ। যেন সে চমকে গেছে।

তার চেয়ে ভেতরে এস। দু-এক দান মা-জঙ্গ খেলি। কি অস্বস্তি ভাব তো? সে পা বাড়িয়ে দিলে।

মা-জঙ্গ খেলা আমি জানি না। কাল দেখা হবে। যেন সে ছুটে ধরতে যাচ্ছে বল, এমনি করেই নিজেদের ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ফটকের দরজা খুলে ফিরে তাকালো মেদীর দিকে। এখনো সে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিরে গিয়ে দু-কথা বলবে কিনা ভাবলো, কিন্তু চটে সে গেছে, তাই দড়াম করে ফটক বন্ধ করে দিলে।

মেদীর কথা আর ধরন-ধারণে সে নিরাশ হয়েছে। সে ভাবতেও পারেনি, নগর আক্রমণের সময় মা-জঙ্গ খেলার কথা কারো মনে আসতে পারে। যাক্—ওর কথা যাক্! জাপানীরা ঢুকেছে শহরে—এখনো কিনা ও ভাবছে মেদীর কথা…ওর কি কোনো আদর্শ আছে? বিছানায় গিয়ে ও শুয়ে পড়লো।

ঘুম আসছে না। গোড়া থেকে ভাবতে শুরু করলো, কিন্তু কিছুই তো স্পষ্ট নয়। একবার—দুবার—তিনবার ভাবলো। ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, কিন্তু তবু এল না ঘুম।

মেদীর কথা মনে পড়লো। পিপিঙ-এ যদি থাকে, ওর স্বরূপ কি হবে? ওর বাবা তো সরকারে কেউকেটা হয়ে বসতে চাইবে—ওবে হয়তো একটা জাপানীর হাতে সঁপে দেবে। হঠাৎ ও উঠে বসলো। ও হবে জাপানীর সেবাদাসী! ওর সৌন্দর্য, ওর ঐ নম্র ব্যবহার, ওর ঐ স্বর, ঐ হাজার হাজার গুণে সুন্দর চোখ—ঐ নিয়ে ও সেবা করবে এক বর্বর পশুর? যদি তাই-ই হয়, ওর কল্পনা যদি সত্যই হয়, ও কি-ই বা করতে পারে? প্রথমে জাপানীদের তাড়াতে হবে—হাঁ, সেই তো প্রথম কাজ····আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল। মুরগী ডাকছে। সে গুণতে লাগলো। একটা·· দুটো····তিনটে····

ছয়

পার্কের ঝরণায় বসন্তের জল এখনো মন্থর ধারায় বয়ে যাচ্ছে। পার্কের পুকুরে, তিন প্রাণীদের পার্কের সায়রে এখনো ফুটছে সবুজ পদ্ম, এখনো গন্ধ ছড়াচ্ছে তারা। উত্তর আর পশ্চিমের পাহাড় এখনো গর্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে। স্বর্গের মন্দিরে রাজকীয় উদ্যানে এখনো প্রাচীন পাইন আর সবুজ সেডার মিতালি পাতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাল দেয়াল আর সোনালি টালির রঙে রঙ মিশিয়ে। তেমনি চমৎকার দৃশ্য। কিন্তু পিপিঙ-এর মানুষরা পিপিঙ-এর সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে বসে আছে। পিপিঙ আর পিপিঙ-এর অধিবাসীর নয়। সবুজ সেডার গাছের উপরে উড়ছে জাপানের ঝাণ্ডা। জনগণের চোখ আর দেখতে চায় না, শিল্পীর হাত চায় না আঁকতে, কবির মন চায় না ভাবতে পিপিঙ-এর গৌরব আর সৌন্দর্যের কথা। মানুষের চোখে চোখে প্রশ্ন ঝলসে ওঠে: কি করবো? জবাবে শুধু মাথা নাড়ে, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়।

শুধু প্রভাত-পদ্ম কুয়ানই কোনো অসুবিধে টের পান নি। তিনি মুখে যা বলেন, আর মনে যা বিশ্বাস করেন—দুয়ে একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মুখে তাঁর দেশ আর জাতির কথা, আর মনে শুধু নিজের স্বার্থ। তিনি নিজেই সব। তিনি উজ্জ্বল সূর্য, তাঁর চার ধারের উপগ্রহ হচ্ছে বড়

লাল লঙ্কা, পীচ-মঞ্জরী আর মেয়ে দুটি। তিন নম্বর বাড়ির চারদিকের দেয়াল, আর খুদে খাটাল নিয়েই তাঁর বিশ্ব। এই বিশ্বে দেশ আর জাতি বুলি মাত্র। যদি নিজের দেশকে বিকিয়ে দিয়ে তিনি আরো ভাল খেতে বা পরতে পান— এই বিশ্বের অধীশ্বর প্রভাত-পদ্ম কুয়ান এখুনি তা করবেন, দেশকে বিকিয়ে দেবেন। তাঁর ধারণা, বাঁচা মানেই আরামে থাকা, বিলাসে থাকা। তাঁর এই আদর্শে পৌছতে তিনি কোনো কিছু করতেই পেছপা নন।

নানকিঙ-এর উপর বহুদিন থেকেই তাঁর রাগ—জাতীয় সরকার তাঁকে কখনো বড় চাকরী দেন নি। জাপানীরা তাঁকে কি তা দেবে? তিনি ভাবতে বসলেন; তাঁর মুখে বসন্তের বরফ-গলানো হাওয়ার মতো হাসি খেলে গেল। হাওয়া বরফ গলায়, উপরে ভাসে জল। তেমনি হাসি যেন তাঁর। ভাবনাটা এই: জাপানীরা আর হাজার—দশ হাজার কর্মচারী এনে হাজির করতে পারবে না। যারা জাপানের সঙ্গে বিরোধ করবে না, নিশ্চয়ই তাদের তারা কাজ দেবে।

শহরের মানুষ বিব্রত, অস্থির; কিন্তু কুয়ান এরই মধ্যে তোড়জোড় করতে লাগলেন। প্রথমে ফটকের বাইরে গিয়ে যা দেখে এলেন, তাতে খুব একটা ভরসা পেলেন না। প্রতিটি চৌমাথায় সশস্ত্র জাপ-রক্ষীদল। চার নহবৎখানার রাস্তায়, নতুন চৌরাস্তা আর জাতীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের সামনে তারা জুড়ে বসে আছে। তাদের বন্দুকে চকচকে ঝকঝকে সঙীন। যারা সেখান দিয়ে যাচ্ছে, তারাই জাপানী রক্ষীদের সেলাম ঠুকে যাচ্ছে। প্রভাত-পদ্ম সেলাম ঠুকতে গর্‌রাজী নন, বরং সেলাম বাজিয়েই তাঁর সুখ। জাপানী সেলামের কেতাও তার দুরস্ত, কিন্তু তাঁর তো কোনো বিশেষ তক্‌মা নেই। যদি জাপানীরা তাঁকে না চেনে, তারা বাধাও তো দিতে পারে! ওদের আছে অঢেল গুলী, আর খেলা-খেলায়ও ওরা দশ-বিশটা মানুষকে মেরে ফেলতে পারে।

ঘোড়ার খুর যেমন জিরোয় না, তেমনি প্রভাত-পদ্ম কুয়ান একটুও জিরুলেন না। আশাও ছাড়লেন না। তিনি আর তাঁর বৌ বড়লাল লঙ্কা ক'দিন ধরে ছুটোছুটি করে বেড়ালেন। এবার তাঁরা বুঝতে পারলেন, রাজনীতিক আর সামরিক সদর ঘাঁটি এখন তিয়েনসিনে। পিপিং দুনিয়ার আজব বাগিচার শহর, সংস্কৃতির লীলাভূমি, কিন্তু রাজনীতি আর সামরিক

ব্যাপারে তিয়েনসিন তার উপরে। কিন্তু কুয়ান নিরাশ হলেন না। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস, শীগ্‌গীরই বরাত ফিরবে। তিনি একটু বা ঢিলে দিতেই হয়তো চাইলেন, কিন্তু বড় লঙ্কার উৎসাহে তাও সম্ভব হোলো না। সফল তাঁকে হতেই হবে—বড় চাকুরী তাঁর চাই।

দ্বিতীয় বিয়ের পরে তিনি পীচ-মঞ্জরীর সঙ্গে মিলে সম্মিলিত শক্তি গড়ে তুলেছিলেন। বড় লঙ্কার বিরুদ্ধে লড়তে হবে তো। বড় লঙ্কা যদিও বকবক করেন, কোঁদলেও কম যান না, কিন্তু সোজা পথে চলেন। যুক্তি যদি তাঁর মনমতো হয়, তিনি তখুনি ঠাণ্ডা হয়ে যান। চাইকি মাপও করেন। তাই প্রভাত-পদ্ম কুয়ান গোপনে যেমন পীচ-মঞ্জরীকে সমর্থন করেন, আবার বড় লঙ্কাকেও মিষ্টি কথা বলেন। তাঁর মনে হয়, এতে করে পীচ-মঞ্জরীকে দেখতে না পারলেও, স্বামীর ঘাটতি তিনি ক্ষমা করবেন। বড় লঙ্কাও জানেন, না বয়েসে, না চেহারায় তিনি পীচ-মঞ্জরীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন। স্বামীকে ক্ষমা করলে হারকে জিৎ বলে মনে করা যায়। তাঁর বন্ধুবান্ধব অসংখ্য, এদের সঙ্গে তিনি স্বামীকে ভিড়িয়ে দেন। তিনি এমনি করেই পীচ-মঞ্জরীকে দেখাতে চান—দুজনেরই প্রতাপ আছে। তিনিও কম যান না।

পিপিঙ দখলের পর তাঁরও তেমন অসুবিধে হোল না। শুধু থিয়েটারে যেতে পারলেন না আর মা-জঙ্গ খেলার সাথী পেলেন না এই যা। প্রথমে তিনি বুঝতে পারেন নি যে, প্রভাতপদ্ম কুয়ানের সুযোগ এসে গেছে। তাঁর কথা শুনে খেয়াল হলো। তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল পদোন্নতি, অঢেল ধনদৌলত, মদের মাইফেল আর নানা রঙের সুন্দর পোষাকের ছবি। তাঁকেও তাহলে জোগান দিতে হবে এই চেষ্টায়, হাতে আসবে সবকিছু। প্রভাতপদ্ম তো গলে গেলেন, বড় বৌকে নেক নজরে দেখতে লাগলেন। একটু বা সোহাগ করলেন। বড় লঙ্কাও জল হয়ে গেলেন, পীচ-মঞ্জরীর সঙ্গে কোঁদলও থামলো।

কয়েক দিনের অভিজ্ঞতায় বড় লঙ্কার মনে হোল, পিকিং-এর বন্ধুদের এসব ব্যাপারে তেমন হাত নেই তবু প্রভাতপদ্মকে ঠেলে পাঠাতে লাগলেন তাঁদের কাছে, ভাবটা বজায় রাখলেন। তাঁরা কাজে না লাগুন, ভাব রাখতে দোষ কি, এতে তো আর টাকাকড়ি খসছে না। আবার অন্য দিকেও চলতে লাগলো চেষ্টা। মেয়েদের মহলে তিনি ঘুরতে লাগলেন। তিয়েনসিনের বড়

মানুষদের মা, বৌ, উপপত্নী, মেয়ে তখনো পিপিং-এ পড়ে আছেন। এখানে থিয়েটার আছে, আমোদ-প্রমোদের নানা সুবিধেও আছে। বড় লঙ্কার মনে হোল, স্বামীর পথের থেকে এটাই ভাল। বড় চাকুরী পেতে হলে খিড়কির সড়কই ধরতে হয়। আর এ পথে চলবার মতো ক্ষমতাও তাঁর আছে।

প্রথমেই প্রভাতপদ্মকে ঠেলে পাঠালেন। পীচ-মঞ্জরী বাড়ি তদারক করবে। তারপরে মেয়েদের উপর হুকুম জারী করলেন, বাড়ি বসে শুধু বিনে রোজগারে অন্ন ধ্বংস করতে পারবে না। যাও, বাপের জন্যে একটু ঘুরে ফিরে দেখ।

কাওদী আর মেদীর বাপের উপর অতো টান নেই। বাড়ির শিক্ষায় ওবাও আমোদ-প্রমোদ, বিলাসিতা আর উত্তেজনার ভক্ত। কিন্তু হাজার হোক, ওরা আজকালকার মেয়ে, পরাজিত দেশবাসীর লজ্জা একটু যে অনুভব করেনি তা নয়।

মেদীই প্রথম কথা বললে। মার আদুরে মেয়ে। জাপানী সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি তল্লাস করতে আসবে এই ভয়েই সে অস্থির। পোষাক-আষাক, প্রসাধনেও তার মন নেই। মুখে হাল্কা পৌচ দিয়েছে পাউডারের, ঠোঁটে ঘসেনি লিপস্টিক।

মা, শুনলাম, জাপানীরা নাকি যাকে পাচ্ছে তালাস করে দেখছে। আবার মেয়েদের বুকে হাত দিয়ে দেখছে।

দেখছে তো দেখছে? ওরা কি বুকের মাংস খুব্‌লে নেবে নাকি তোর! বড় লঙ্কা একটা কিছু ঠিক করে ফেললে আর ভয় পান না। কিরে কাওদী, তুই কি বলিস? তিনি কাওদীকে শুধালেন।

কাওদী বোনের থেকে একটু ঢ্যাঙা। পেছন দিক থেকে ওকে সুশ্রীই দেখায়, কিন্তু মুখখানা সুন্দর নয়। ঠোঁট বড্ড পুরু, আর নাক একেবারে খাঁদা, কিন্তু চোখ দেখলে বোঝা যায় তেজী মেয়ে। মাথায় আর স্বভাবে ঠিক ওর মার মতো, তাই মার আদর পায় না। মা আর মেয়ে একসঙ্গে হলেই হোলো, অমনি কথা কাটাকাটি শুরু হয়। হারও কেউ মানে না। তবে পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বুঝদার মেয়ে। যেমন কথার ঝাঁজে পুড়িয়ে দেয়, তেমনি আবার প্রলেপ বুলোতেও জানে। এই জন্যেই বাড়ির কেউ তাকে ঘাঁটাতে চায় না, একটু ভয়ই করে।

মা, আমি যদি হতাম, আমার মেয়েদের এই সময়ে বাপের চাকুরীর জন্যে বাইরে পাঠাতাম না। লজ্জাও করে না! কাওদীর খাঁদা নাক ফুলে উঠলো। নাক তো নয় যেন খুদে একখানা লাঠি।

বেশ, বেশ! তোদের কাউকে যেতে হবে না। যখন সময় আসবে. বাপের হাতে টাকাকড়ি হবে, তখন হাত পাততে যাসনে বলে দিচ্ছি। বড় লঙ্কা এক হাতে তাঁর কাজ-করা বটুয়াটা তুলে নিলেন, আর-এক হাতে চন্দন কাঠের পাখা। লড়াইয়ে সৈনিক যেমন সঙ্গীন ধরে, তেমনি করে বাগিয়ে ধরলেন পাখাখানা।

মেদী মাকে থামালো, মা রাগ কোরো না, আমি যাব। কোথায় যেতে হবে বল?

বড় লঙ্কা বটুয়া থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে দেখিয়ে বললেন, এই এই বাড়িগুলোতে যাবি। কাউকে কোনো কথা বলবি না। কথাবার্তা শুনবি, দেখবি হালচাল। খোঁজ-খবর নিবি। তারপরে আমি আবার কাল যাব। আমি বুড়ো-হাবড়া মানুষ যদি সব জায়গায় যেতে পারতাম, তাহলে তোদের ছুঁড়িদের নিয়ে কে টানা-হেঁচড়া করতো! আমার তো ছুটে ছুটে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। কিন্তু এ কাজ তো আর মাকে দিয়ে হবে না!

বড় লঙ্কা চলে যেতে মেদী বললে, ও কাওদী, তুই কি ভাই চুঙ্‌শি ছাড়া কারো কথা ভাবিস নে?

চুঙ্‌ শি চিয়েনের মেজ ছেলে। সে ট্রাক চালায়। জোয়ান. আর চালাক-চতুর ছেলে। যখন ট্রাক চালায় তখন মুখখানা তার লাল হয়ে ওঠে, চুল এলোমেলো হয়ে যায়। আবার যখন নীল কোর্তা ছেড়ে সাধারণ বেশ-ভূষা করে, তখন তাকে দেখায় ফিটফাট ইঞ্জিনীয়ারটি। সে কুয়ান-পরিবারের পড়শী হলে কি হবে, কখনো এ উঠোনে উঁকি মেরেও দেখেনি। এমনিতে সে বাড়িই খুব কম থাকে, তাছাড়া যন্ত্রপাতিই তার নেশা। ভোর থেকে রাত অবধি মোটরের ইঞ্জিন নিয়ে না থাকলেও (সে গাড়ি মেরামত করতেও জানে), সে হয় ঘড়ি, নয় রেডিও সারাতে বসে যায়। মেয়েদের ভাবনা সে ভাবে না। তার বাগদত্তা স্ত্রী, তার ভাই-এর বৌয়ের এক বোন। মা তাদের সঙ্গে কথা বলে রেখেছেন। সে জানে তার ভাইয়ের বৌ শান্ত, স্বভাব তার ভালো, তাই তার বোনও হয়তো ভালই হবে। যখন পরিবার থেকে বিয়ের

ঘটকালি করা হয়, সে বাধা দেয় নি। কিন্তু বিয়ে করবার জন্যে সে অস্থির হয়েও ওঠেনি। মা যখন জিজ্ঞেস করেন, বিয়ের ভোজটা কবে হবে বাবা? সে জবাব দেয়, তাড়া কিসের, দাঁড়াও আগে নিজে একটা মোটর মেরামতের কারখানা খুলি। তারপরে দিন ঠিক কোরো। তার ইচ্ছে, সে একটা ছোট-খাটো কারখানা খুলে বসবে, যেখানে সে-ই কর্তা, সে-ই মিস্ত্রী—আর সব রকম মেরামতের কাজ করবে। গাড়ির নিচে শুয়ে পড়ে কাজ করতে তার বেশ লাগে। যে গাড়ি লবেজান হয়ে পড়েছে, চলবার যার তাকদ নেই—ছুঁয়ে দিতেই সেই গাড়ি আবার চলতে থাকে। এতেই সে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়।

সে এক কোম্পানীতে কাজ করতো, যাদের ট্রাক চলতো পিপিং-এর উত্তরে উষ্ণপ্রস্রবণ অবধি। একবার কাওদী গিছলো দলবেঁধে সেখানে বেড়াতে। সে যে গাড়িতে গিছলো, তার চালক ছিল চুঙ্ শি। তার আবার গাড়ির ধকল সয় না, গাড়ি-পীড়া দেখা দেয়, তাই সে বসেছিল চালকের পাশের আসনে। ওখানে ধাক্কাটা লাগবে কম, টাল-মাটালে বেসামাল হয়ে পড়তে হবে না। সেইদিনই সে চুঙ্ শিকে চিনেছে। চুঙ্ শি কখনো তাকে দেখেনি, কিন্তু বাতচিৎ করতে গিয়ে জানলো, সে কুয়ান পরিবারের মেয়ে। তাই সে একটু অতিরিক্ত ভদ্রতাই দেখালে। চুঙ্ শির পক্ষে এটা স্বাভাবিক, সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকেও তাই। অন্য ভাবনা তার মগজে ঠাঁই পায়নি। কিন্তু কাওদী তো মজলো। চুঙ্ শি দেখতে সুশ্রী। এবার শুরু হোল রোমান্সের পালা।

চুঙ্ শির সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে পশ্চিমের উঠোনে শব্দ শুনলেই কাওদীর বুক কেঁপে ওঠে। আস্তে আস্তে সে চিয়েনদের পরিবারের খবরও জেনে নিয়েছে। কিন্তু এতে মেহনতও কম করতে হয়নি। টেলিফোন গাইড দেখে প্রথমে সে জেনে নিলে মোটর কোম্পানীর ঠিকানা। মাঝে মাঝে গ্যারেজের সামনে দিয়ে ঘোরাফেরাও শুরু হোল, তার মনে আশা, চুঙ্ শির সে দেখা পাবে। কিন্তু দেখা পেল না, অদর্শনের ব্যথায় বুক ভরে গেল। যেটুকু খবর পেলে চুঙ শির, তাই নিয়েই কল্পনার জাল বুনতে লাগলো। চুঙ্ শি তার কাছে আদর্শ যুবক। তার আছে অভিজ্ঞতা, চরিত্র আর ক্ষমতা।

মেদীর কিন্তু চিয়েন পরিবারের সবাইকেই অদ্ভুত লাগে। চুঙ্ শি ছেলেটা দেখতে ভাল, কিন্তু বড় নিচু তার পেশা। তার বোন সুন্দর নয়, তবু ট্রাক-চালকের কাছে তার বিয়ে বসা চলে না। কিন্তু কাওদীর কাছে চুঙ্ শি তো এমন মানুষ, যে না করতে পারে হেন কাজ নেই, না জানে এমন জিনিসও নেই। এই গাড়ি চালাবার নেশা তো ওর সময় কাটাবার ছল, খেলাও বলতে পার। কোন্ দিন যে ও এসব ছেড়েছুঁড়ে বীর হয়ে বসবে না তাই বা কে জানে! অঢেল টাকার মালিক হওয়াও ওর পক্ষে কিছু নয়। মেদী যখন ওকে ঠাট্টা করে, ও গম্ভীর হয়ে বলে, তা ভাই, ওর সঙ্গে কথা বলতে ভারি ইচ্ছে করে, ওর মতো এমন কেউ সবকিছু জানেও না। আজও মেদী চুঙ্ শিকে ঠাট্টা করে বসলো। কাওদী আজও তেমনি গম্ভীর ; সে বললে, বেশ তো, ও ট্রাক চালায় তাতে আর কি হয়েছে ? জাপানীদের কাছে হাঁটু গেড়ে বড় চাকরী ভিখ্ মাগতে যাওয়ার চেয়ে ট্রাক চালানো ঢের ভাল। হাঁ, হাঁ, ঢের, ঢের ভালো!

সাত

টুপীটা তুলে না নিয়েই রে সুয়ান তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো। রে সুয়ান দু-দুটো ইস্কুলে পড়ায়। একটা ম্যুনিসিপ্যাল ইস্কুল, সেখানে হপ্তায় পড়ায় আঠারো ঘণ্টা, ইংরেজিই পড়ায়। আর-একটা ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল। সেখানে পড়ায় চার ঘণ্টা করে চীনা ভাষা। শুধু যে সামান্য মাইনের জন্যে পড়ায় তা নয়, সে ইতালী আর অন্য সব দেশের পাদ্রিদের কাছ থেকে কিছুটা লাতিন আর ফরাসিতে তালিম নিতে চায়।

সদর সড়কগুলি একটুও বদলে যায়নি। সে ভেবেছিল, পথঘাট বুঝি বদলে যাবে, আর রাগে রী-রী করবে তার শরীর, দাঁতে দাঁত ঘসবে। কিন্তু পথঘাট যেমনি তেমনি আছে। শুধু আগেকার মতো মানুষ আর গাড়ির ভিড় তেমন নেই। তার বাবা বলছিলেন, দোকানপাটও সব খুলেছে। কিন্তু তেমন খদ্দের-পত্র নেই। কাউণ্টারের পিছনে বসে আছে কর্মচারীর দল। কেউ বা মাথা নাড়ছে, কেউ বা তাকিয়ে আছে পথের দিকে। রিক্সাও

বেরিয়েছে, পথের মোড়ের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তারা সোয়ারীর জন্যে মোতায়েন, কিন্তু রিক্সাওয়ালাদের মুখে রঙ-তামাসার বুলি নেই, গল্পগুজবও করছে না। কেউ বা দেয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বা নিজের গাড়ির পাদানিতে বসে আছে।

ইস্কুলে এসে রে সুয়ান দেখলে, ক্লাস বসে গেছে। তবে সব ছাত্র আসেনি। তার আজ ক্লাসও নেই। ইতালীর পাদ্রী দোনোফিরোর সঙ্গে সে দেখা করতে ছুটলো। এমনি দোনোফিরো মাটির মানুষটি, দয়ামায়া তাঁর খুব। কিন্তু আজ যেন কেমন হয়ে গেছেন; কেমন যেন কড়া তাঁর ধাত। কিন্তু সত্যিই তাই কিনা কে বলবে! হয়তো তার নিজের মনটাই অস্থির বলে সে অমনি ভাবছে। কয়েকটা কথার পরই পাদ্রি সাহেব মুখ গম্ভীর করে জানালেন, রে সুয়ান ক'দিন ক্লাস করোনি। রে সুয়ান সংযত হয়ে বললে, এই সময়ে ইস্কুল বন্ধ করাই উচিত।

খেঁকিয়ে উঠলেন যেন পাদ্রি, ওঃ এমনি তোমরা দেশকে ভালবাস, কিন্তু কামানের শব্দ শুনলেই গর্তে গিয়ে লুকোও!

রে সুয়ান ঢোক গিলে চুপ করে গেল। পাদ্রি সাহেবের কথার দাম আছে বইকি। পিপিং-এর মানুষের পশ্চিমের মানুষদের মতো সে দুঃসাহসিকতা বুঝি নেই! তারা বুঝি বীর নয়! পাদ্রী তো ভগবানের প্রতিনিধি, তিনি তো সত্যি কথাই বললেন। তাই রে সুয়ান মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলে, ফাদার, বলুন তো, চীন-জাপানের এ যুদ্ধ কতদুর গড়াবে?

পাদ্রী সাহেবও হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘৃণা এসে বাধা দিলে। জানি না। তবে এইটুকু জানি, রাজবংশ বদলানোই চীনা ইতিহাসের ধারা।

রে সুয়ানের মুখে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়লো। পাদ্রীর মুখে সে দেখতে পেল মানুষের নিচ স্বভাবের ছায়া। ওরা সাফল্যেরই পূজা করে, সে-সাফল্য যদি নিচ উপায়েও আসে, তাহলেও ওদের আপত্তি নেই। যারা সে-উপাসনা করে না, তাদের ওরা ঘৃণা করে, অপমান করে। সে আর-একটা কথা না বলে বেরিয়ে এল।

কিছুদুর গিয়ে সে আবার ফিরে এল। শিক্ষকদের বসবার ঘরে বসে এক টুকরো কাগজে লিখলে, সে আর পড়াতে আসবে না। তারপর একজনকে দিয়ে ফাদার দোনাফিরোর কাছে পাঠিয়ে দিলে।

রে সুয়ান বাড়ি ফিরে এসে দেখলে, সদর ফটকে বুড়ো দাদু, তার বাবা, রে ফেঙ আর তার বৌ খেজুর গাছতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আধ-পাকা ক'টা খেজুর রে ফেঙ-এর হাতে। সে কথা বলছে আর খাচ্ছে। জাপানীরা ভাল, কি চীনারা ভাল—কথা তা নয়, কথা হচ্ছে কেউ দায়িত্ব নিক। জাপানীদের সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক, আমরাও নিশ্চিন্ত হই। সে কথা বলছে আব খেজুরের আঁটি ফেলছে মাটিতে। আবার এক-একটা খেজুর হাত দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মুখে লুফে নিচ্ছে।

রে ফেঙ-এর গায়ের চামড়া রুক্ষ। চুলও তার খাড়া খাড়া। এরই জন্য সে সব সময়ে ফিটফাট থাকে। প্রকৃতি যা দেয়নি, প্রসাধনে সে তার খোদ্‌কারি করে। এর জন্যে যেমন সময় যায়, তেমনি খরচ হয় টাকা আর মেহনত। চুলে সব সময়েই তার মাঝখানে চেরা সিঁথি, চুল আরকে ভিজিয়ে দুপাশে পাট করে রাখে। তার রুক্ষ মুখখানা নিখুঁত করে কামানো, দেখে মনে হয় খোসা-ছাড়ানো বাদাম যেন। তাতে আবার সে দাড়ি কামাবার পর বেশ করে ক্রিম ঘসে। তার হাতের আঙুলের নখগুলি সমান করে কাটা আর চেঁছে-ছুলে ঝক্‌ঝকে করা। পোষাকও যত্নে তৈরি, তার কাটছাঁটও একেবারে হালফিলের। ও যদি স্বর্গসেতু এলাকায় ঘোরাফেরা করে, লোকে ওকে কোনো বিখ্যাত নাচনেওয়ালির বীণা-বাজিয়ে বলে ভাববে। ও সব সময়েই কাজের কথা ভাবে। আর ওর কাজের পথ হচ্ছে বাঁকা পথ। সব ব্যাপারেই ও সুযোগ খোঁজে, ফন্দিফিকির বার করে। ওর আদর্শ বলে কোনো বস্তু নেই।

একটা মধ্যশিক্ষা স্কুলের ও ম্যানেজার। ব্যবসার দিকটাই দেখে।

রে সুয়ান বা রে তাঙ মেজ ভাইকে পছন্দ করে না। কিন্তু বুড়ো দাদু, আর বাপ-মার সে খুব প্রিয়। ওর বাস্তববোধ দেখে বুড়ো-বুড়িরা মনে করেন ও নির্ভরযোগ্য মানুষ, ও বাইরে থেকে কোনো বিপদ ডেকে আনবে না, ভিতরেও কোনো হামলা বাঁধাবে না। ও যদি নিজের পছন্দে একটা হাল আমলের মেয়েকে বিয়ে করে না বসতো, ওকে তাঁরা বাড়ির কর্তাই করে দিতেন। এমন দাঁওয়ে ও জিনিসপত্র কেনে, এমন লোকের সঙ্গে ভাব জমায় যে কি বলব! সাত-সাতটি পিসি আর আট-আটটি খুড়োর সঙ্গে কি ভাবই না জমিয়েছে! ওদের সঙ্গে যখন কথা বলে মনে হয় ও নিজেও

যেন বুড়ো বনে গেছে। কিন্তু বৌটা একেবারে স্বার্থপর। দুয়ে মিলে সব ভেস্তে দিচ্ছে। তাই মেজোর হাত থেকে কর্তৃত্ব ফসকে গেল। এরই শোধ তুলবার জন্যে সে এখন বাড়ির খোঁজ-খবরও নেয় না, কিন্তু বড় ভাই কি বড় বৌ কোনো কিছু বেশি দাম দিয়ে কিনলে, কি ভুলচুক করলে আর রক্ষে নেই। সে এমনভাবে সমালোচনা শুরু করে, যাকে রীতিমত আক্রমণও বলা যায়।

বড় ভাই, রে ফেঙ তাকে বলে উঠলো, আমাদের ইস্কুলে তো আমরা ঠিক করেছি, এখন পুঁজি থেকেই খরচ-খরচা চালানো হবে। প্রতি জন—তা সে হেডমাষ্টার, শিক্ষক আর কেরাণীই হোন, বিশ ডলার করে মাসে পাবেন। তোমাদের ইস্কুলেও হয়তো এই ব্যবস্থাই হবে। যাহোক, বিশ ডলারে আমার রিক্সাভাড়া, সিগারেট খরচাও কুলোবে না, কিন্তু ওরই মধ্যেই সব কুলিয়ে নিতে হবে। কি—তাই না? শুনলাম, আজ শহরের বড় বড় লোকদের নিয়ে জাপানী রাষ্ট্রদূতাবাসে সভা হবে। শীগ্‌গিরই ওরা জানাবে কোন্ কোন্ জাপানী আর চীনা সরকারে বড় বড় কাজ পাবে। দায়-দায়িত্ব নিলে তখন ইস্কুলের টাকাকড়িরও একটা সুরাহা হবে। পুঁজি আর কতদিন থাকবে? তবু যাহোক এখন তো খানিকটা সুবিধে হোলো। সরকার কারা চালাবে না চালাবে, তা ভেবে দরকারটা কি? আমাদের রুজি-রোজগার হলেই হোলো।

রে স্যুয়ান হাসলো। নিজের মতামত ব্যক্ত করবার তার সাহস নেই। সে জানে ছেলে আর ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব রাখতে হলে চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

বুড়ো দাদু বার বার মাথা নাড়ছেন, মেজ নাতির কথায় তাঁর সম্পূর্ণ সায় আছে। কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। মেজ নাত-বৌটিও হাজির। ওর সামনে মেজ নাতির প্রশংসা করলে ওদের গুমোর বাড়বে বই তো নয়।

ক্যাথেড্রাল ইস্কুলে গিছলে? কি খবর? রে স্যুয়ানের বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

রে ফেঙ তাড়াতাড়ি বললে, বড়ভাই, ওইটেই এখন তোমার আসল আয়। এমনি ইস্কুলগুলোর যে কি দশা হবে কে জানে! কিন্তু বিদেশীদের ইস্কুলগুলো একেবারে মজবুত; ঠিক সরকারী পেন্সনের মতো। কয়েক

ঘণ্টা কাজ আরো ওখানে বাড়িয়ে নাও। বিদেশীরা কখনো পেট-ভাতায় কাউকে রাখে না।

রে স্থ্যান ভেবেছিল, এখন কাউকে ইস্কুলের কথা বলা হবে না। যতদিন না অন্য কাজ পায়, ততদিন গোপন করেই রাখবে। কিন্তু মেজ ভাই আঘাত করতেই সে জ্বলে উঠলো। মুখে তার হাসি ফুটে রইল, কিন্তু এ হাসিতে সে-শ্রী তো নেই। সে আস্তে আস্তে বললে, আমি ঐ চার ঘণ্টার কাজে ইস্তফা দিয়ে এসেছি।

বলেই সে ঢুকে পড়লো সেজ ভাইয়ের ঘরে। সেজ ভাই বিছানায় শুয়ে পুঁথি পড়ছিল। তারে বাঁধাই পুঁথি। বড় ভাই বিদেশী বই সব পুড়িয়ে ফেলেছে। তাই সে নিয়ে বসেছে পুঁথিখানা, পরখ করে দেখছে কেন তারে বাঁধাই চীনা পুঁথির এই নিরাপত্তা। একখানা পড়েই বুঝতে পারছে। কনফ্যুসিয়াসের চারখানা শাস্ত্রের একখানার ভাষ্য এই পুঁথিখানা। হরফ পড়তে কষ্টই হয় না। ছাপা স্পষ্ট, সেদিকেও অসুবিধে নেই। কিন্তু এরা যেন রঙ্গমঞ্চের সাধারণ কুশীলব, এরা বিবর্ণ পোষাক আর টুপী পরে অভিনয়ের ভান করছে, কিন্তু প্রতিভা তো নেই, নেই নায়কোচিত সেই উদ্দীপনা, ভাব-ব্যঞ্জনা। কিন্তু ও যখন বিজ্ঞানের বই পড়ে, তা সে বিদেশী বা চীনা ভাষায় হোক না কেন, হরফগুলো যেন ডাঁশের মতো কালো আর জ্বলজ্বল করে। ভ্রূ কুঁচকে তাদের মালুম হয়—একটা একটা করে হরফ পড়ে, মনে রাখে। দৃষ্টিশক্তি আর মানসিক পরিশ্রম যথেষ্টই হয়, কিন্তু একটা অনুচ্ছেদ পড়লেই এক নতুন উপলব্ধি দেখা দেয়, এক নতুন জ্ঞানের ভাণ্ডার যেন খুলে যায়। সে খুশি হয়ে ওঠে। মনকে যত চালায়, ততো শক্তি বাড়ে। খুদে হরফ, স্পষ্ট ছক তার মনের পরিধি বাড়িয়ে দেয়, কল্পনায় শান পড়ে। সক্রিয় হয়ে ওঠে কল্পনা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলার সে সন্ধান পায়, তার বিরাটত্ব সে অনুভব করে, তার গাম্ভীর্য আর সৌন্দর্যে মন ছেয়ে যায়। বাস্কেট বল খেলতে খেলতে সে অনুভব করেছে, তার শরীরে যেন শক্তি আর দৃঢ় মাংসপেশীর তরঙ্গ বয়ে যায়; কিন্তু মন তখন তো ফাঁকা। আবার পড়বার সময় দেহের কথা সে ভুলে যায়, তখন মনে হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু আছে গভীর জ্ঞান, আর কিছু নেই। কিন্তু এই পুঁথি পড়ে তো মাথা-মুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না—শুধু আছে এখানে বড়

বড় হরফের সার। কি পড়ছে, সে নিজেই জানে না। তাই সে বুঝতে পারছে চীনা পুঁথিতে শত্রুর ভয় নেই কেন।

পুঁথি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলে উঠলো, বড় ভাই, বাইরে গিছলে?

রে স্থয়ান পাদ্রি সাহেবের সঙ্গে কি হয়েছে জানালে, তারপর বলে উঠলো, এ কিছুই না, বরং মন থেকে ভার নেমে গেছে, স্বস্তি পাচ্ছি।

রে তাও উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বড় ভাই, আমি কি যে খুশি হয়েছি, এমন মনের জোর তুমি দেখাতে পারলে!

অমন মনের জোরের দাম কি? আমি কি ঐ জোর টিকিয়ে রাখতে পারব?

নিশ্চয়ই দাম আছে। যাদের মনের জোর নেই, তারা তো মুরগীর ছানার মতো শুধু মাথা নিচু করে খাবার খুঁজে বেড়ায়। হাঁ, কতদিন এ থাকবে এ কথা বলতে পার বটে! এ বলা মুশ্‌কিল বড় ভাই। তুমি যে সারা সংসারের কথা ভাব। আমাদের ভারেই তুমি নুয়ে পড়ছ।

যখনি আমার ফাদার দোনোফিরোর কথা মনে পড়ছে, ভাবছি, ছুটে যাই, চীনের মানুষের সম্মান বাঁচাবার জন্য লড়াই করি। যদি পাদ্রি সাহেবরাই আমাদের সম্মান করতে না পাবেন, তাহলে অন্য আর কে পারবে! আমরা কি মুখ নিচু করে এমনি ভীরু হয়েই থাকব? পৃথিবীতে কেউ কি আমাদের সহানুভূতি দেখাবে, না সম্মান করবে!

বড় ভাই, তুমি এইসব কথা বলছ, অথচ আমাকে যেতে দিচ্ছ না।

তোমাকে তো আমি ধরে রাখিনি ভাই। যখন সময় আসবে, তোমাকে নিশ্চয়ই যেতে দেব।

কিন্তু কথাটা গোপন রাখতে হবে। এমন কি বড় বৌকেও বোলো না।

নিশ্চয়ই না।

মার জন্যেই আমার ভাবনা। ওঁর শরীর দুর্বল। আমি চলে গেলে উনি হয়তো কেঁদে কেঁদেই মারা যাবেন।

রে স্থয়ান একটু চুপ করে থেকে বললে, ওসব ভেবে কি করবে বল! দেশে হানা দিয়েছে শত্রু। পরিবার তো ভেঙেচুরে যাবেই।

আট

প্রভাতপদ্ম কুয়ানের আশা হোল। এবার তাঁর ভাগ্যের ছন্দ তাল-মান-লয়ে এগিয়ে আসছে। বরাত ফিরলো। যেখানেই যাচ্ছেন, কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছেন; গলা ভেঙে যাচ্ছে, মুখ তেঁতো হয়ে আসছে, সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি এবার মিষ্টি বড়ি কিনে ফেললেন। এতে গলাও শুকোবে না, খোসবাইও বেরুবে। মুখে সেই বড়ি সর্বদাই রাখছেন, যখন বক্‌বক্ করছেন না, তখন বড়ি চুষছেন। কাজ তবু এগোয় নি, কিন্তু ঘোরাব কামাই নেই। অনেক নতুন ছক আর ধারণা তাঁর মগজে ভর্তি। তিনি সেগুলি একজনের কাছে শুনে, আর-একজনের কাছে বেচছেন; আবাব তার কাছে যা শুনছেন, বলছেন আর একজনের কাছে। কথা কেনা-বেচাই সার হচ্ছে।

যদি একটা চাকরী পেয়ে যেতেন, পড়শীদের কে তোয়াক্কা রাখত। কিন্তু এখনো চাকরী পাননি, পদমর্যাদা বাড়েনি, তাই তিনি পড়শীদের কথা ভাবতে বসলেন।

চারিদিকে ঘোরাফেরায় তিনি দেখেছেন, বহু জ্ঞানী-গুণী তাঁদের কাব্য আর সাহিত্যের মারফতে জাপানীদের অন্তরঙ্গ হতে চাইছেন। কেউ কেউ বা দুই জাতির কবি আর সাহিত্যিকদের নিয়ে একটা সংঘ ফাঁদবার কথাও ভাবছেন।

এইসব আলাপ-আলোচনায় প্রভাতপদ্ম কুয়ানের চিয়েনের কথা মনে পড়লো। তাইত, কবি চিয়েন তো রয়েছেন, তিনি ছবিও আঁকতে পারেন, আবার ফুলের চাষ করতেও ভালবাসেন। একটু উত্তেজিতই হয়ে উঠলেন কুয়ান। ভাবলেন, আমি যদি চিয়েনের ঝাণ্ডা কাঁধে তুলে এক কবিসংঘ বা নিদেনপক্ষে ফুলের দোকানও ফেঁদে বসতে পারি, তাহলে হয় বটে। যেটা গড়ে তুলব, তারই কর্তা হব আমি। এতে কি জাপানীদের টেনে আনা যাবে না? শুধু শুধু ঘুরে আর বক্‌বক্ করে বেড়ালে ফায়দাটা কি! যাদের দরজায় ধর্ণা দিচ্ছি, ওরা তো কোনো কাজেই আসবে না।

প্রভাতপদ্ম চিয়েনের বাড়ি যেতে চাইলেন। কিন্তু যদি ফিরে আসতে হয় সেই তো ভয়। পাথুরে দেয়াল যেন চিয়েন, ভিতরে সেঁধোনো যাবে না, মাথা ঠুকে ফিরে আসতে হবে। চি'দের বাড়িতে সেদিন তো দেখা হয়েছিল। না না অমন করে হবে না। এতে মাথা কোটাকুটিই সার হবে। তার চেয়ে চি'দের বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়াই ভাল। রে স্থয়ান যদি চিয়েনের সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর রাখে, তারপর না হয় তাঁর বাড়ি যাওয়া যাবে। কুয়ান আর একটা মিঠে বড়ি মুখে পুরলেন, চুল আঁচড়ে নিয়ে এবার চললেন চি'দের বাড়ির দিকে।

প্রভাতপদ্ম বে স্থয়ানের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে সস্নেহে বললেন, আপনি কি ব্যস্ত আছেন? আমি একটু দেখা করতে এলাম।

রে স্থয়ানের সঙ্গে ঘরে গিয়ে বসলেন। এবার খুদে ধনকে একটু প্রশংসা করে মনের কথাটা পেড়ে বসলেন, খবর কি?

খবর নেই।

একেবারে থম্‌থমে আবহাওয়া। প্রভাতপদ্ম বুঝলেন রে স্থয়ান কিছু জানে কিন্তু বলতে চায় না, তাই নিজের কথা বলতে লাগলেন, যদি খবর-টবর কিছু এর বদলে পাওয়া যায়। আমি তো এই ক'দিন ধরেই ঘুরছি। আসল খবর পাওয়া যায় না, শুধু গুজব আর গুজব। কিন্তু তবু যেন ওরই মধ্যে একটা হদিশ পাচ্ছি। সাধারণভাবে দেখতে গেলে, জাপান আর চীনের ভিতরে সহযোগিতার সম্পর্ক চাই।

আমরা কে যে সে কথা বলব? রে স্থয়ান অতিথিকে চটাতে চায় না, কিন্তু কুয়ানের মতো লোকের কথা সহ্য হয় না বলেই সে খোঁচা দিলে।

খোঁচাটা কুয়ান টের পেয়ে চোখ ঘুরিয়ে বললেন, হাঁ, হাঁ, আমাদের তো আশা আছেই, চীন শক্তি দিয়ে এ আক্রমণ প্রতিরোধ করবে, কিন্তু গোদা কথা হচ্ছে, এখনি কি সেটা সম্ভব হবে? এই তো, পিপিং-এর কথাই ধরুন না, কিছুদিনের জন্যে তো জাপানীদের দখলে এ শহর থাকবেই। তাই আমি বলি, আমাদের মতো যাঁদের যোগ্যতা আছে, আসুন তাঁরা মিলে এমন কিছু করি যাতে এ শহরের দুর্দশাটা একটু কমে। এই খুদে খাটালের গলিতে আমি আপনাকে আর কবি চিয়েনকেই শ্রদ্ধা করি। আপনাদের জন্যই আমার ভাবনা। শ্রীযুত চিয়েনের খবর কি?

তাঁর ওখানে যাইনি।

উনি কি কিছু করছেন না?

জানি না। তবে সরকারী খেতাবের জন্য কিছু করবেন বলে মনে হয় না। উনি কবি।

কিন্তু কবিরা আগে কখনো সরকারী খেতাব বা পদের জন্য চেষ্টা করেন নি এমন নয়। শুনছি, কবি তু সো লিং নাকি বড় চাকরীই পাচ্ছেন।

রে স্থয়ান আলাপ করতে চায় না। সে চুপচাপ।

চলুন না, শ্রীযুত চিয়েনের ওখানে যাই।

আজ নয়, আর-একদিন যাব।

কবে যাবেন? একটা সময় ঠিক করুন।

রে স্থয়ান কুয়ানের খপ্পরে পড়েছে, এবার সে তাই সোজাসুজি আক্রমণ করে বসলো: আপনি ওঁর কাছে কেন যেতে চান?

প্রভাতপদ্মের চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠলো, তাই নিয়েই তো আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমি জানি, শ্রীযুত চিয়েন কবি, শিল্পী, তিনি ফুল ভালবাসেন। জাপানীরাও এসব ভালবাসে। আমরা—আপনি, আমি, শ্রীযুত চিয়েন, নিজেদের রক্ষা করতে পারি। ধরুন, আমরা যদি কবি আর শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠা করি, তাহলে জাপানীদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হবে। আবার সরকারী পদেরও সম্ভাবনা দেখা দেবে। এই তো আমাদের একমাত্র পথ। এই তো শান্তির পথ।

শ্রীযুত চিয়েন এতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না।

এখনো তো ওঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি, আগেই আপনি ভাবলেন কি করে? মানুষের মনে কি আছে, না বললে কি জানা যায়?

রে স্থয়ানের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো; সে বললে, আমি ওসব পারব না! ভাবল, এতে হয়তো কুয়ান ক্ষুব্ধই হবেন। সঙ্গে সঙ্গে তার এই পেড়াপীড়িও শেষ হবে।

কিন্তু কুয়ান ক্ষুব্ধ তো হলেনই না, বরং হেসে বললেন, আপনি কবিতাও লেখেন না, ছবিও আঁকেন না। তাতে কিছু যায় আসে না। আমিও ওসব জানি না। কি বলছি শুনুন, শ্রীযুত চিয়েন জোগাবেন মাল, আর আমরা দুজনে তাই নিয়ে ব্যবসা করব আর সকলের থেকে তাড়াতাড়ি শুরু করে

দেব—বিজ্ঞাপন দেব। জাপানীরা বাতাসে তার গন্ধ পেয়ে ছুটে আসবে। আমাদের এই খুদে খাটাল হবে সংস্কৃতির কেন্দ্র।

রে স্থয়ান আর সংযত থাকতে পারলো না, সে হেসে উঠলো।

কুয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভেবে দেখুন। আমার তো মনে হয় এটা একটা কাজের মতো কাজ। উত্‌রে গেলে এর থেকেই বেশ কিছু হবে। আর যদি বা ভেস্তেই যায়, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। বলতে বলতে তিনি এলেন উঠোনে। ধরুন, এইভাবে যদি শুরু করা যায়। আমি একটা ভোজের ব্যবস্থা করে শ্রীযুত চিয়েনকে নিমন্ত্রণ করব, তারপর ওখানে বসেই সব ঠিক হবে। আমার বাড়িতে আপনারা যদি আসতে না চান, আপনার বাড়িতেই মাংস আর মদ নিয়ে আসব—এখানেই বৈঠক বসবে। কি বলেন ?

রে স্থয়ান চুপ করে রইল। সদর ফটকের কাছে এসে কুয়ান আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি বলেন আপনি ?

রে স্থয়ান কি উত্তর দিয়ে যে বাড়ির ভিতরে ফিরে এল সে নিজেই জানে না। ফাদার দোনোফিরোর কথাগুলো তার মনে পড়ছিলো। কুয়ান আর দোনোফিরোর কথা একসঙ্গে মনে পড়তেই সে শিউরে উঠলো।

প্রভাতপদ্ম কুয়ান বাড়ি ফিরে দেখলেন, শ্রীমতী কুয়ানও তখুনি ফিরেছেন। তিনি পোষাক ছাড়ছেন আর গা-ধোবার জল আর গা ঘসবার ক্ষারের জন্য হাঁকডাক পাড়ছেন। মুখে পাউডারের লেশমাত্র নেই। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। তাঁর ভাবখানা দেখে মনে হয়, শত্রুর কাছ থেকে এইমাত্র বুঝি গোটা দু'তিনেক মেশিন-গান ছিনিয়ে নিয়ে এলেন।

বড় লঙ্কা এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন যে, স্বামীর টাকাকড়ি আর খেতাবের স্থযোগ এসে গেছে। এ সম্বন্ধে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। স্বামীর বিগ্যেবুদ্ধির উপর তাঁর যে খুব একটা আস্থা আছে তা নয়, তবে তাঁর নিজের চোখ দুটো আর হাত দিয়ে তিনি স্বর্গেরও নাগাল পাবেন এই তাঁর বিশ্বাস। এই ক'দিনে তিনি পাঁচটি ধনবতী উপপত্নীর সঙ্গে বোন পাতিয়েছেন, আর এরই মধ্যে দু'হাজার ডলার জিতেছেন মাজং খেলায়। তিনি ভবিষ্যৎবাণীও করে বসে আছেন, জাপানী মেয়েদের সঙ্গেও শীগ্‌গীরই বোন সম্পর্ক পাতাবেন, আর সেই সুবাদে সামরিক আর রাজনৈতিক বিভাগের হোমরা-চোমরাদেরও বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আনতে পারবেন।

নিজে খুশি বলেই অন্যের খুঁত ধরছেন বেশি করে। এই মেদী, মেদী, কি করছিস, কাউদীই বা কি করছিস? যখনই কাজ থাকে, তখনি তোরা ধর্মঘট করে বসিস নাকি? যেন তিনি উইলো-গাছকে শাপ-মন্যি দিতে গিয়ে এলম্-গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন, এমনি ভাবখানা। ডুই মেয়েকে গাল দিচ্ছেন, কিন্তু উদ্দেশ্যটা তার সম্পূর্ণ অন্যরকম। কিরে, কি ধরন-ধারণ তোদের? সূর্যির আলো লাগলে মুখের চামড়া কালো হয়ে যাবে তাই বুঝি তোদের ভয়? তা আমার তো বাপু বুড়োমানষের চামড়া—সূর্যির ভয় আমি করি না। আমার সোয়ামীর যাতে পয় হয়, যাতে পরিবারের বাড়-বাড়ন্ত হয়, আমি তাই-ই চাই। ভূতের মতো মুখের রং সাদা রাখলেই আমার চলবে না।

কথা ক'টা বলেই তিনি কান খাড়া করে রইলেন, পীচমঞ্জরী কি বলে। পাল্টা আক্রমণ শুরু হয় কিনা। তিনি তো তার জন্যে তৈরী।

পিচ-মঞ্জরী কিন্তু আজ একেবারে চুপচাপ।

এবার তাই স্বামীর দিকে তোপটা ঘুরিয়ে দিলেন বড় লঙ্কা। আজ যে বড় বেরুলে না? আমি কি একাই সব করব নাকি? লজ্জা করে না! যাও, এখুনি বেরোও, মাথার দিব্যি, একবার অন্তত ঘুরে এস। তুমি তো আর পা-বাঁধা একরত্তি মেয়ে নও যে, একটু হাঁটলেই পা ছড়িয়ে পড়ে ধ্যাবড়া হয়ে যাবে।

কুয়ান জবাব দিলেন, যাচ্ছি গো যাচ্ছি। তুমি অতো চটছ কেন? তিনি টুপীটা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কুয়ান বেরিয়ে যাবার পরেই পীচ-মঞ্জরী বড় লঙ্কার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়তে শুরু করে দিলে। সে চালাক মেয়ে, কখন পাল্টা আক্রমণ চালাতে হয় সে জানে। কুয়ান যখন বাড়ি থাকেন, পারলে রাগ সে চেপেই রাখে। প্রথমে ঝগড়া বাঁধিয়েছে বলে তার ঘাড়ে দোষ পড়ে না। সে ঘাপটি মেরে কুয়ানের বেরিয়ে যাবার অপেক্ষায় থাকে, তারপর চলে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী। পীচ-মঞ্জরীর কথার ঝাঁজ আরো বেশি, অপমানের হুল বেশি করেই ফোটে। গাল পাড়তে পাড়তে সময় সময় তার নিজের কানেই কেমন খারাপ শোনায়। কি সঙ্গে সঙ্গে এই ওজুহাতই সে দেখায়, আমি তয়ফাউলী, বাইজী, আমার আবার ভদ্রতা-অভদ্রতাব বালাই কিসেব!

পীচ-মঞ্জরীর বাপ-মার কথা মনেই পড়ে না। তাঁরা কে ছিলেন তাও তার জানা নেই। এক বুড়ী তাকে পালন করেছিল, তারই পদবী সে পেয়েছে! বুড়ির তাঁবে ছিল অনেক মেয়ে—সেও তাদের মধ্যে একজন। চার বছর বয়সে তাকে কারা চুরি করে নিয়ে এসে বিক্রী করে দেয়। আট বছর বয়সে গান আর নাচ শিখতে সে শুরু করে। চতুর মেয়ে, দশ বছর বয়সেই চা-খানায় মুজরো শুরু করে দেয়। তেরো বছর বয়সে তার উপর বলৎকার করে তারই নাচ-গানের ওস্তাদ।

তার চামড়া মসৃণ, কোমল, কিন্তু চোখ দুটোই বেশি করে মন কেড়ে নেয়। গলার স্বরও ভাল, তবে তেমন দানা নেই। যখন সে গায়, গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে, কিন্তু হাবভাব ঠাট-ঠমকে সে অভাব পূরণ হয়। মঞ্চে উঠেই সে ডান থেকে বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে নিত, দর্শকরা সবাই ভাবতো, তার দিকেই নয়ন-বাণ মেরেছে মেয়ে। এরই জন্যে তার পসারও জমেছিল খুব। বাইশ বছর বয়সে সে এল পিপিং-এ। কিন্তু এখানে খুব পসার জমেনি। বড় বড় বাইজীর এখানে অভাব নেই, তাছাড়া দু'-বার পেট-খসানোয় চেহারাও তখন ঝরে গেছে, গলাও গেছে। এমনি সময়ে কুয়ান তাকে কিনে নিয়ে তয়ফাউলী আর বাইজীর জীবন থেকে মুক্তি দিলেন। আর কিছুর জন্যে না হোক, বড় লম্বা ঢ্যাঙা আর পীচ-মঞ্জরী খুদে বলেই হয়তো তাঁর মনে ধরলো।

পীচ-মঞ্জরীর অনেক গুণ। সে যদি বছর কয়েক পড়াশুনো করতে পারত, কোনো ইস্কুলে জাঁকিয়ে কর্ত্রী হয়ে বসতে পারত। যদি ঠিক সময়ে বিয়ে হোত, সে হোত সুগৃহিণী। সে তার জীবনে জেনেছে, সুন্দর সাজ-সজ্জা, মিষ্টি কথা, বড় বড় ভোজ তো বিষ,—ওতে মন আর দেহ বিষিয়ে ওঠে। তাই সে পেশা হিসাবে তার মায়ামাখানো চোখে নয়ন-বাণ মারত, গান গাইত বটে, কিন্তু নিরালায় তার চোখের জল নামতো অঝোরে। বাপ-মা নেই, ভাইবোন নেই, আত্মীয়ও তার নেই। চোখ খুললেই তো শূন্য, নির্বান্ধব পৃথিবী। এখানে সবাইকে হাসি বিলোতে হবে, রুজির জন্য চোখ মারতে হবে। বিশ বছর বয়সে সে বুঝলো, পৃথিবীটা ভুয়ো, একেবারে ভুয়ো।

তখন তার কামনা এক পুরুষের—যে হবে তার জীবনের ধ্রুবতারা—তার জীবনে খানিকটা বাস্তবতা আমদানী করবে। কিন্তু এমনি তার বরাত,

তা তো জুটলো না। সে হোল উপপত্নী, পত্নী নয়। যদি ভাল এক লোক জুটতো, তার বদ অভ্যেসগুলি সে বদলাতে পারত। শুধু থাকতো চোখের চোরা চাউনি আর একটু বা ছেনালিপনা। সে তো আর তেমন দোষের নয়। কিন্তু উপপত্নী হচ্ছে পুরুষের খেলনা, তাই তার বদ অভ্যেসগুলো জীইয়ে রাখতে হোলো। নইলে যে পুরুষ খুশি হয় না। তার উপরে বড় লঙ্কার ঈর্ষা আর অত্যাচার তো ছিলই। মুখের গ্রাস যাতে পড়ে না যায়, এই ভয়ে সে স্বামীকে খুশি করার কাজে লেগে যেতো। এমনিতে মেয়ে সে খারাপ নয়। বরং দুঃখের পাঠশালায় তার পাঠ শুরু হয়েছিল বলে, একটু বা বেশিই উদার। মেয়ে হিসেবেও আর পাঁচজনের মতোই সে। যদিও তেরো বছর বয়সে হারিয়েছে তার কুমারীত্ব, আর বিশ বছর পেরুতে না পেরুতেই দু-দুবার পেট খসিয়েছে। এ তো আর তার দোষ নয়। কিন্তু এইসব মিলে তার মন হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী—তাই বড় লঙ্কা যত তাকে দাবিয়ে রাখতে চায়, সে ততো পাল্টা ঘা মারে।

আজ তার ঝগড়া শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নয়, তার সেই পুরাণো দিনের বাড়ির জন্যেও বটে। মুকদেনে ছিল তার বাড়ি। মনে পড়ে সেই খুদে নদীর পারের কথা। সে তার বাইজীর জীবন কাটিয়েছে সেখানে, গলার স্বর বেচেছে, দেহ বেচেছে। জাপানীরা দখল করেছে সেই মুকদেন, তার নিজের মুকদেন! তার দেশবাসীর ওপর চালাচ্ছে নির্যাতন, নিপীড়ন। সে ঘৃণা করে বড় লঙ্কাকে। সে কিনা চায় সেই জাপানীদের সঙ্গে মিতালি পাতাতে!

পরিবারে কাওদী তার একমাত্র বন্ধু। প্রভাতপদ্ম কুয়ান তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেন, কিন্তু সে যেন প্রিয় খেলনার উপর সোহাগ; তাকে সম্মান তিনি করেন না। কাওদীকে কেউ দেখতে পারে না, তাই সে সই তো খুঁজবেই। পীচ-মঞ্জরীকে সে আপনজন বলেই মনে করে, পীচ-মঞ্জরীও তাই ভাবে।

পীচ-মঞ্জরীর চেঁচামেচি আর গালি-গালাজ একটু থামতে কাওদী এসে তাকে চুপ করতে বললে। বৃষ্টি আর বাজ পড়ার পর তো পরিষ্কার হয়ে যায় আকাশ, উজ্জ্বল দিন দেখা দেয়। পীচ-মঞ্জরীর মনের কালো মেঘ উড়ে গেল, কাওদীকে সে কাছে টেনে নিলে। দুজনে মনের কথা বলতে লাগলো।

কিন্তু পীচ-মঞ্জরীর এবার শুরু হোল নালিশ—সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধেই তার নালিশ।

মেয়ে হয়ে কেউ জন্মায় গো—এমন বরাত কেউ করে আসে! মেয়ে তো নয় যেন ঘুড়ি। আকাশে যখন ওড়ে, ভারি সুন্দর দেখায়, কোনটা বা ফুলের মতো লাল, কোনটা বা উইলো পাতার মতো সবুজ, কিন্তু তার লাটাই তো থাকে অন্যের হাতে। যদি তুমি বাঁধন ছাড়িয়ে যেতে চাও, হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেল,—কিন্তু বিপদ তো আছে। গাছের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পার, টেলিগ্রাফের তারে আটকে যেতে পার। লেজ আর পাখনা হারিয়ে, তখন যা দশা হবে—কেউ আর তোমাকে ছোঁবেও না।

এমনি নালিশের জের চললো। এবার মোড় ঘুরিয়ে দিলে চিয়েনের মেজ ছেলের কথায়। সে তো কাওদীর মনের মানুষ। কাউদী তার গোপন কথা বলেছে তাকে।

আমি পশ্চিমের বাড়ির মেজ ছেলেকে দেখিনি। কিন্তু বিয়ে করলে বাপু, দেখে শুনে বিয়ে কোরো। লোকটা ভাল হওয়া চাই, উড়ুক্কু ভাব না থাকলেই হলো। দেখ, অভাবের ভয় কোরো না। শুধু এইটুকু মনে রাখবে—মনের সুখ চাই। আর অতো তাড়াতাড়িই বা কিসের! আমি একটু খোঁজ-খবর নিই। আমার জীবন তো শেষ হয়ে গেছে। আকাশের তলায় আপন বলতে কেউ নেই। হাঁ, এক সোয়ামি আছে বটে, কিন্তু সে তো আর সত্যিকারের সোয়ামি নয়। আমার বুকখানা পাথর আর চামড়া পুরু বলে এখনো ডুবে মরিনি। তোমার ভাল যে-খা হোক, এই-ই চাই। এতেই আমার সুখ। এমনি এমনি তো আমি আর তোমার মিতিন্ নই।

কাওদী হাসলো। নাক তার কুঁচকে উঠছে হাসিতে।

নয়

পিপিং-এর আকাশে আবার রং ফিরছে। তেরোই আগষ্ট আর সাংহাইয়ের কামানের নির্ঘোষ তার কালো মেঘের স্তর ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। পিপিং-এর মানুষের মাথার উপরে আর কালো আকাশ বুঝি তেমন করে ভেঙে পড়বে না।

রে ফেঙ সজাগ, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে সে দেখছে, পথও সে বদলেছে। সাংহাইয়ের যুদ্ধের খবর শুনে পরিবারের সবাই খুশি। তার মনে হোল, ওদেরই জিগিরে তারও জিগির দেওয়া উচিত। দেশ বাধা দেবে কি দেবে না—এ নিয়ে সে ভাবতে বসেনি। সে এমন একটা ভাব দেখাতে চায়, যাতে কেউ না খুঁত ধরতে পারে। কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রামের তারিফ করতে গিয়ে সে আবার মত বদলালো। তার স্ত্রীর স্বর যেন কেমন উল্টো ঠেকলো তার কাছে।

রে ফেঙ-এর বৌকে খুশি করতে গেলে বলতে হয়, তার দেহের গড়ন ভালো। আর সত্যি বললে বলতে হয়—যেন মাংসের এক ঢিবি। লম্বা সে বেশি নয়। ঘাড়ে গর্দানে মিশে গেছে। কেউ হঠাৎ ওর দিকে তাকালে, ওকে বিয়ারের পিপেই মনে করে বসবে। মুখখানা বোকা-বোকা, তার উপরে রংচং মাখে বেশ। চুল তো কোঁকড়াতে কোঁকড়াতে মুরগীর বাসা করে তুলেছে। একেবারে ভোঁতা মেয়ে, একটুও মন টানে না—রে ফেঙ আবার সেই তুলনায় রোগা। রে তাঙ তাই রাগ হলে বলে, বেশ জুটেছে, একজন রোগা শিবিঙ্গে—আর একজন মাংসের ঢিবি। রে ফেঙ-এর বৌ যে শুধু মাংসের ঢিবি তা নয়, স্বার্থপরতারও ঢিবি। সে স্বামীকে মুখ ঝামটা মারলে, সাংহাই-এ লড়াই হচ্ছে তাতে খুশি হবার কি আছে? ঠোঁট তার আস্তে আস্তে নড়ছে। আমি তো জন্মেও সেখানে যাইনি। কামানের গোলায় যদি সাংহাই চুরমার হয়ে যায়, তাও তো আমি দেখতে যাব না'

না গো, না, রে ফেঙ হাসতে হাসতে বললে, চীনা মহল্লায় লড়াই চলেছে। বড় বড় বাড়িগুলি সব বিদেশী এলাকায়। সেগুলি কি করে চুরমার হবে গো? আর যদি হঠাৎ হয়েই যায়, তাতেও ক্ষতি নেই। দেশ-বিদেশ

ঘোরবার মতো আমাদের যখন টাকা হবে, তখন আবার বাড়িগুলো গড়া হয়ে যাবে। বিদেশীদের খুব টাকা কিনা—ওরা যখন বলে, বাড়ি গড়ব, তখনি বাড়ি গড়ে উঠে। আবার যখন বলে, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ বাড়ি—সে কাজও তেমনি পুরোদমে চলে।

তা যা-ই বল না বাপু, আমি সাংহাইয়ের লড়াইয়ের কথা শুনতে চাই না। আমরা বেড়িয়ে আসবার পর ভাঙচুর করলেই হোত। দু দিনের তর্ সইল না গা!

রে ফেঙ ঘাবড়ে গেল। লড়াই থামাবার হিম্মৎ তার নেই, বৌকে চটাবার বা তার সাধ্য কি! শুধু একটা কাজই সে করতে পারে, সাংহাইয়ের লড়াই নিয়ে সে আর কথা বলবে না।

যখন টাকা হবে, তখন সাংহাই আমরা যাবই, সে বললে। রে ফেঙ চুপ করতে চাইলেও তার বৌ চুপ করলো না।

কখন টাকা হবে তোমার? তোমাকে বিয়ে করে তো ঠকেছি। কি ঘর-বর গো একবার তাকিয়ে দেখ! ছেলে বুড়ো, মেয়ে মরদ সবাই কৃপণ! হপ্তায় একবার সিনেমায় গেলেও নাকি পাপ হয়। ভোর থেকে রাত অবধি গল্প-গুজব নেই, হাসি নেই, একটু ফূর্তি নেই—সব সময়েই মুখ বুজে থাক—যেন কবরখানায় এসেছ!

রে ফেঙ-এর মুখে হাসি ফুটে উঠলো, আহা, একটু সবুর কর না! তারপরে গম্ভীর হয়ে বললে, আমাদের আয় বাড়ুক, যখন মনের সাধে খরচ-পত্র করতে পারব এখান থেকে সরে পড়ব।

সবুর করো, সবুর করো—কতদিন সবুর করবো বল তো? রে ফেঙ-এর বৌয়ের মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠলো। নাকের ফুটোর ধারে ধারে জমছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

চীনা বিমান এল, লড়াই করলো। পিপিং-এর মানুষের মনে আবার আশা তার বনিয়াদ গাঁথলো। রিক্সাওয়ালা খুদে সুইর কানে যেন অহরহ উড়োজাহাজের শব্দ বাজছে। সে ক্ষণে ক্ষণে মাথা তোলে, আর আকাশে খুঁজে বেড়ায়। আজ শত্রুর উড়োজাহাজ দেখে চীনা বলেই দাবী করে বসলো! খরমুজের মতো মুখখানা সাতস্যূর্যের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে লাল হয়ে উঠলো। দেখ পরামাণিকের পো, দাড়ি কাটা আর চুল ছাঁটার কসরৎ

নিয়ে যা বলবে মেনে নেব। তুমি ওস্তাদের কাছে বহুদিন কায়দাগুলো শিখেছ, কিন্তু যেখানে চোখের নজরের ব্যাপার, সেখানে মুখ বুজে থাক না বাপু। তোমার নজর তো বেশি দূর এগোয় না আর আমার নজর একেবারে সব কিছুর নাগাল পায়। আরে আমি যে পষ্ট দেখলাম, নীল আকাশ আর সাদা সূয্যি পাখায় আঁকা, আমার চোখ কি ভুল দেখেছে? না, না, ভুল হয়নি। আমাদের উড়োজাহাজ যদি সাংহাইয়ে বোমা ফেলতে পারে, পিপিং-এ কেন পারবে না! আলবৎ পারবে!

সাতসূর্য 'আমাদের' উড়োজাহাজের কথা শুনে খুশিই হয়েছে, তবু সুইর সঙ্গে তর্কের জের টানতে চায়। খুদে সুই যখন চোখের নজরের কথা পাড়লে সে একেবারে ঢিট্ হয়ে গেল। কিন্তু রণে ভঙ্গ না দিয়া খানিকটা আরও তর্ক করলে। এবার সে হাতিয়ার-ভর্তি কাপড়ের থলেটা বগলে চেপে হাসিমুখে বেরিয়ে পড়লো। দোকানে দোকানে কামাতে হবে। দোকানের খদ্দেরদের কাজে সে খুদে সুইর কথাটাই ডালপালা দিয়ে বাড়িয়ে বললে। খদ্দেরদের মাথা হাত দিয়ে চেপে, আর-এক হাত দিয়ে চিবুকের উপর ক্ষুর টানতে টানতে সে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলো, এই তো আমাদের সাতটা বোমারু জাহাজ দেখে এলাম—মস্ত জাহাজ! ওদের পাখনায় বড় করে নীল আকাশ আর সাদা সূর্য আঁকা। ক্ষুরে কেটে যাবার ভয়ে খদ্দেররা তার কথার প্রতিবাদ করতে পারলো না।

খুদে সুই গানের কলি ভাজতে ভাজতে রিক্সা নিয়ে এসে দাঁড়ালো পথের মোড়ে। তখনো সে চারিদিকে রটাচ্ছে, সে চীনা উড়োজাহাজ দেখেছে। জাপানী সৈন্য দেখলেই সে ছুটছে হাওয়ার বেগে, দূর দূর পাল্লায় গিয়ে আবার সোয়ারীকে বলছে, ওই কাছিমগুলোকে ঘায়েল করে ছাড়বে কর্তা। আবার ঘুরে ফিরে বলছে, চীনা উড়োজাহাজের কথা—চীনা উড়োজাহাজ এসেছে পিকিং-এ!

ন'কর্তা লি বহুদিন বেকার! শহরের বাইরে থেকে এখনো মাঝে মাঝে গুলীর শব্দ ভেসে আসছে। কয়েকদিন হোলো পুলিশরা করেছে ধর্মঘট। এই সময়ে কে মালপত্র সরাবে—কার এত সাহস? আজ অবশ্য একটা কাজ জুটে গেল। কারো মালপত্র সরাবার কাজ নয়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ। তাঁর আসল পেশা মালপত্র সরানো, কিন্তু বুড়ো বয়সে তিনি একাজও করেন।

বাক্স, চেয়ার, টেবিল যে সরাতে পারে, সে কেন কফিন বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না! জাতীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের পথে কফিন তোলা চললো। সাদা সাদা প্রজাপতির মতো এক মুঠো নোট ছড়িয়ে দেওয়া হোলো। ন'কর্তা লি মদের খরচের অঙ্কটা সবাইকে জানিয়ে দিলেন, কর্তারা আট হাজার পয়সা দিয়েছেন। ছোকরার দল অমনি জোরে বলে উঠলো, হেঁইয়ো···হেঁইয়ো! ন'কর্তার পরনে সাদা শোকের পোষাক, তিনি হাতের কাঠি বাজিয়ে সঙ্কেত করলেন। তাঁকে দেখে মনে হোল, তিনি নিজের দুঃখদুর্দশা ভুলে গেছেন।

ন'গিন্নিও এসেছেন কেরামতি দেখতে—তারিফ করতে। খুদে খাটালের গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার নেওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। একাজে যেমন দায়িত্ব, তেমনি সম্মান। ন'গিন্নি ক'বার চোখ রগড়ে নিলেন, এবার ন'কর্তাকে দেখলেন। তাঁরই দিকে তাকিয়ে ন'কর্তা হাসছেন। ন'গিন্নিও তারিফ করে আপন মনে বল্লেন, বুড়ো মিনসের ঢং দেখ না!

মেরাপ-বাঁধিয়ে লিউও আজ কাজ পেয়েছে। পুলিশ থেকে হুকুম জারী হয়েছে, যাদের উঠোনে মেরাপ বাঁধা আছে, এখুনি খুলে ফেলতে হবে। এ হুকুমের কারণ কি জানায় নি, কিন্তু সবাই ঠাহর করছে, চীনা উড়োজাহাজের ভয়েই এই হুকুম। চীনা উড়োজাহাজ এসে বোমা ফেলবে তাই জাপানীদের এ ভয়। মেরাপে চট করে আগুন লেগে যেতে পারে। তাই লিউ মেরাপ খুলতে ব্যস্ত। সে বাড়ির উপরে উঠে খান কয়েক 'আমাদের উড়োজাহাজ' দেখবার আশায় বসে রইল।

ছোট ওয়েন আর তাঁর স্ত্রী আজ উঠোনে বসেই রেওয়াজ চালিয়েছেন। আর যেন লাজ-লজ্জা নেই। এমন কি চার নম্বরের বিধবা মে ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সাহস খুব কম। মার্কোপোলো সাঁকোর ঘটনার পর গুলী তো চলছেই, তারপর থেকে তিনিও আর উঠোন পেরোন নি। তাঁর উনিশ বছরের নাতি চেং চ্যাঙ সুনকেও বেরুতে দেননি। তার তো পথে ঘুরে ঘুরে কলের গান শোনানই কাজ।

বিধবা মে'র ন'গিন্নির থেকেও দয়ার শরীর। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। কিন্তু ধীর, সংযতই আছেন, মুখে তাঁর সর্বদাই হাসি। এখন

তাঁর চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু দেহখানা এখনো ভেঙে পড়েনি, আর যত্নেও রাখেন। তাঁর আঙুলে চল্লিশ বছর আগেকার আঙটি। তাঁর কিছু পুঁজিপাটা আছে, কিন্তু সাদাসিদে ভাবেই থাকেন।

তাঁর নাতি—উনিশ বছরের চেং চাং সুন আট বছর বয়স থেকে দিদিমার কাছে আছে। তার বাপ-মা মারা যাবার পরেই এসে আছে। তার মাথাটা প্রকাণ্ড, নাকি সুরে কথা কয়। মনে হয় যেন সর্দি ওর লেগেই আছে; বড় মাথা আর নাকি সুরের জন্যে ওকে বোকাই দেখায়। কিন্তু মোটেই সে বোকা নয়। দিদিমা তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহারই করেন। খাবার সময় রোজই মাংস করে দেন, নিজে তিনি কিন্তু নিরামিষই খান। অনেক ভেবে-চিন্তে তবে এই ব্যবসায় নাতিকে লাগিয়ে দিয়েছেন। একটা পুরানো কলের গান আর ডজন দুয়েক পুরানো রেকর্ড তিনি কিনে দিয়েছেন। সে রোজ বিকেলে এইসব সরঞ্জাম নিয়ে বেরোয়, পথে পথে গান শুনিয়ে ফেরে।

চাং সুনের এ গানের ব্যবসা ভালই লাগে। নিজেরও তার গান গাইবার খুব ইচ্ছে। এ পেশা তাই যেন তার কাছে এক খেলা। রেকর্ডের যত গান সে শিখে ফেলেছে, যদি কোন রেকর্ড ভেঙে যায়, বা একটা দিকে চটা উঠে যায়, সে নিজে গান গেয়ে সে ক্ষতিপূরণ করে। কথা যখন বলে তখন তার স্বর মৃদু, কিন্তু গানের সময় তার স্বর জোরালো হয়ে ওঠে। পেশা তার ভালই চলেছে। বহুলোক তার জন্যে বসে থাকে, অন্য বাজিয়েদের ডাকে না। তার নাকি স্বর তার ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য। তার আশা আছে, সে একদিন থিয়েটারে ঢুকবে। সে মুখে রং মেখে অভিনয় করবে।

আজ চাং সুন তার দিদিমাকে বললে, আর ভয় নেই। এখন কাজে বেরুতে পারি। সাংহাইয়েও লড়াই চলেছে। আমাদের উড়োজাহাজ জাপানী শয়তানদের উপর বোমা ফেলতে ছুটছে। আমরা জিতবই, সাংহাইয়ে যদি আমাদের সৈন্যরা জেতে, তাহলে পিপিংও জুড়োবে। জাপানীরা ভয়ে পালাবে।

দিদিমার কিন্তু চাং সুনের কথায় বিশ্বাস হোল না। তাই সাহস করে তিনি নিজে এসেছেন ফটকে। যেন ফটক থেকেই সাংহাই দেখা যায়।

বুড়ির সাদা চুলে রোদ পড়ে চাঁদির তারের মতো ঝলসে উঠলো। সবজে আলো ঠিক্‌রে পড়ছে লোকাস্ট গাছের পাতায় পাতায়। তার মুখে আলো এসে পড়েছে, বলি রেখা মুছে গেছে, লোকাস্ট গাছের নিচে কেউ নেই। একেবারে ফাঁকা। শব্দ নেই। খুদে খাটাল চুপচাপ! তিনি ফটকে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বাড়ির ভিতরে ফিরে এলেন।

খুদে খাটালের সবাই খুশি, সবাই চীনের এই বিজয়কে অভিনন্দন জানালে। শুধু প্রভাতপদ্ম কুয়ান খুশি নন। চাকরী আর পদ-মর্যাদার তালাসিই সার, এখন পর্যন্ত আশাই দেখতে পাচ্ছেন না। চাকরী কোথায়? আবার চীন যদি জয়ী হয় সে ভয়ও আছে। তিনি বহু দুঃখে তাঁর তোড়-জোড় থামিয়ে দিলেন। কয়েক দিন যাক, হাওয়া কোন্ দিকে বয় দেখা যাক!

কিন্তু বড় লক্ষ্মী তো বাগ মানেন না, কিছু বুঝতে চান না। তিনি বললেন, ব্যাপারখানা কি বলতো? এই তো সবে শুরু, তুমি অমন এলিয়ে পড়লে কেন গো? সাংহাইয়ে লড়াই হচ্ছে তো হয়েছে কি? আমাদের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক? তোমার বুঝি মনে হচ্ছে, নানকিঙের কয়েকটা সৈন্য জাপানীদের ঘায়েল করে দেবে? ছ'টা নানকিঙ গেলেও জাপানীদের কিছু হবে না।

বড় লক্ষ্মীকে যেন ভূতে পেয়েছে। যেন এখনকার চেষ্টার উপরেই তাঁর জীবনের সবকিছু নির্ভর করছে। টাকাকড়ি—ধনদৌলত সবকিছু! এতটা এসে, এখন মাঝপথে থেমে যাবার পাত্রী তিনি নন।

খুদে খাটালে জন তিংই একমাত্র লোক যার সঙ্গে কুয়ানদের বাড়ির সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক আছে। অন্য সব বাড়িগুলোকে সে হেনস্তা করে, তারাও তাকে মান দেয় না। সব পরিবারেরই রীতি আলাদা। কুয়ান পরিবারের উপর তার কিন্তু ভারি ভক্তি। আর কুয়ানরাও তার বিদেশী ঠাট দেখে তাকে তারিফ করেন। এতেই বন্ধুত্বের বনিয়াদ তৈরী হয়েছে। সে মাঝে মাঝে 'রাজবাড়ি' থেকে কিছু কফি বা মাখন নিয়ে আসে, কখনো বা আনে নেবুর মোরব্বা। এ পাড়ায় একমাত্র কুয়ান পরিবারেই এ জিনিসগুলির চাহিদা আছে। তাঁরা এ জিনিসের কদর বোঝে। তাই দুই পরিবারে আলাপ আছে। ন্যায্য দামে সে এগুলি কুয়ানদের বিক্রি করে।

জন তিং-এর বাবা ছিল খৃষ্টান। ১৯০০ সালে বক্সার বিদ্রোহে মারা যায়। বাবা শহীদ হয়েছে, তাই ছেলে পেয়েছে বিদেশীদের আশ্রয়। সেও তেরো বছর বয়েস থেকেই ব্রিটিশ দূতাবাসে পরিচারকের কাজে লেগে গেছে। ফাই-ফরমায়েস-খাটা খিদমৎগার থেকে এখন টেবিলের খানসামা হয়েছে। খানসামাগিরি এমন কিছু উঁচুদরের পেশা নয় খুদে খাটালে, তবু জন তিং একেবারে ফেল্না লোক নয়। নিজের সুখ্যাতি সে নিজেই ছড়াতে খুব পটু। সে যখন নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা বলে, তখনই নিজেকে বংশানুক্রমে খৃষ্টান বলে জাহির করে। এও যেন এক বনেদী বংশের গৌরব। যখন কেউ তার পেশার কথা জিজ্ঞেস করে, তখন যে দূতাবাসকে বলে রাজবাড়ি—রাজবাড়ি যেন নিষিদ্ধ নগরীর পুরানো সম্রাটদের প্রাসাদের চেয়ে মাত্র ডিগ্রিখানেক ছোট এমনি তার ভাবখানা।

তিনটে কামরা নিয়ে সে থাকে, তার ঘরও সাতসূর্য আর খুদে সুইর থেকে ভাল। বেশ ফিটফাট সাজানো, অনেক বিদেশী জিনিস আছে; টেবিলে আছে বহু বিদেশী বই। একই বই, কিন্তু মলাটগুলি আলাদা। সবই বাইবেল। তাতে আছে ভাঙা বিয়ারের গেলাস; শাম্পেনের পাত্র আর নানারকম বোতল আর কফির কৌটো। গেলাসগুলো ভাঙা বটে, কিন্তু এখনো কাজ চলে। কাপড়-চোপড়েও সে কায়দা-দুরস্ত। কখনো কখনো সে চীনা পোষাকের উপর বিদেশী কোট চাপায়।

আজ সে আধ বোতল স্কচ এনেছে, কুয়ানকে দেবারই তার ইচ্ছে।

জন তিং যদি বিদেশী রেস্তোরাঁর খানসামা হোত, বড় লঙ্কা তার দিকে ফিরেও তাকাতেন না। তার কাছে থেকে রোজ মাখন আর টিনে-ভর্তি খাবার কিনলেও তেমন নজর দিতেন না। কিন্তু জন তিং যে রাজবাড়ির খানসামা—আর কথাটায় যেন কি এক জাদু আছে। যদি সম্রাটের প্রাসাদের খোজারা সম্মান পেয়ে থাকে, তাহলে বড় লঙ্কার চোখে জনই বা পাবে না কেন? কিন্তু জন তিং যেসব জিনিস আনে সেগুলি এমন দুর্লভ কিছু নয়, কিন্তু তার উপরে যে 'ব্রিটিশ রাজবাড়ির' লেবেল সাঁটা থাকে সেইটেই আসল জিনিস। বড় লঙ্কা কেমন বিহ্বল হয়ে যান। জন তিং-এর তাতেই মান আর খাতির। সে রাজবাড়ির লোক, যা জিনিসপত্র আনে তাও রাজবাড়ির—জন তিং যেন বড় লঙ্কা আর রাজবাড়ির ভিতরে এক সম্পর্ক

গড়ে তুলেছে। এও তো গর্বেরই বিষয়। যখনি তিনি কাফি কি মোরব্বা অতিথিদের পরিবেশন করেন, বার বার শুনিয়ে দেন, ওগুলো কিন্তু ইংরেজ-দের রাজবাড়ির জিনিস। এ কথা তাঁর মুখে লেগেই আছে। এ যেন চিউইং গামের মতোই মিঠে, তেমনি তার্।

জন তিংকে হুইস্কীর বোতল হাতে আসতে দেখে, তিনি তখনি স্বামীকে বকাঝকা থামিয়ে দিলেন, ঠোঁটে টেনে আনলেন হাসি। আরে জন তিং যে! এস, এস! জন নামটাও তার পছন্দ। তেমন জাঁকালো নাম নয়, ইংরাজবাড়ির মতো তো নয়ই, তবু বিদেশী গন্ধ তো আছে। এ যেন হুইস্কী আর সার্ডিন মাছের মতোই বিদেশী।

জন তিং-এর বয়েস চল্লিশের উপর। তার দাড়ি নিখুঁত করে কামানো। পিঠ সিধে, বুক চিতিয়ে চলে। কারো দিকে সোজা তাকায় না। সব সময়ে যেন মুখ থেকে হাতের দিকেই তার নজর। আর সে হাত যেন ধরে আছে ছুরি আর কাঁটা। বড় লঙ্কার সাদর আহ্বান শুনে সে শুধু একটু হাসলো। ইংরেজ দূতাবাসে এতদিন ধরে সে চাকরী করছে, তাই তার অভ্যেসও হয়ে গেছে অদ্ভুত। জোরে সে কথা বলে না বা হাসে না। সাহস হয় না।

কি আনলে আজকে? বড় লঙ্কা বললেন।

হুইস্কী। আপনার জন্যেই নিয়ে এলাম।

দাও তো? বুকটা তাঁর একটু ধুক ধুক করছে, ছোটখাটো দাঁও মারতে তাঁর ভারি ভাল লাগে। বোতল নিয়ে শিশুর মতো বুকে চেপে ধরলেন। আহা জন, বেঁচে থাক! কি খাবে বল? চা খাবে? জেসমিনের গন্ধ দিয়ে চা খাবে? রাজবাড়িতে তো লাল চা খাও। একটু মুখবদল হবে আর কি!

বোসো, বোসো জন! কুয়ানও বিনয়ের অবতার হয়ে উঠলেন, তার পর খবর কি? সাংহাইয়ের লড়াইয়ের সম্পর্কে রাজবাড়িতে ওরা কি বলে? চীন কি জাপানের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে? বিদেশীরা বলেন, তিন মাস কি ছ'মাসের মধ্যে সব চুকেবুকে যাবে। জন তিং এমনভাবে বললে, যেন সে চীনা নয়, চীনে কোন বিদেশী দূতাবাসের কুট রাজনীতিবিদ্।

কি ভাবে চুকবে?

চীনা সৈন্যরা হেরে যাবে।

বড় লঙ্কা খবরটা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বোতলটা তাঁর হাত থেকে উত্তেজনায় পড়ে যাচ্ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, প্রভাতপদ্ম শুনছ? আমি মেয়েমানুষ হতে পারি, কিন্তু তোমাদের পুরুষদের চেয়ে আমার বুদ্ধি কম নয়। তুমি সুযোগ হারিও না। একটু উঠে-পড়ে লেগে যাও!

দশ

জন তিং-এর ঘোষণার পর কুয়ান ঠিক করলেন, তিনিও তাঁবেদারির বাঁদর নাচে ভিড়ে যাবেন। সাংহাইয়ের প্রতিরোধ সংগ্রাম নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। এর মধ্যে মেয়র আর পুলিশ কমিশনারের নাম জারী হোলো। তিনি ভাবলেন, এবার সরকারি দপ্তরগুলিতে ঘোরাফেরা করা দরকার। আবার তাঁর আর বড় লঙ্কার সফর শুরু হোলো। কিন্তু ফল হোল না।

খবর আর গুজব হাওয়ার মতো নানা দিক থেকে বয়ে আসছে পিপিং-এ। কখনো বা জোর, কখনো বা ঢিমে তালে আসছে। দুনিয়ার কাছে পিপিং এখন মৃত। তবু পিপিং-এর মানুষ এখনো চীনা গণতন্ত্রের নাগরিক হিসেবেই বেঁচে আছে। যেখানেই প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলছে, সেখানেই ছুটে ছুটে যাচ্ছে তাদের মন। আবার মাঞ্চুরিয়ায় গেরিলারা তৎপর হয়ে উঠেছে; নানকউতে শত্রুর দু'হাজার সৈন্য হত; সিচিয়াংচু-এ পড়ছে বোমা। সত্য আর মিথ্যা ইশতেহার একটার পর আর-একটা পাওয়া যাচ্ছে, শহরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। খুদে খাটালে তো একটা খবরে সাড়া পড়ে গেছে। রীতিমতো সাড়া। নানকউয়ের এক মোটর চালক নাকি তিরিশ জন জাপানী সৈন্যসুদ্ধ একখানা ট্রাক পাহাড় থেকে উল্‌টে ফেলে দিয়েছে। নিজেও সে মরেছে। ছোকরা কে? কেউ জানে না, কিন্তু সবারই ধারণা—এ চিয়েনদের মেজ ছেলে না হয়ে যায় না! ও বয়সেও ছোকরা। পিপিং-এর উত্তরে ট্রাকও চালায়। বাড়িও খুব কমই আসে! ঠিক এই ছোকরা! কিন্তু চিয়েনদের ফটক যে তেমনি বন্ধ, তত্ত্ব-তালাস যে করবে তারও জো নেই।

রে স্যুয়ান কানাকানি শুনে খুশি হোল, অবাকও হোল। কে জানে কেন, সে ভাবলে, এমনি করে মরায় চরিত্রবলের দরকার। এ এক সম্মানের ব্যাপার। জাপানীরা হানা দিয়েছে পিপিং-এ, জোর করে চেপে বসেছে তার বুকে। কিন্তু বক্সার বিদ্রোহের সময়ের বাপ-দাদার থেকে, ছেলেরা এখন ঢের চতুর। তখন তো সৈন্যরা ছাড়া কেউ এমন করে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিতে যায় নি, দেশের সম্মান রাখতে এগোয় নি। শুধু সৈন্য আর সেনা-পতিরাই আত্মাহুতি দিয়েছে। কিন্তু এবার তো আত্মাহুতির পালা মানুষের। মানুষ প্রাণ দিচ্ছে দেশের জন্যে, সাধারণ মানুষ। খবরটা শুনে তার মনে হোল, সবাই তার মতো সংশয়ে নেই, মিথ্যে শান্তিও তারা চায় না। চিয়েনদের মেজ ছেলের এ কাজ সৈনিকের আত্মোৎসর্গের চেয়েও বেশি, এর দাম তো ঢের ঢের বেশি।

রে স্যুয়ানের ভয় হোল। এতে হয়তো সমস্ত চিয়েন পরিবার জড়িয়ে পড়বেন। পড়শীরা হয়তো বীরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে, বেহুঁস হয়ে গুজব রটাবে, নামধাম বলে ফেলবে। সে তাই ছুটলো ন'কর্তার কাছে।

ন'কর্তা কথা দিলেন, তিনি পড়শীদের ডেকে গোপনে বলে দেবেন, এ নিয়ে তারা যেন বাড়াবাড়ি না করে। তিনি তারিফও করলেন, যদি আমরা সবাই চিয়েনদের মেজ ছেলের মতো হতাম, তা'হলে ঐ খুদে জাপানীরা তো দূরের কথা, বড় জাপানীরাও আমাদের উপর জুলুম চালাতে সাহস করত না।

রে স্যুয়ানের ইচ্ছে, একবার চিয়েনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু সে গেল না। পড়শীদের নজর পড়বে এই তার ভয়। আর চিয়েন যদি এ খবর না শুনে থাকেন, এতে তাঁর আরো উদ্‌বেগ বাড়বে বইতো নয়।

ন'কর্তা সবাইকে ডেকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। তারা কথা দিলে, বাড়াবাড়ি করবে না। কিন্তু তাব হুঁশিয়ারির আগেই খুদে স্থই গিয়ে পীচ-মঞ্জরীকে বললে কথাটা। পীচ-মঞ্জরী গরীবের দরদী। সে যখন-তখন খুদে স্থইর রিক্সা ভাড়া করে। সেদিন সে খবরটা শুনে তাকে কিছু বকশিসই করে ফেললে।

পীচ-মঞ্জরী রিক্সায় সোয়ারী হয়ে খুদে স্থইর সঙ্গে আলাপ করে। ভালই তার লাগে। বড় লঙ্কা দেখেন ঘর-গৃহস্থালীর কাজ, পীচ-মঞ্জরীর তাতে হাত দেবারও উপায় নেই। তার বিয়ে হলে কি হবে, সে এখনো গিন্নি নয়,

তাই তার মনে হয় সে এক বেবুঝে, হোটেলে এসে আস্তানা গেড়েছে, তাই সে পরের কথা নিয়ে মাথা ঘামায়। খুদে সুইও ফিরিস্তি দেয় তার কাছে। পীচ-মঞ্জরীর মাঝে মাঝে মনে হয় তার চেয়ে সবাই ভাল আছে। এমন যে খুদে সুইর বৌ, যে একেবারে বেহদ্দ গরীব, খালি মার খায়, সেও তার চেয়ে হাজার গুণে সুখী। সে তো ঘরের গিন্নী বিয়ে-করা পরিবার। খুদে সুই সবই পীচ-মঞ্জরীর কাছে বক্‌বক্‌ করে বলে যায়, আজও ব্যাপারটা রঙ ফলিয়েই বললে। এমন বড়াই করবার মতো ব্যাপার, বলবে না!

ঠাকরুণ!—যখন কুয়ানদের বাড়ির কেউ কাছে-পিঠে থাকে না, তখন পীচ-মঞ্জরীকে সে ঠাকরুণ বলেই ডাকে। তার দয়ার একটু প্রতিদানই সে দেয়। ঠাকরুণ, খুদে খাটালে এক আজব কাণ্ড হয়ে গেছে!

কি আবার আজব কাণ্ড হোল? পীচ-মঞ্জরী শুধালো। খুদে সুই ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

শুনছি, চিয়েনদের মেজছেলে এক ট্রাক-ভরতি জাপানীদের সাবড়ে দিয়েছে।

তাই নাকি! কে বললে?

সবাই-ই বলছে।

হাঁ, হাঁ ছোকরা ভাল বটে!

তাহলে এই শহরের বাসিন্দারা সবাই একেবারে বাজে নয় ঠাকরুণ!

ওর কি হোল?

মারা গেছে। যাক—তবু কাজের কাজ করলো!

পীচ-মঞ্জরী বাড়ি ফিরে তার পেয়ারের কাওদীকে সব কথা বললে, আবার খানিকটা ডালপালাও বাড়িয়ে দিলে। মেদী আড়ি পেতে শুনে খবরটা গিয়ে প্রভাতপদ্মকে দিলে। সে এমনভাবে বললে, এ যেন তার নিজস্ব খবর।

প্রভাতপদ্ম খবরটা শুনে একটুও বিচলিত হলেন না। বরং মনে হোল, চিয়েনদের বাড়ির মেজ ছেলেটা একটা মুর্খ। আমাদের সবারই সম্বল একটি মাত্র জীবন। অন্যকে মারবার জন্যে সেই জীবন কি খোয়ানো চলে? তারপর একসময়ে ঘরোয়া কথা বলতে বলতে তিনি বড় লক্ষাকে খবরটা দিলেন।

বড় লক্ষা যখন কিছু করবেন ভাবেন, তিনি আগে তার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর চিন্তা এখন স্বামীকে সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই হাওয়া জোরে বইলে, কি বাড়ির আনাচে-কানাছে পাখী ডেকে উঠলেও তিনি মনে করেন, এর সঙ্গে বরাতের যোগাযোগ আছে। কুয়ানের বড় চাকরী পাবার সময় বুঝি এল! এই খবরটা শুনে তিনি অমনি এক নতুন ছক ফেঁদে ফেললেন।

তাঁর কুঁতকুঁতে চোখ বড় হয়ে গেল, মুখে দেখা দিল রহস্যময় ভাব। যেন রাজমাতা জাতীয় সমস্যার আলোচনায় বসেছেন তাঁর মন্ত্রি-পরিষদের সঙ্গে। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, প্রভাতপদ্ম. যাও, খবরটা গিয়ে দিয়ে এস, এই তোমার উন্নতির পথ!

প্রভাতপদ্ম চুপচাপ। তাঁকে ঘুস দিলে তিনি হাত পেতে নেবেন, কিন্তু বুক ফুলিয়ে গিয়ে কাউকে খুন করা তাঁর সাহসে কুলোয় না।

কি, চুপ করে রইলে যে?

খবর দেব! গোটা পরিবারটাই যাবে যে! প্রভাতপদ্মের যে চিয়েন পরিবারের উপরে খুব দরদ তা নয়, কিন্তু চিয়েনদের যদি নিয়ে গিয়ে সাবড়ে দেয়, তখন যে চিয়েনের ভূত তাঁর ঘাড়ে চাপবে। হাঁ, তাঁর ভয়ের কারণ তো সেইখানে!

ওরে আমার সাউখোর এলেন! নিজের উন্নতির কথা ভাবছেন না। অন্যের পরিবার নির্মূল হলেই বা তোমার কি? চিয়েন তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি! তুমি তার শোধ তুলতে চাও না? এই তো সে সুযোগ।

প্রভাতপদ্ম প্রতিশোধের কথা শুনে একটু যা উত্তেজিত হয়েই উঠলেন। তাই তো, চিয়েন তাঁকে হাজার মাইল দূরে ঠেলে ফেলে রেখেছেন! না, এটা তাঁর উচিত হয়নি। চিয়েন পরিবাবের নাম যদি পৃথিবী থেকে মুছেও যায়, তার কারণ তো চিয়েন স্বয়ং। তাঁর প্রেত এসে কেন তাঁকে হানা দেবে? তিনি তো আর নিমিত্ত নন। তিনি এবার বললেন,

কিন্তু কথাটা কি সত্যি?

পীচ-মঞ্জরী তো শুনে এসেছে! ওকে জিজ্ঞেস কর। বড লক্ষা যেন হুকুম জারি করলেন।

পীচ-মঞ্জরীকে জেরা করে প্রভাতপদ্ম একেবারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। খবর করতে তাঁর নিজের মনেও দ্বিধা—খবরটা সত্যিও হতে পারে, আবার মিথ্যেও হতে পারে। এ-খবর দিয়ে পুরস্কারের আশা করা কি যায়! কিন্তু বড় লঙ্কার দৃষ্টিকোণই আলাদা। তিনি বললেন, দেখ, খবরটা মিথ্যে কি সত্যি, কথাটা তা নয়। শুধু খবরটা দিয়ে দাও। যদি মিথ্যে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি! আমাদের খবর মিছে হতে পারে, কিন্তু আমাদের মন তো সাঁচ্চা—এতেই জাপানীরা বুঝবে, আমরা তাদের দলের মানুষ। এতে কি সুবিধে হবে না? তোমার যদি সে হিম্মৎ না থাকে, আমি নিজে যাব।

প্রভাদপদ্ম তবুও স্বস্তি পেলেন না। কিন্তু রাজমাতাকে চটাবার সাহস তাঁর নেই। তাই রাজি হয়ে গেলেন।

পীচ-মঞ্জরী কথাটা কাওদীকে তখনি জানিয়ে দিলে। সে ঘরময় অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলো। চিয়েনদের মেজ ছেলে—তার কল্পনার বীর—তিনি আজ সত্যিকারের বীর-নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বীর হলেও তিনি যে তার—একান্তই তার। তাই তো আজ চিয়েন পরিবারকে বাঁচাবার দায়িত্ব তার ওপর পড়েছে। কিন্তু চিয়েনের সঙ্গে কি করে সে কথা কইবে? তিনি বাড়ির বাইরেই বেরোন না, আর সদর ফটকও বন্ধই থাকে। যদি সে ফটকে গিয়ে ঘা মারে, তাঁর নিজের বাড়ির সবাই জানবে। যদি চিঠি লিখে দেয়, তাহলেও হয় তো কাজ হবে না। নিজেরই গিয়ে দেখা করা দরকার। সে গিয়ে বলবে সব কথা। কিন্তু কি করে বলবে?

পীচ-মঞ্জরীর কাছে গিয়ে সে সাহায্য চাইল। পীচ-মঞ্জরী দেয়ালের উপর দিয়ে যাবার পথ বাত্‌লে দিলে। পীচ-মঞ্জরী বললে, আমাদের দক্ষিণের বাড়ির কোণে ছোট লোকাস্ট গাছটা রয়েছে না? ঐটেয় চড়ে দেয়ালে গিয়ে উঠবে।

কাওদি এ বিপদও বরণ করতে রাজি—দুঃসাহসিক অভিযানের ঝুঁকি সে নেবে। তার শুধু মনে হচ্ছে, চিয়েনদের মেজ ছেলের এই মৃত্যু—তারই সৃষ্টি। সে তো মনে মনে চেয়েছিল, ও হোক বীর—বীরত্বে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিক। আজ তো তাই দিয়েছে। কাওদী ঠিক করলে, সে দেয়াল টপ্‌কেই যাবে। পীচ-মঞ্জরী রাখবে চারিদিকে নজর। সে সেই সুযোগে উঠবে দেয়ালে।

ন'টা বাজে। কুয়ান এখনো বাড়ি ফেরেন নি। বড় লক্ষার মাথা ধরেছে, তিনি সকাল-সকাল শুয়ে পড়েছেন। মেদী ঘরে শুয়ে পড়ছে প্রেমের গল্প। কাওদী ভাবলে, এই-ই সুযোগ। এখুনি সে যাবে পশ্চিমের বাড়ি। সে পীচ-মঞ্জরীকে বললে, সে যেন সদর ফটকে তার প্রতীক্ষায় থাকে! সে আবার দেয়াল টপকে ফিরতে চায় না।

তার খাঁদা নাকের উপর জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, হাত আর ঠোঁট কাঁপছে। দেয়াল বেয়ে ওঠার বিপদ আর অভিযানের উত্তেজনায় সে যেন সাহস পাচ্ছে, আবার ভীরুতাও যে না আছে তা নয়। দেয়ালের ওপাশে গেলেই সে পাবে তার বীর-নায়কের বাড়ি। বীর-নায়ক আর নেই, তবু তো তার লীলাভূমি সে দেখবে। হয়তো তুচ্ছ কিছু স্মৃতি হিসেবে সে নিয়েও আসবে। এমনি ভাবনায় সে বিভোর হয়ে উঠলো, দ্রুত তালে নাচছে রক্তধারা, বুকে স্পন্দন জাগছে।

পীচ-মঞ্জরী যদি তাকে ঠেলে ঠেলে না দিত, তাহলে সে ছোট গাছটায় উঠতেই পারত না। গাছে উঠে আসতেই তার মন শান্ত হয়ে এল। আসন্ন বিপদ উবিয়ে নিয়ে গেল তার দ্বিধা। চোখ মেলে সে তাকালে, হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রইল দেয়াল।

অনেক কষ্টে সে উঠে এল দেয়ালের উপর। হাতে শক্ত করে দেয়ালের উপরটা চেপে ধরেছে, পা ঝুলছে শূন্যে। ঘন ঘন পড়ছে নিঃশ্বাস, তার সবকিছু সে ভুলে গেছে। নিচে তাকাবারও তার সাহস নেই। হাত ফসকে যাবার ভয়। চোখ তার বোজা। হঠাৎ তার মন যেন ফাঁকা হয়ে গেল, হাতে আর জোর নেই, শিথিল হয়ে খসে পড়েছে, হাত খসে পড়লো···পড়লো...সে ঝুপ করে নেমে এল মাটিতে। মাটিতে ফুলের গাছ লাগিয়েছেন চিয়েন—তারই উপর এসে পড়ায় গায়ে চোট লাগলো না—শুধু যেন একটা ছোট্ট ধাক্কা সে খেয়েছে। পায়ে বা হাতে চোট লাগেনি। এবার চারিদিকে তাকালো। সব কামরাগুলোই আঁধার। শুধু উত্তরের কামরা থেকে আসছে একটা বাতির ঝলক, ঘেরাটোপ দেওয়া বাতি, তাই আলোও তার ম্লান, ক্ষীণ। উঠোনে সারি সারি ফুলগাছ, কোনটা বা বড়, কোনটা বা ছোট—ম্লান আলোয় তাদের দেখে যেন মনে হয় সারবন্দী হয়ে বসে আছে একদল মানুষ। কাওদীর বুক কেঁপে উঠলো। আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে ঠাহর করে করে সে চললো

এগিয়ে। মাঝে মাঝে কাঁটায় আটকে যেতে লাগলো তার কিমোনো। এবার এসে পৌঁছল উত্তরের ঘরের কাছে। ঘরের ভিতরে কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইছে। সে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে পড়লো জানালার কাছে। ঘরে একজন বৃদ্ধ আর যুবকের স্বর! বৃদ্ধ বুড়ো চিয়েনই হবেন, আর—আর যুবক বোধ হয় চিদের বাড়ির ছেলে। হাঁ, স্বর চেনা যাচ্ছে। একটু শুনেই তার মনে হোল, যুবকের কথায় পিপিং-এর টান নেই, সানতুং প্রদেশের টানে সে কথা কইছে। তার কৌতূহল বেড়ে গেল। সে ভাবলে, জানালায় ফুটো থাকলে সে ঘরের ভিতরটা একবার দেখে নেবে। উঠেও দাঁড়ালো। জানালার কাঠের কথা সে ভুলে গেছে। হঠাৎ কাঠে মাথাটা ঠুকে গেল, মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল—অস্ফুট আর্তনাদ! কিন্তু ঘরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভিয়ে দেওয়া হোল। কিছুক্ষণ পরে চিয়েনের স্বর শোনা গেল, কে?

ভীরু মেয়ে এক কোণে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে যেন বরফের স্তূপ, তেমনি নিঃসাড়।

চিয়েন এবার বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে শুধালেন, কে তুমি?

আমি, কাওদী আস্তে আস্তে বললে।

চিয়েন চমকে উঠলেন, তুমি কে গা?

কাওদী বললে, আমি আপনার পড়শীর মেয়ে। ঐ যে দেয়ালের ওপাশে আমাদের বাড়ি। আপনার কাছে আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

ভিতরে এস! চিয়েন আগে ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন।

কাওদী তখনো কপালে হাত বুলোচ্ছে। কপাল তার ফুলে উঠেছে গুলীর মতো। ঘরে সে ঢুকে পড়লো।

চিয়েনের পরণে ছোট কামিজ। তাঁর যেন মনে পড়ে গেল, অভ্যাগত এসেছে, তিনি জোব্বাটা খুঁজে নিয়ে পরে নিলেন। বোতাম দিতে গিয়ে এ-ঘরের বোতাম ও-ঘরে লাগিয়ে নিলেন। এবার তিনি বললেন, তুমি এলে কি করে?

কাওদীর পা এখনো শিশিরে ভেজা, পোষাক কাঁটায় ছেঁড়া, কপাল ফোলা, চুল তার এলোমেলো। সে নিজের দিকে তাকালে, তারপর চিয়েনের দিকে। হাসিই পাচ্ছে। সে হাসলো, মুচকি হাসি তার ঠোঁটে।

চিয়েন শান্তই আছেন, কিন্তু ভাবছেন, হঠাৎ ও এমনভাবে এল কেন। চোখ মিট্‌মিট্‌ করে তিনি তাকালেন কাওদীর দিকে।

চিয়েন কাকা, আমি দেয়াল টপ্‌কে এসেছি। সে এবার ছোট্ট একখানা টুলে বসে পড়লো।

দেয়াল টপ্‌কে এলে! কবি উঠোনের দিকে তাকালেন। কেন দেয়াল টপকালে বল তো?

আপনার সঙ্গে যে আমার জরুরী কথা আছে কাকা। কাওদীর মন ভরে উঠলো। এত ভদ্র চিয়েন কাকা! ভালবাসতে যে ইচ্ছে হয়। ওঁর কাছে কথা লুকিয়ে রাখা তো ঠিক নয়।

আপনার মেজ ছেলের কথাই বলতে এলাম।

কি হয়েছে তার?

কাকা, আপনি জানেন না?

না, ও তো আর ফিরে আসেনি।

সবাই তো বলছে—কাওদী মাথা হেঁট করে রইল।

কি বলছে সবাই?

ওরা বলছে তিনি নাকি এক ট্রাক-ভরতি জাপানী সৈন্য ধ্বংস করেছেন?

সত্যি? বৃদ্ধের দাঁত ঝকঝক করে উঠলো। তিনি প্রতীক্ষা করছেন।

সবাই তো তাই বলে।

আর সে—?

তিনিও—

বৃদ্ধের মাথাটা ঝুলে পড়লো, তাঁর চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। না, সে উদগ্র দৃষ্টি আর নেই। কাওদী উঠে দাঁড়ালো। তার মনে হোল বৃদ্ধ বুঝি কেঁদেই ফেলবেন। হঠাৎ তিনি মাথা তুললেন, চোখে তাঁর জল। কিন্তু কাঁদছেন না। তিনি নাকটা একটু টেনে নিলেন, তারপর টানার ভিতর থেকে বার করলেন মদের বোতল।…তিনি বলে উঠলেন, তুমি…তাঁর কথা স্পষ্ট নয়, কথাটা গলা দিয়ে আর বেরুল না। হাত কাঁপছে, তিনি একটা পেয়ালায় ঢেলে নিলেন আধ-পেয়ালা মদ, তারপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে এক চুমুক খেলেন। কামিজের আস্তিনে মুছে ফেললেন ঠোঁট; চোখ দুটি তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাওদীর দিকে তাকিয়ে এবার তিনি আস্তে আস্তে বললেন,

ও মারা গেছে। ভাল, ভাল। কাসির দমক উঠলো, দাঁতে তিনি ঠোঁট কামড়ালেন।

চিয়েন কাকা, আপনাকে চলে যেতে হবে।

চলে যাব—তার মানে?

আপনি চলে যান! সবাই তো এই কথাই বলছে। জাপানীরা যদি শোনে, তাহলে তো সর্বনাশ হবে, গোটা পরিবারটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ওঃ এই কথা! চিয়েন হেসে আবার পেয়ালাটা তুলে নিলেন, কিন্তু আমার তো যাবার জায়গা নেই। এই আমার বাড়ি, আমার কবরখানা। তলোয়ার গলার উপর নেমে আসছে বলেই কি পালিয়ে যাব—সে কি ভীরুতা নয়? বাছা, ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি বাড়ি যাও! কিন্তু যাবে কি করে?

কাওদীর মনে ব্যথা বাজছে। তার বাপ-মার বিশ্বাসঘাতকতার কথা সে তো বলতে পারছে না। আর চিয়েন কি মানুষ! তিনি পবিত্র, তিনি ন্যায়পরায়ণ, তাঁকে ভালবাসতে মন চায়। বহুদিনের দিবাস্বপ্ন আর অলীক কল্পনা তার মিলিয়ে গেছে। মেজ ছেলের উপর ভালবাসার কথাও মনে নেই, মনে নেই বীর-নায়কের লীলাভূমির কথা। সে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এমন এক বৃদ্ধের—যাঁর উপরে নির্যাতনের ষড়যন্ত্র চলছে। এঁকে বাঁচাতেই হবে তার, কিন্তু উপায় কি! সে হেসে বললে, না, আর দেয়ালের উপর উঠবো না চিয়েন কাকা।

নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না, আমি নিজের হাতে সদর ফটক খুলে দেব। তিনি টলছেন, কাওদী তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলে। তিনি একটু শান্ত হয়ে বললেন, হাঁ, ফটক আমিই খুলে দেব। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আপন মনে বলে উঠলেন—এতো পরম মৃত্যু—এতো পরম···আমার—ছেলের নাম করতেও তাঁর ভয়। দরজায় কবাটে হাত রেখে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আঙিনার ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে।

কাওদী কবিমনের এ আবেগ বুঝতে পারল না। এ যে জটিল আবেগ। শুধু তার বার বার মনে হোল, তার বাবার চেয়ে উনি কত আলাদা। শুধু চেহারা আর পোষাক-আষাকেই নন, তাঁদের মনেও যেন কোথায় রয়েছে প্রভেদ। শ্রীযুক্ত চিয়েন যেন পুরানো দিনের পুঁথি—তার হরফ স্পষ্ট, বাণী তাঁর সম্ভ্রম জাগায়। আর তার বাবা—

ফটকে এসে যেতেই কাওদী বললে, চিয়েন কাকা, আপনি দুঃখ করবেন না।

চিয়েন বিড়বিড় করে কি জবাব দিলেন।

কাওদী ছুটে বাড়ি ফিরে এল। দেয়াল টপকে সে গিয়েছিল প্রেমের তাগিদে। প্রেমের রহস্য তার অভিযানের রসদ জুগিয়েছিল। চিয়েনকে বাঁচানো তার একটা অঙ্গ মাত্র। কিন্তু এখন তো সে ফিরে এল পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে। মেজ ছেলের কথা আর তার মনে নেই, শুধু সে ভাবছে চিয়েনের কথা। পীচ-মঞ্জরীকে সমস্ত কথা বলার জন্যে সে উসখুস্ করছে। তাই সে ছুটে এসেছে। পীচ-মঞ্জরী ফটকের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল, কাওদী টোকা মারবার আগেই সে দরজা খুলে দিলে।

এদিকে চিয়েন সদর ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি লোকাস্ট গাছের সবুজ সতেজ পাতার দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ বিজলী চমকের মতো খেলে গেল এক ভাবনা। তিনি ছুটে গেলেন চি দের বাড়ি। রে স্যুয়ান রাতের মতো ফটকে তালা দিতে এসেছিল। তিনি তাকে গিয়ে বললেন, তোমার সময় হবে? গোটা কয়েক কথা বলব।

নিশ্চয়ই। আমি তালা বন্ধ করতে এসেছি। আপনি না এলে গিয়ে শুয়েই পড়তাম। এখন তো হাতে আর কোনো কাজ নেই। আমি ক'দিন ধরে বই পড়তেও পারছি না।

বেশ, আমার বাড়ি চল।

ভিতরে গিয়ে তাহলে বলে আসি।

চিয়েন গিয়ে সদর ফটকে দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ পরেই রে স্যুয়ান এল। চিয়েনদের বাড়ি তাদের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক পা, তবু ছুটে এসে সে হাঁপাতে লাগলো। সে জানে, এত রাতে চিয়েন যখন তাকে ডেকেছেন, তখন ব্যাপারটা বেশ জরুরীই হবে।

ঘরে এসে চিয়েন রে স্যুয়ানের হাত ধরে বললেন, রে স্যুয়ান! মেজ ছেলের কথা বলাই তাঁর ইচ্ছে। তিনি ছেলের আত্মোৎসর্গের কথাই শুধু বলতে চান না, তার সব কথাই বলতে চান। তার ছেলেবেলার কথা, যখন সে ইস্কুলে যেত তখনকার কথা। কি রকম সে ছিল, কি সে খেতে ভালবাসত —সব—সব কথা। কিন্তু কথা তো বেরুল না, তাই হাত ছেড়ে দিলেন।

ঠোঁট কাঁপছে, বুঝি আপন মনেই বলছেন, কেন বলতে চাই একথা। রে স্বয়ানের মুখের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললেন, তোমার সাহায্য আমি চাই!

রে স্বয়ান শুধু মাথা নাড়লো, কিছু বললো না। চিয়েন খুড়ো যা বলবেন, সে তাই করবে, এখুনি করবে। এতে তো তার দ্বিধা নেই, প্রশ্ন নেই।

চিয়েন এবার একটা টুল টেনে এনে বসে পড়লেন। চোখ বুজে আছেন। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুললেন। কিছুটা শান্ত হয়েছেন, মুখের মাংসপেশী আর কুঁচকে নেই। তিনি শান্ত স্বরেই বললেন, কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি। কয়েক রাত ধরেই চোখে ঘুম নেই। আমার কি মনে হয় জান, আর কিছু না করলেও, মানুষ যখন তাঁর দেশ হারায়, সে ঘুমুতে পারে না। ঘুমোনো তার বুঝি উচিতও নয়। হাঁ, আমিও পারিনি। শুধু মনে হয়েছে, যাই ফটকের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। একটু বা ঘুরে আসি। আজ রাতে তো তাই হোলো। ঘুম আসছে না দেখে সদর ফটকের দরজাটা একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখি, লোকাস্ট গাছের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ফটকের ভিতরে চলে এলাম। তুমি তো জানো, পড়শীদের সঙ্গে আমার বড়-একটা ভাব নেই। লোকটার মুখ দেখতে পেলাম না, কিন্তু চেহারাটা দেখে মনে হোল, ওর মতো কাউকে আমি চিনি না। তাই কৌতূহলও বেড়ে গেল। অন্যের ব্যাপারে আমি কখনো থাকি না, কিন্তু যার চোখে ঘুম নেই, তার মন তো সক্রিয় থাকবেই। ভাবলাম, দেখতে তো হবে লোকটা কে, কেন সে লোকাস্ট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে জানতেও হবে। চিয়েন আবার চোখ বুজলেন। পেয়ালায় কয়েক ফোঁটা তলানি পড়ে আছে, তাই-ই নিঃশেষ করে দিলেন। জিভ দিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছেন।

ভাবলাম, ছিঁচকে চোর কি ডাকাত নিশ্চয়ই নয়। আমার তো দামী জিনিস নেই যে, তারই লোভে আসবে। ভিখারীও নয়। খাওয়া-পরার ব্যাপারও নয়। অন্য কিছু আছে। এক চোখ দরজার ফাঁকে রইল। ঠিক যা বলেছি, লোকটা কোন বিপদেই পড়েছে। লোকাস্ট গাছের তলায় পায়চারি করছে তো করছেই। তাও আবার একেবারে ঢিমে তালে। কিছুক্ষণ পরে আবার থামলো, একবার উপর দিকেও তাকালো। আবার মাথা নিচু করে পায়চারি শুরু করলে। হঠাৎ ছুটে গিয়ে পশ্চিমের বাড়ির

বৃদ্ধ ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে কোমরের বেল্টটা খুলে ফেললে। আমি অপেক্ষায় রইলাম, এ এক অপেক্ষা বটে রে সুয়ান! লোকটার ফাঁস পরা অবধি চুপ করেই রইলাম। এবার ভাবলাম, যদি গিয়ে না পড়ি তো ও লোকটা ফাঁস গলায় দিয়ে মরবে। ঠিক, ঠিক! বুড়ো হাঁপাচ্ছেন, তাঁকে নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ দিলে রে সুয়ান। জোর ছুটলাম, চিয়েনের চোখ জ্বলে উঠলো, তারপর গিয়ে তো জড়িয়ে ধরলাম কোমর। সে দু ঘা কসিয়ে দিলে। বললাম, তোমার বন্ধু, শত্রু নই। সে আর ধস্তাধস্তি করলে না, বরং কাঁপতে লাগলো। যদি ধস্তাধস্তি করতো তাকে ছেড়েই দিতাম। ও যে যুবক, গায়েও ওর যথেষ্টই জোর। তাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে চল। আমার পিছু পিছু নিরীহ ভেড়ার মতো ও চলে এল।

ও এখানেই আছেন কি ?

চিয়েন মাথা নেড়ে সায় দিলেন ।

কি করে ?

ও কবি।

কবি ?

চিয়েন হাসলেন, ও সৈনিক কিন্তু ওর আত্মা তো কবির। ওর পদবী ওয়াঙ। সার্জেণ্ট ওয়াঙ। সেনাদল যখন পিছু হটে যায়, ও যেতে পারেনি। টাকাকড়িও নেই, শুধু আছে পরনে এক জীর্ণ পোষাক। চলে যাওয়াও সহজ নয়, যেখানে লুকোতে যাবে, সেখানেই অন্যকে বিপন্ন করবে। আবার শত্রুর হাতে ধরা পড়বার ভয়ও আছে। এমন অবস্থায় আত্মহত্যা করবে বলেই ঠিক করেছে। শত্রুর হাতে পড়ার চেয়ে মরণও ভাল। বলেছি তো, সে কবি। কবিতা সে লেখে না, লিখতে জানেও না। কিন্তু যাদের হৃদয় পবিত্র, আবেগে সমৃদ্ধ, তারাই তো কবি। তাই ওর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। ওরই জন্যে তোমাকে আসতে বলেছি। শহর থেকে ওর পালাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি তো কোনো উপায় দেখছি না। তাছাড়া—বৃদ্ধ চুপ করে গেলেন।

তাছাড়া কি চিয়েন খুড়ো—

বৃদ্ধর স্বর নেমে এল, শোনাই যায় না। তাছাড়া আমার কি ভয় হয় জানো, ও এখানে থাকলে ওকে আমি বিপদে ফেলব। আমার মেজ ছেলের

কথা তো তুমি জান—চিয়েন একটু থামলেন ; বুঝি বা দ্বিধাই হচ্ছে। আবার বলতে লাগলেন, আমার মেজ ছেলে হয়তো আর বেঁচে নেই, আর এর জন্যে আমারও হয়তো প্রাণ যাবে। শুনলাম, ও নাকি ট্রাক-ভরতি একদল জাপানী সেনাকে ধ্বংস করেছে। জাপানীরা তো অতি নীচ—ওরা কি আমাকে এজন্য ক্ষমা করবে ? আর ওরা যদি এখানে আসে, সার্জেণ্ট ওয়াঙকে কি আর খুঁজে পাবে না ?

আপনার ছেলে যে মারা গেছে, এ খবর কে দিলে ?

থাক, ওকথা থাক !

খুড়ো, আমার কাছে লুকোবেন না।

না, ওকথা আমি ভাবি না রে স্যুয়ান। একটা মুরগীর ছানা চেপে ধরবার আমার শক্তি নেই। শত্রুকে ধ্বংস করতে পারবনা, পারবনা জাতির লজ্জা ঘুচাতে। শুধু কি আমি পারি জান ? ভয় না পেয়ে বিপদের মুখোমুখি আমি দাঁড়াতে পারি। আমার ছেলে মরেছে, আমিও মরব। জাপানীরা তো শীগ্‌গীরই জানবে, সে আমার ছেলে। হাঁ, ওরা যদি আমাকে গ্রেফ্‌তার করে, আমি চেঁচিয়ে বলব, ওদের যে ধ্বংস করেছে সে আমারই ছেলে। থাক ! ওকথা থাক ! হাঁ, এখন একটা পথ বাতলাও তো, কি করে সার্জেণ্টকে শহর থেকে এখুনি সরিয়ে দেওয়া যায় ? সে সৈনিক, শত্রু কি করে ধ্বংস করতে হয় সে জানে ! আমরা তো এখানে তাকে মরতে দিতে পারি না।

রে স্যুয়ান ভাবতে লাগলো।

চিয়েন আবার আধ-পেয়ালা মদ ঢেলে নিয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগলেন। রে স্যুয়ান চুপ করে ভাবছে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, যাই, সেজ ভাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখি। আমি এখুনি ফিরছি।

বেশ। আমি তোমার জন্যে বসে থাকব।

এগারো

সেজ ভাই ভারি মুষড়ে গেছে, এরই মধ্যে সে শুয়ে পড়েছে। রে স্নুয়ান তাকে জাগিয়ে সার্জেন্ট ওয়াঙের কথা বললে। সেজ ভাইয়ের শস্যের দানার মতো কালো চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো, যেন বেড়ালের রাতের বেলায় জ্বলজ্বলে চোখ আর কি। এমন চোখের মাণ আরো কালো, আরো যেন বড়, গাল দু'খানাও উত্তেজনায় লাল। সে ব্যাপারটা শুনে বললে, ওকে তো বাঁচাতেই হবে আমাদের।

রে স্নুয়ান উত্তেজিত কম হয়নি, তবে শান্ত ভাবটা বজায় আছে। উত্তেজনার তোড়ে ভেসে সে যায় না, হঠাৎ কিচ্ছু করে বসাও তার ধাত নয়; অমন তাড়াতাড়ি করলে সে কাজে সুরাহা হয়না, সব ভেস্তে যায়। তাই সে ভেবে-চিন্তে বললে, দেখ, একটা উপায় আমি ঠাউরেছি, তোমার মত হবে কিনা জানি না।

সেজ ভাই তাড়াতাড়ি পায়জামা গলিয়ে নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। তার এমনি উত্তেজনা, এখুনি যেন সার্জেন্ট ওয়াঙকে পাঁজাকালো করে শহরের বাইরে রেখে আসবে। সে বললে, বড় ভাই, কি উপায় ঠাউরেছ?

অত তাড়া কেন? দাঁড়াও দু'জনে বসে খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো একবার ভেবে দেখি। এ তো ছেলেখেলা নয়।

সেজ ভাই আবার ধপ্ করে বসে পড়লো বিছানায়।

সেজ ভাই, আমি বলছি, তুমিও ওর সঙ্গে চলে যাও।

সেজ ভাই উঠে দাঁড়ালো: ঠিক, ঠিক! খুব ভাল হবে বড় ভাই!

কিন্তু এ পথে যেমন সুবিধে আছে, তেমনি অসুবিধেও ঢের। সুবিধে এই যে—সার্জেন্ট ওয়াঙ পল্টনের মানুষ, একবার শহরের বাইরে যেতে পারলেই তিনি নিজেই সব ঠিক করে নেবেন। তোমাকে আর ভাবতে হবেনা। আবার অসুবিধে ওর কথা বলার ধরন-ধারণে, ওর চলা-ফেরায়। ওকে দেখলেই পল্টনি মানুষ বলে মনে হবে। জাপানী সৈন্যরা শহরের ফটকে পাহারা দিচ্ছে, ওদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া তো সোজা কথা নয়। যদি উনি কোনো ফ্যাসাদে পড়েন, তুমিও ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে।

সেজ ভাই দাঁতে দাঁত চেপে বললে, সে ভয় আমার নেই।

জানি, জানি, রে স্নুয়ান হাসতে চায় কিন্তু হাসি ফুটলো না, সাহস থাকলেই হয় না সেজ ভাই, সাহসের সঙ্গে চাই দূরদৃষ্টি। তা না হলে কিছুই হয় না। আমাদের যদি মরতেই হয় নীল আকাশ আর উজ্জ্বল সূর্য-আঁকা ঝাণ্ডা বয়েই মরব। শুধু শুধু মরে লাভ কি! ন'কর্তা লিকে ডাকতে হবে।

উনিও লোক ভাল, কিন্তু কোনো উপায় কি ঠাওরাতে পারবেন?

আমি যা ভেবেছি তাই বলব। দেখি, উনি যদি রাজি হন। তবে আমি যা ভেবেছি, সেটাও একেবারে মন্দ নয়।

কি ভেবেছ তুমি?

ন'কর্তা যদি এরই মধ্যে একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ পেয়ে যান, তাহলে তোমরা শোকের পোষাক পরে সেই দলে ভিড়ে শহরের বাইরে চলে যাবে। ওদের তো আর কেউ তালাস করবে না।

বড় ভাই, তোমার মাথা আছে। আচ্ছা উপায় বাতলেছ বটে!

চুপ, চুপ, চেঁচিয়ে আবার সবাইকে জাগিয়ে দিও না। একবার শহরের বাইরে যেতে পারলে, তারপর সার্জেণ্টের কথা মতো চলবে। উনি সৈনিক, ঠিক সেনাবাহিনীর পাত্তা পেয়ে যাবেন।

বড় ভাই,—আমি রাজি।

রাজি তো? শেষে তো পস্তাবে না?

বড় ভাই—এর জন্যে পস্তাব কেন—শহর ছাড়ছি·· বিজিত দেশে দাস হয়ে থাকবনা বলেই ছাড়ছি।

রে স্নুয়ান কি ভেবে বললে—আমি কি বলতে চাই সেজ ভাই—শহর ছেড়ে যাওয়াই সব নয়। কত বিপদ-আপদ আসবে। পাঁচ মিনিট কামান-বন্দুকের গোলাগুলীর মধ্যে থাকলেই বীর হওয়া যায়। কিন্তু সত্যিকারের বীর খেতাব পাওয়া তো আলাদা জিনিস। যিনি তা হবেন, তাঁকে কত সইতে হবে আর কত দিন বসে সইতে হবে—তার কি হিসেব-নিকেশ আছে? তিনি তো দুঃখকে ডরাবেন না, একবারও মুষড়ে পড়বেন না—তাঁর আত্মা তো ছাইয়ের গাদা কখনো হবে না। সেজ ভাই, মনে রেখো একথা। একথা মনে রাখলে জাতীয় পতাকার নিচে বসে গোবর খেলেও মনে হবে, উদিত সূর্যের পতাকার নিচে বসে মাংস খাওয়ার চেয়ে তা ঢের ঢের ভালো। তুমি

দুঃখকে কাছে ঘেঁসতে দেবে না, মুষড়ে পড়বে না; তবে তো আমার মন নিশ্চিন্ত হবে। যাই, ন'কর্তার ওখান থেকে ঘুরে আসি।

রে স্বয়ান ন'কর্তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। বুড়ো এরই মধ্যে ঘুমিয়ে গেছেন। রে স্বয়ান তাঁকে জাগালে। ন'গিন্নিও উঠে পড়ে জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করলেন। চি-বাড়ির কোনো বৌয়ের প্রসব-বেদনাও যদি না উঠে থাকে, হয়তো কারো অসুখ-বিসুখই করেছে। ডাক্তার ডাকতে হবে। রে স্বয়ান বলবার পর তিনি বুঝলেন, ন'কর্তার সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ করতে এসেছে। তিনি তাই চায়ের জল গরম করতে বসলেন। অতিথিকে চা তো খাওয়াতে হবে। তাঁকে বাধা দিয়েও ফল হোল না। তবে একটা সুবিধেও আছে। ন'গিন্নী কামরার বাইরে গেলে কথাবার্তা খোলা-খুলিই হবে। ইসারা-ইঙ্গিতের আর দরকার হবে না। কাপড়-চোপড় সামলে নিয়ে ন'গিন্নী কাঠ আনতে বেরিয়ে গেলেন। আগুন জ্বালিয়ে চা চাপিয়ে দিতে হবে তো। তিনি বাইরে ব্যস্ত। রে স্বয়ান ন'কর্তাকে এর মধ্যে দু'কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। ন'কর্তা তখুনি রাজি হয়ে গেলেন।

বড়, তুমি পণ্ডিত মানুষ, তোমার ভাবনা-চিন্তার তো আমরা কূল-কিনারা করতে পারব না—বুড়ো আস্তে আস্তে বলে চললেন। শোন, সবচেয়ে জোর তল্লাসী হয় শহরের ফটকে আর রেল ইস্টিশনে। শহর থেকে বাইরে যাওয়া বড় চাট্টিখানি কথা নয়! তার উপর পল্টনের মানুষদের হাতে, পায়ে, শরীরে তো এমন সব চিহ্ন আছে, যা দেখে জাপানীরা অমনি চিনে ফেলবে। আর ধরা মানেই তো মুণ্ডুটা উড়ে গেল। এই তো ওরা এখন কফিনেও টোকা দিয়ে দেখতে সুরু করেছে। তবে যারা শোকের পোষাক পরে যায়, তাদের উপর তেমন হামলা হয় না। যাহোক, ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। দেখি কি করতে পারি। কাল তো একটা গোর-দেওয়ার ব্যাপার আছে; আমার উপরেই ভার পড়েছে। ওদের আমার সঙ্গে খুব ভোরেই দেখা করতে বোলো। দোকান থেকে দুটো জোব্বা তো দিতে হবে। যারা যারা শোক করবে, তাদের দলে থাকবে, কি যারা ঝাণ্ডা বইবে তাদের দলে যাবে··· সে আমি সময় মতো ঠিক করে নেব। যা ভালো বুঝবো তাই করবঁ।

ন' গিন্নীর চায়ের জল এখনো ফোটেনি। রে স্বয়ান আর দেরি না করে বিদায় নিলে। ন'গিন্নী খুব দুঃখ করে বললেন, কি করব বাছা, কাঠ সব

জলে ভিজে গেছে। এ ঐ বুড়ো মিন্সের কাজ! কত বলি, সংসারের কাজ একটু দেখ, একটু নজর দাও—তা উনি একেবারে হাত পা গুটিয়ে নুলো হয়ে বসে থাকেন। কাঠ ক'খানা যে বিষ্টির সময় ঘরে এনে রাখবে, তাও পারে না।

সেজ ভাই নিজের ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। কোনো কিছুতেই তার মন বসছেনা। শহরের পাঁচিলটা এক লাফে ডিঙিয়ে যাবারই তার ইচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো হয় না। তাই ভাবনা ফুট কাটছে—এলোমেলো ভাবনা।···হঠাৎ তারই মধ্যে এসে দেখা দিল মেদী। উত্তর সাগর পার্কে মেদীকে নিয়ে সে ভেসে চলেছে পদ্মবনে। ডিঙ্গি ভেসে চলেছে—মেদীর মুখে হাসি। তার ইচ্ছে, মেদীকে গিয়ে বলে, শহর ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে। সে হবে 'প্রতিরোধ সংগ্রামের বীর।' না, না, না। ওর এই বীরত্ব আর চরিত্রের দৃঢ়তার তো মেদীর কাছে কোনো দাম নেই। সে বুঝবে না, তারিফ করবে না।

দক্ষিণের ঘরে মা কাসছেন। মার জন্যে দুঃখ হয়। সে ভাবলে, এই ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলে, আর তো ফিরে আসতে পারব না। আর তো দেখাও বুঝি হবে না। মার কাছে গিয়ে দুটো মিষ্টিকথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সাহস তো নেই। মা আর ছেলের সম্বন্ধ যে এত গভীর একথা তো আগে বোঝেনি, বুঝতে পারেনি। বরং সে তো তাদের কলেজী বন্ধুদের বলেছে, আজকের তরুণরা যেন মুরগীর ছানা। জন্মালেই মাকে ছেড়ে নিজেদের খাবার নিজেরাই খুঁটে খায়। কিন্তু এখন তো সে আর মুরগীর ছানা নয়। সে বুঝতে পারছে, এক বন্ধন আছে—মা আর ছেলের মধ্যে,—সে বন্ধন ছেঁড়া যায় না। সে বন্ধন সব কিছুর চেয়ে মজবুত।

রে স্বয়ান নিঃশব্দে এসে ঢুকলো ঘরে। সেজ ভাই জিজ্ঞেস করলে, কি খবর বড় ভাই ?

সকালে তুমি আর সার্জেন্ট ওয়াঙ চলে যাবে।

পরদিনটা রে স্বয়ানের যেন কাটতেই চাইল না। দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন। ছায়া যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বেলা আর গড়ায় না। এবার বিকেল হয়ে এল। বাজলো চারটে। ন'গিন্নীর বাজখাঁই গলা শোনা গেল। সে ছুটে এল উঠোনো। ন'কর্তা তাকে আস্তে আস্তে বললেন, ওরা চলে গেছে।

বারো

রে ফেঙের মুখের চামড়া ঢাকের ছাউনির মতোই শক্ত হয়ে উঠলো, বড় ভাই, কেন তুমি সেজ ভাইকে যেতে দিলে ?

ওর মন 'যাই যাই' করছিল। থামাব কি করে বল তো ? তাছাড়া যাদের গায়ে জোর আছে, যারা নওজোয়ান, তারা তো যাবোই।

হাঁ, তুমি তো বললে, 'যাবোই' ! তোমার পক্ষে বলা তো সোজা। ও তো এবারই পাস দিয়ে বেরুত একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিলে বাড়ির খরচের দিক থেকেও কিছুটা সুরাহা হোত। যে মুরগী আজ বাদে কাল ডিম পাড়বে— তাকে কিনা যেতে দিলে ? তাছাড়া ওরা তো এবার আদম সুমারি শুরু করবে। আমাদের তো জানাতেই হবে, বাড়ির একজন বাইরে আছে। কি বলব বল তো ? বাইরে লড়ছে, বলব একথা ?

মেজ ভাই যদি সেজ ভাইয়ের বিপদের কথা ভেবে ওকে গালমন্দ করতো রে সুয়ান তাহলে চটতো না। কিন্তু সে-সব বালাই না রেখে সে যখন লাভ-লোকসানের খতিয়ান দিতে বসলে, রে সুয়ান না চটে পারল না। কিন্তু সে নিজের রাশ টেনে রাখতে জানে। আর রাখলোও তাই। বাড়ির কর্তা সে, তার একটু-আধটু ধৈর্য ধরতে হবে, সহিষ্ণু হতে হবে। শহর এখন শত্রুর দখলে, জাতির সংকট উপস্থিত, এই সময়ে কেন সে আবার বাড়িতে গোলমাল বাঁধাবে ? অনেক কষ্টে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললে, মেজ ভাই, ঠিকই বলেছ ! আমি অতোটা ভেবে দেখি নি।

মেজ আরো গলা চড়িয়ে বললে, কাউকে একথা জানানো হবে না। একবার খবর ছড়িয়ে পড়লেই বাড়ি সুদ্ধ সবাই মরব। আমি তোমাকে আগেই বলি নি, আদর দিয়ে তুমি সেজ ছোকরার মাথাটা খাচ্ছ, কিন্তু আমার কথায় কানও দাওনি। এবার হোল তো ! এর চেয়ে আলাদা থাকলেই ভাল ছিল। তখন সেজ ভাইয়ের বিপদ হলে কিছু আসতো যেতোনা।

রে সুয়ান আর রাগ চেপে রাখতে পারলে না। তার মুখের রেখা কঠিন হয়ে এল, জলে উঠলো দুটি চোখ। গলার স্বর তার নিচু, কিন্তু কথা যেন

পাহাড়ি নদীর নুড়ির মতো খসে খসে পড়তে লাগলো। আস্তে আস্তে সে বললে, মেজ, এখুনি তুমি বেরিয়ে যাও!

রে ফেঙ ভাবতেও পারেনি বড় এমনিধারা চটে যাবে। তার মুখও লাল হয়ে উঠলো। যেন পাকা চেরী ফল আর কি। গায়ের ঝাল ঝেড়ে এক কাণ্ড বাধাবে সে, এমনি তার মুখের চেহারা। কিন্তু বড় ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে তবু বললে, বেশ, আমি চলেই যাচ্ছি।

বড় ভাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, দাঁড়াও, আর একটা কথা শুনে যাও। তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বাড়ীর কর্তৃত্ব আমার হাতে বলে এতদিন সব ব্যবহারই আমি সয়ে গেছি। ঝগড়া করতে চাই নি। কিন্তু ভুলই হয়েছে। তুমি ভেবেছ, তোমার কথা হক্ কথা বলেই আমি চুপ করে গেছি। আর তারই জন্যে তোমার একটা বদ অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। তোমার কাছে দাঁও মারাটাই বড় কথা, কেউ আত্মোৎসর্গ করতে চাইলে সে তো মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। তোমার এ ভুল অনেক দিন আগেই শুধরে দেওয়া উচিত ছিল। দিইনি বলে দুঃখই হচ্ছে। আজ সত্যি কথাই বলব। সেজ ভাই যে চলে গেছে ভালই হয়েছে। সে তো ঠিকই করেছে। যদি তুমি মানুষ হও, তুমিও যাবে। পান-ভোজন আর বিলাসিতার থেকে আসল যা কাজ তাই-ই করবে। আমি যেতে পারছি না, তিন পুরুষের ভার আমার উপর। কিন্তু এর জন্যে তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিনা, ওজুহাতও দেখাচ্ছিনা। তোমাকে অবশ্য জোর করে পাঠাবার আমার অধিকার নেই। কথাটা একবার ভেবে দেখ—বড়র ব্যাপার নিয়ে না হয় একটু ভাবলেই মেজ ভাই!

তার রাগ পড়ে এসেছে, মুখের ভাব এখন স্বাভাবিক। গালমন্দ দিয়েছি বলে আমাকে মাপ কর মেজ ভাই। কিন্তু সত্যি কথা তো সব সময়ে শুনতে ভাল লাগেনা। যাও—ভাই যাও! ওরা যে পথে গেছে, তুমিও সেই পথে যাও!

মধ্য শিক্ষা ইস্কুলগুলির হেডমাস্টারেরা শুনলেন, সাংহাইয়ে জোর লড়াই চলছে, আর জাপানীরাও পিপিং-এর শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব কাউকে দেয় নি। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুল খোলবার ব্যবস্থা করলেন। রে স্যুয়ান ইস্কুলে

যাবার চিঠি পেল। শিক্ষকরা সবাই আসেন নি, এর মধ্যে কেউ কেউ শহর ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে তাঁদের কথা নিয়ে আলাপ শুরু করলেন, নিজেরা যেতে পারেন নি বলে লজ্জাই হোলো। সবাই না পারার কারণ দেখালেন, কিন্তু আলাপ করতে করতে কারণগুলো তুচ্ছই হয়ে গেল, লজ্জাই বড় হয়ে উঠলো।

এবার এলেন হেডমাস্টার। পঞ্চাশের উপরে তাঁর বয়েস, যেমন বিচক্ষণ, তেমনি সহৃদয়। ইস্কুলের চাকরীতে আছেন বহুদিন। সবাই বসে পড়লেন শিক্ষকরা, বৈঠক বসলো। হেডমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক মিনিট কেটে গেল, মুখে তাঁর কথা যোগাচ্ছে না। রে স্থয়ান মাথা নিচু করে এক কোণে বসে ছিল। সে নিচু গলায় বললে, স্যার, আপনি বস্থন! হেডমাস্টার বসে পড়লেন।

এবার সবচেয়ে বয়সে তরুণ শিক্ষকটি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, মাস্টারমশাই, যদি এখানে আমরা কাজ করি, আমরা কি বিশ্বাসঘাতক হব না?

এ যেন সকলের মনের কথা। কারো সাহস হয়নি জিজ্ঞেস করতে।

সবাই তাকিয়ে আছে হেডমাস্টার মহাশয়ের দিকে। তিনি আবার উঠে পড়লেন। কয়েকবার গলা খেঁকারি দিয়ে সাফ করে নিলেন। এবার বললেন, শিক্ষক মহাশয়গণ, যা দেখছি, তাতে যুদ্ধ যে তাড়াতাড়ি শেষ হবে তা মনে হয় না। পিপিঙ ছেড়ে যাওয়াই আমাদের উচিত ছিল, কিন্তু নানা কারণে আমরা সবাই যেতে পারি নি। তাছাড়া মধ্য শিক্ষা ইস্কুল বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে খোদ শিক্ষাদপ্তরের কাছ থেকে হুকুম আসে কিন্তু আমাদের হুকুম করেন পিপিঙ-এর শিক্ষা বিভাগের বড় কর্তা। এখন কর্তা কেউ নেই, তাই আমাদের নিজেদেরই একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে পিপিঙ থেকে সরিয়ে নেওয়া চলে, কারণ সেখানকার ছাত্রেরা যুবক। দূরে যেতে তাদের অস্থবিধে হবে না। তারা বহু বহু দূর থেকেই এখানে পড়তে আসে। কিন্তু আমাদের ছাত্রদল এখানকারই অধিবাসীদের ছেলেমেয়ে। এদের আমরা কোথায় নিয়ে যাব?

আমি জানি যদি এখানে থাকি, বিপদ আসবেই, তবু আমাদের ইস্কুল খোলা দরকার। ছেলেদের আর বাড়িতে বসে থাকা উচিত হবে না।

জাপানীরা যখন তাদের পরিকল্পনা-মতো কাজ শুরু করবে, তখন ছাত্রদের বাঁচাতে হবে আমাদের। বন্ধুগণ, আপনারা যাঁরা চলে যেতে সক্ষম, তারা চলে যান। আমি আপনাদের বাধা দিতে চাইনা। যাঁরা যেতে পারবেন না, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ—ধর্ষিতা বিধবারা যেমন তাদের সন্তানের মায়ায় বেঁচে থাকে, আপনারাও জাপশাসনের লোহার খুরের তলায় তেমনি করে বেঁচে থাকুন! আমরা জানি, বিশ্বাসঘাতক আমরা নই।

তিনি আবার গলা সাফ করে বলতে লাগলেন, আরো বহু কথা বলবার ছিল, কিন্তু বলবার ক্ষমতা নেই। তবে একটা কথা, আপনারা যদি আমার সঙ্গে এক মত হন, তাহলে আগামী সোমবারই আমরা ইস্কুল খুলব। তিনি এবার আস্তে আস্তে বসে পড়লেন। তাঁর চোখে জল।

দীর্ঘ ছেদ। এবার কে যেন চাপা গলায় বললে, আমি ইস্কুল খোলার পক্ষে।

আর কেউ কিছু বলবেন? হেডমাস্টার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার বসে পড়লেন। কেউ কিছু বললে না। তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, বেশ, তাহলে ঐ কথাই রইল। আমরা ইস্কুল খুলছি, তারপর দেখা যাবে কি হয়। জানি, বিরাট পরিবর্তন আসবে—সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের কাজ আমরা করে যাব।

রে স্থয়ান ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এল। জ্বরের ঘোর যেন লেগেছে তার। শান্ত হতে সে চায়, উপায় খুঁজতেও চায়, কিন্তু সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে। কোথা থেকে শুরু করবে জানে না, সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। আপন মনে কথা কইছে দেখে তার নিজেরই খারাপ লাগলো। যারা আপন মনে বিড়বিড় করে, তাদের সে করুণাই করে—তাদের মাথায় ছিট্ আছে—এখন তো সেও সেই দলে ভিড়ে গেল। তার ইচ্ছে, উত্তর সাগর কি মধ্য-পার্কে গিয়ে দুদণ্ড বসে মাথা ঠাণ্ডা করে। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে পড়লো। যারা শান্তি উপভোগ করতে চায়, তাদের জন্য পার্ক। না, তোমার সে দাবী নেই। বাড়ির পথেই ফিরে চললো সে। আপন মনে বললে, বাঃ মার-খাওয়া কুকুর লেজ গুটিয়ে ছুটছে নিজের খোঁয়াড়ের দিকে! উপায় কি!

খুদে খাটালের মুখে তার পথ আগলে দাঁড়ালো এক পুলিস। রে স্থয়ান ভদ্রভাবেই বললে, আমি এখানে থাকি।

পুলিসটিও ভদ্র। বললে, একটু দাঁড়ান, গ্রেফতার চলছে কিনা!

রে স্নয়ান ভয় পেল, গ্রেফতার চলছে? কাকে গ্রেফতার করছে? কি অভিযোগে?

পুলিসটি মাপ চাইবার ভঙ্গীতে হাসলো, জানিনা। শুধু জানি গলির মুখে পাহারা দিতে হবে, কাউকে ঢুকতে দেওয়া নিষেধ।

রে স্নয়ান জিজ্ঞেস করলে, জাপানী পুলিস এসেছে নাকি?

পুলিসটি মাথা নাড়লো, তারপর কাছে-পিঠে কাউকে না দেখতে পেয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, এ মাসে মাইনের তো এখনো দেখা নেই, তবু নিজেদের দেশের মানুষের গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা নিয়ে আসতে হচ্ছে, ওদের সঙ্গে মিলে খানা-তল্লাসি চালাচ্ছি, জোর-জুলুম করছি। সত্যি কি বোকা আমরা! আমাদের পিপিঙ-এর কি দশা হবে কে জানে! যান, আপনি একটু কোথাও থেকে ঘুরে আস্থন। এখানে দাঁড়াবেন না!

রে স্নয়ান চলে এল। যেতে যেতে তার মনে ভাবনা ফুট কাটছে। কাকে ওরা গ্রেফতার করছে? প্রথমে যাঁর কথা মনে এল, তিনি কবি চিয়েন। আপন মনে বললে, যদি তিনি হন—তার পা যেন আর লাসটাকে বইতে পারছেনা, কাঁপছে। এবার এল সেজ ভাইয়ের ভাবনা। ধরা পড়লো নাকি? গা ঘামে জবজবে হয়ে উঠলো।

জাপানী পুলিস গ্রেফতার করতে এসেছে কবি চিয়েনকে।

খুদে খাটালের দুই মুখে পুলিস মোতায়েন। কাউকে তারা ঢুকতে বা বেরুতে দিচ্ছে না।

প্রভাতপদ্ম কুয়ান ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর নিজের ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু জাপানীরা নাছোড়। তারা পেড়াপীড়ি করেছে, কুয়ানকে থাকতে হবে দলের সঙ্গে সঙ্গে। এ যেন মনে হচ্ছে, আর কাউকে না পেলে, ওরা তাঁকেই গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। এমন যে হবে, একথা তিনি ভাবেন নি। এখন আর উপায় কি, দলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও যেতে হোল। বুক দুরু দুরু করছে ভয়ে, অনেক কবে নিজেকে শান্ত রেখেছেন। তাঁর চোখ দেখলে যেন মনে হয়, শিকারী কুকুর যেন ঘিরে ফেলেছে শেয়ালকে। চারদিকে জুল্ জুল্ করে তাকাচ্ছেন, কি জানি পড়শীরা আবার কখন দেখে ফেলে! কপাল অবধি নামিয়ে দিয়েছেন টুপী, যাতে পড়শীরা

দেখলেও চিনতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা। খুদে খাটালের সব বাড়ির সদর ফটক বন্ধ। জ্যান্ত কাক-পাখীরও হদিশ নেই, জ্যান্ত জীবের মধ্যে আছে শুধু লোকাস্ট গাছের সবজে শুঁয়োপোকাগুলি! কুয়ান এতে খুশিই হলেন। ভাবলেন সবাই ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে। কিন্তু তা নয়। মেরাপ-বাঁধিয়ে লিউ আর কেউ কেউ যে সদর দরজার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে ছিল, তা তাঁর নজরে পড়লেনা। তারা কিন্তু প্রভাতপদ্ম কুয়ানকে চিনে ফেললে।

সার্জেণ্ট পাইর মুখখানা ফ্যাকাশে মেরে গেছে। সে প্রভাতপদ্মের পিছনে পিছনে চলেছে। দেখে মনে হয় যেন, আত্মা তার হারিয়ে ফেলেছে। খুদে খাটালের সবাই তার বন্ধু। আগে গ্রেফ্তারি পরোয়ানা নিয়ে কোথাও যেতে সে নারাজই ছিল, তা এখন তো আরো। বন্ধুদের জাপানীদের হাতে সঁপে দিতে কি মন চায়? চিয়েনকে সে ভাল করে চেনেই না, চিয়েন ফটকের বাইরে খুব কমই আসতেন, তাছাড়া পুলিসেব সঙ্গে তাঁর কোনো-কাজ-কারবারও ছিলনা। কিন্তু সার্জেণ্ট পাই জানে, চিয়েন হচ্ছেন শতকরা একশো দুই ভাগ ভাল মানুষ। যদি সবাই তাঁর মতো হোতো, তাহলে পুলিসদের আর ভাবনা ছিল কি! তারা ধর্মকর্মের চিন্তায় দিনভোর বিভোর হয়ে থাকতো ; নির্বাণের পথ খুঁজতো। যখন ওরা দলবল নিয়ে চিয়েনদের সদর ফটকে এসে পৌছলো, সার্জেণ্ট পাই বুঝতে পারলো, চিয়েনকেই গ্রেফতার করা হবে। তার ইচ্ছে হোল, প্রভাতপদ্মকে চিবিয়ে খায়, কিন্তু চার-চারটে জাপানী সিপাই লোহার থামের মতো যে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। রাগ চেপে গেল সার্জেণ্ট। পিপিঙ-এর পতনের সময় থেকেই সে জানে, এবার তাকে শত্রুর হাতেব থাবা আর দাঁত বনে যেতে হবে। সেই ধারালো থাবা আর দাঁতে নিজেদের দেশের মানুষের উপর পড়বে আঁচড় কামড়। এখুনি উর্দিটা ছুঁড়ে ফেলে না দিলে, এব থেকে রেহাই নেই। কিন্তু উর্দি ছুঁড়ে ফেলা তো সহজ নয়। সে তা পারবে না। পরিবারের ভাত-কাপড় জোটাবার জন্যেই না সে এ কাজ নিয়েছে। এ কাজে মনুষ্যত্বেব বালাই নেই, তবু নিয়েছে।

কিছুক্ষণ ধরে ওরা দরজা ধাক্কালে, সাড়াশব্দ নেই। একটা লোহার থাম-মার্কা জাপানী সিপাই এবার দরজায় লাথি মারতে গেল। দরজা খুলে গেল আস্তে আস্তে। চিয়েনই দরজা খুলে দিয়েছেন। এমনভাবে তাকিয়ে

আছেন, যেন সবে ঘুম থেকে উঠে এসেছেন, বাঁ হাত দিয়ে জামার বোতাম আঁটছেন। প্রথমে প্রভাতপদ্ম কুয়ানের দিকেই তাঁর চোখ পড়লো। প্রভাতপদ্ম চোখ নামিয়ে নিলেন। তার পরে দেখলেন সার্জেণ্ট পাইকে। সার্জেণ্ট ফেরালো মুখ। এবার দেখলেন, কুয়ান জাপ-সিপাইদের দিকে তাকিয়ে কি যেন ইসারা করলেন। ভাবনা হোল, হয় সার্জেণ্ট ওয়াঙ-রা ধরা পড়েছে, নয়তো তাঁর মেজ ছেলের মরার ব্যাপারটার স্থলুক-সন্ধান নিতে এসেছে।

প্রভাতপদ্মকে সামনে দেখে বুঝলেন, শেষের ব্যাপারেই এসেছে পুলিস। কাওদীর হুঁশিয়ারী মনে পড়লো। তিনি সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, কি চাও?

কথাগুলো যেন ডগডগে লাল আগুনে পোড়ানো লোহা। কুয়ান এক পা পিছু হটে গিয়ে মুখ নিচু করলেন। যেন ফুলকি এসে পড়বে গায়ে। সার্জেণ্ট পাইও পেছু হটে গেল। ত্নটো সিপাই অমনি ছুটে এল, যেন রুখে এসেছে আর কি! চিয়েন দরজার কবাট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আবার বললেন, তোমরা কি চাও? একটা সিপাই চিয়েনের হাতের কব্জীর উপর ঘা মারলে, তারপর মুখে ঘুষি। কবির মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। সিপাহীটা ঢুকে পড়লো ফটকে। কবি তার কলার চেপে ধরে বললেন, এই কি করছ? সিপাহী হেঁচকা টান মারলে, কিন্তু চিয়েন মুঠো ছাড়লেন না। যেন ডুবন্ত মানুষ আঁকড়ে ধরে আছে শেষ অবলম্বনটুকু, মুঠো আরো শক্ত হয়ে এল। সার্জেণ্ট পাই ভয় পেল। এতে হয়তো তাঁর ভোগান্তি বেশি হবে, তাই সে চট করে এগিয়ে এল। সে এসেই চিয়েনের হাত ধরে চাপ দিলে, মুঠো আল্‌গা হয়ে এল। এবার সে তাঁদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ত্নজনকে দিলে ছাড়িয়ে। সিপাহী লাথি আর ঘুষি এলোপাথাড়ি চালালে সার্জেণ্টের উপর। সার্জেণ্ট পাই সব সয়ে চিয়েনকে ঠেলে দিল। সে ওঁর সঙ্গে ধস্তাধস্তির ভান করছে। চিয়েন এবার নিরস্ত, শ্রান্ত।

একজন সিপাই রইল পাহারায়, বাকি দল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো আঙিনায়। সার্জেণ্ট পাই চিয়েনকে টেনে কাছে নিয়ে এসে কানেকানে বললে, আপনি চটবেন না মশাই। যা হবেই তার বিরুদ্ধে কি হান-এর সন্তানরা লড়াই করেন?

প্রভাতপদ্মের আকাঙ্ক্ষা আকাশ ছোঁয়, কিন্তু সাহসে তিনি একেবারে মেকুরটি। না আছে ভিতরে ঢোকার সাহস, না আছে বাইরে দাঁড়াবার। তাই ফটকের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর চাঁদির সিগারেট-কেসটা বার করলেন। বার করেই সিপাহীর কথা মনে পড়লো, তিনি তার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন মিতালি পাতাবার চেষ্টায়। সিপাই তাঁর দিকে তাকালে, তার সিগারেট কেসের দিকে তাকালে। তারপর ছোঁ মেরে কেসটা নিয়ে বন্ধ করে নিজের পকেটে রাখলো। কুয়ান হাসলেন, দেঁতো হাসি। জাপানী ও চীনা ভাষা মিশিয়ে বললেন, তা বেশ, তা বেশ!

চিয়েনের বড় ছেলে ভুগছে আমাশায়। রোগা মানুষ, একটু বা বেশিই ভীরু। কয়েক দিনের রোগে তাকে কাহিল করে ফেলেছে। মানুষ বলেই মনে হয় না। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখখানা হলদে মেরে গেছে। দুহাত দিয়ে পায়জামা তুলে সে আঙ্গিনা পেরিয়ে তার ঘরে যাচ্ছিল; যাচ্ছে আর কঁকিয়ে উঠছে। তার বাপকে সার্জেণ্ট টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে, আর তিনটে শত্রু সিপাই এসে আঙিনায় ঢুকেছে দেখে, সে তার অসুখের কথা ভুলে গেল; টলতে টলতে ছুটলো বাপের দিকে। সার্জেণ্ট পাই চট করে ভেবে নিলে। শত্রু যদি চিয়েনকে গ্রেফতার করবার কথা ভেবে থাকে, তাই-ই করুক; আবার আর-একজন বাড়ে কেন? জাপানীদের বাধা দিতে গেলে চিয়েনের ছেলেও গ্রেফতার হবে। সার্জেণ্ট পাই দাঁতে দাঁত ঘস্‌তে ঘস্‌তে ঘুষি তুললো, তখনো এক হাতে ধরে আছে চিয়েনকে। চিয়েনের ছেলে কাছে এগিয়ে আসতেই সে তার মুখে এক ঘুষি কসিয়ে দিলে। লুটিয়ে পড়লো ছোট চিয়েন। পাই বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, ছোকরা একেবারে আপিঙের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। সে এবার চিয়েনের ছেলের দিকে তাকিয়ে মুখে বুড়ো আঙ্গুল পুরে ঘন ঘন ফুঁ দিতে লাগলো। যেন নলে টানছে চণ্ডু। সে জানে যারা চণ্ডু খায়, জাপানীরা তাদের খুব পেয়ার করে। তারা এমনি করে গোটা জাতটাকে পঙ্গু করে ফেলতে চায়।

উত্তরের ঘরে শত্রু সৈন্যরা হানা দিলে এবার। সার্জেণ্ট পাই এবার চিয়েনকে সব কথা বললে, মশাই, আপনি ছেলে-ছোকরা নন। আপনি নিজে যদি লড়তে চান—মৃত্যু পর্যন্ত লড়ুন না! কিন্তু আপনার ছেলের গ্রেফতার হওয়াটা ঠিক হবে না।

চিয়েন মাথা নাড়লেন। ছেলে মাটিতে পড়ে আছে, নড়ছে-চড়ছে না; মূর্চ্ছা গেছে। চিয়েন মাথা নিচু করে একবার দেখে নিলেন। মনে শান্তি পাচ্ছেন না, তবু সান্ত্বনা তো আছে। তার মেজ ছেলের মৃত্যুর সংবাদ তাহলে সত্যি। তাই বড় ছেলে আর তাঁর নিজের এই দুঃখ তো অবশ্যম্ভাবী, এতে অদ্ভুত কিছু নেই। শান্তির সময়ে তিনি ফুল, লতাপাতা, মদ, চা আর কবিতা নিয়ে মেতে ছিলেন। আজ দেশের পরাজয়ের দিনে তো এল আত্মাহুতি আর মৃত্যুর পালা। যা এসেছে, তাতেই তিনি খুশি। বরণ করে নিতে হবে। উৎপীড়ন আর মৃত্যুর ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। শুধু কামনা, তাঁর বড় ছেলে যেন গ্রেফতার না হয়। স্ত্রী আর ছেলের বৌয়ের কে দেখাশুনো করবে? স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে তিনি চাননা। তিনি তো বুঝবেন না, কি হোল। জীবনভোর তাঁরই সাথী হয়ে দারিদ্র্য সহ্য করেছেন, কখনো নালিশ করেননি। এখন তিনি মরতে চলেছেন, স্ত্রী হয়তো বুঝতে পারবেন তাঁর এই মৃত্যুর মূল্য। প্রভাতপদ্মের উপর তাঁর কোনো ঘৃণা নেই। তিনি মনে করেন, দুনিয়ার মানুষরা যেন পঞ্চবিংশ সহস্র-অর্হৎ-এর (শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ঋষি) মতো—তাঁদের সবারই আলাদা আলাদা স্থান আছে। তিনি মরবেন আর প্রভাতপদ্ম জাতিকে বিক্রি করে দেবে, টাকার সন্ধানে ছুটবে—এই তো নিয়তি। অতীতে যখনি তিনি বিচলিত হতেন, একটা কবিতা লিখে ফেলতেন। কিন্তু এখন আর সে অনুভূতি নেই। তাঁর মেজ ছেলের আত্মাহুতি, সার্জেণ্ট ওয়াঙ-এর আগমন, তাঁর ভাগ্য—এই তো যেন এক-একটি জীবন্ত কবিতা। কবিতা নয়? সার্জেণ্ট ওয়াঙ তো আত্মসমর্পণ করবার আগে আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিল। হাঁ, কবিতা, খাঁটি কবিতা। গদ্যে লেখা হলেও কবিতা। আর তো শব্দ আর ছন্দের মিলে তাঁকে কবিতা খুঁজতে হবে না।

চিয়েন-গৃহিনীকে সিপাইরা ঠেলে ঘর থেকে বার করে দিলে। তিনি পড়েই যাচ্ছিলেন। চিয়েন তাঁকে কিছু বলতে চান না, তবু স্ত্রী ছুটে এলেন তাঁর কাছে। বললেন, ওগো, দেখ, দেখ, ওরা আমাদের জিনিসপত্তর লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে! যাও গো, একটা কিছু বিহিত কর!

চিয়েন হাসলেন। সার্জেণ্ট পাই তাঁকে জামা টেনে বারণ করলে, হাসবেন না, মশাই হাসবেন না! এবার স্ত্রী চিয়েনের মুখে রক্ত দেখতে

গেলেন। তিনি জামার হাতা দিয়ে রক্ত মুছে দিতে দিতে বললেন, আহা, কি হয়েছিল গো তোমার?

মুখের উপর লাগতেই চিয়েন-এর যন্ত্রণা বেড়ে গেল, গা দিয়ে ঘাম ছুটলো। তিনি স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরে চোখ বুজলেন। তাঁর ভয়, হয় তো পড়েই যাবেন। এবার চোখ খুলে বললেন, শোন, তোমাকে বলিনি—আমাদের মেজ ছেলে মারা গেছে—ওরা এবার এসেছে আমাকে গ্রেফতার করতে। ভয় পেও না গিন্নি, ভয় পেও না!

চিয়েন-গৃহিনীর মনে হোল, তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখছেন। যা দেখছেন, যা শুনছেন, কিছুই যেন খাপ খাচ্ছেনা। মার্কো পোলো সাঁকোর কাণ্ডের পর হেন দিন যায় নি, তিনি তার খোকার জন্য ভাবেন নি। তার স্বামী আর বড় ছেলে বার বার বলেছেন, সে শীগ্‌গীরই ফিরে আসবে। এই তো ক'দিন আগে রাতে এল এক অতিথি। একেবারে গেঁয়ো লোক, আবার সিপাই বলেও মনে হয়। জিজ্ঞেস করতে তাঁর সাহসে কুলোয় নি, স্বামী আর ছেলেও তাঁকে তার কথা বলেননি। কিন্তু কি অদ্ভুত, লোকটা হঠাৎ রাতে এসে দেখা দিল, আবার রাতেই চলে গেল। স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু বলেন নি, শুধু একটু হেসেছেন। আবার আর এক রাতে তাঁর যেন মনে হোলো, কে আঙিনায় ঘুর্‌ঘুর্‌ করে বেড়াচ্ছে। তার পরেই মেয়েলি, গলাও শুনলেন। পরদিন আবার শুধালেন, সেদিনও স্বামী চুপচাপ। আজ তো স্বামীর মুখ দিয়ে ঝরছে রক্ত, জাপানী সিপাইরা কামরায় তছনছ করছে, জিনিসপত্র লুটেপুটে নিচ্ছে। তিনি কাঁদতে গেলেন, কিন্তু কান্নার ধারা যে রুদ্ধ হয়ে গেল বিস্ময়ে। কেমন যেন এলোমেলো লাগছে সব।

স্বামীর হাত ধরে আছেন, তাঁকে খুঁটিয়ে খুটিয়ে সব কিছু জিজ্ঞেস করতে চান। কিন্তু মুখ থেকে একটা কথা খসাবার আগেই, সিপাইরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সার্জেন্টের দিকে একটা চামড়ার দড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিল। সার্জেণ্ট পাই, দড়িটা তুলে নিয়ে ফিসফিস করে বললে, আসুন, একটু আলগা করে বেঁধে দিই, তা না হলে আবার মারধর করবে। চিয়েনগৃহিনী চেঁচিয়ে উঠলেন, কি করছ গো? আমার বুড়ো মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ওর বাঁধন খুলে দাও। তিনি শক্ত করে স্বামীর হাত চেপে ধরলেন।

সার্জেণ্ট পাইয়ের ভয়, সিপাইরা হয়তো চিয়েন-গিন্নিকে ধরেই পিটবে।

এবার বড় ছেলে এগিয়ে এসে ডাকলে, 'মা'। চিয়েন ফিসফিসিয়ে বললেন, বড় রইল, ওকে দেখো! আমি শীগ্‌গীরই ফিরে আসব। ভয় নেই। তিনি হাত ছাড়িয়ে নিলেন। তাঁর চোখে ক্রোধ আর অশ্রু মিশে গেছে, তিনি নির্যাতিত, তবু তাঁর আছে সাহস, গর্ব। মাথা উঁচু করে তিনি চললেন। কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে তাকালেন। ফুলের দিকে তাকিয়ে আছেন। নিজের হাতে চাষ করেছেন। স্বর্ণবর্ণী স্তবক মেলে তারা হেলছে-দুলছে হাওয়ায়।

রে স্থ্য়ানের সঙ্গে সদর সড়কে দেখা হয়ে গেল। সিপাইরা ট্রাক আনে নি—অথচ তাই-ই রীতি। তারা চিয়েনকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো। হয়তো মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে এ ব্যবস্থা। চিয়েনের মাথায় টুপী নেই, বাঁ পায়ের জুতো চটির মতো পিছলে পিছলে যাচ্ছে; ডান পা খালি। চোখ তার সামনের দিকে, ঠোঁটে হাসি। পিছমোড়া বাঁধন হাতে। রে স্থ্য়ানের একটিবার ডাকার ইচ্ছে হোল, কিন্তু চিয়েন তাকে দেখতে পেলেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রে স্থ্য়ান, যেন মাটিতে শিকড় গেড়ে গেছে। দেখছে, দূরে দূরে চলে যাচ্ছে, ছায়ার মতো সরে সরে যাচ্ছে সিপায়ের দল। উজ্জ্বল দিন, উজ্জ্বল আলো, চিয়েনের মাথার উপর সাদা মেঘ ভেসে চলেছে, তারই সাদা আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে।

রে স্থ্য়ান এবার খুদে খাটালে ঢুকে পড়লো। সব ফটক বন্ধ, শুধু ন'কর্তারটা আধ খোলা। চিয়েনদের বাড়ি যাবার তার ইচ্ছে হোল। গিয়ে দেখা করবে, সান্ত্বনা দেবে;—দেবার চেষ্টা অন্ততঃ করবে। চিয়েনদের বাড়ির ফটকে এসে পৌছতে না পৌছতেই ন'কর্তা সদর দরজা থেকে ডাকলেন।

রে স্থ্য়ানকে তাড়াতাড়ি ফটকের ভিতরে টেনে নিয়ে বললেন, এখন বিপদে আত্মীয় আত্মীয়ের কথা, বন্ধু বন্ধুর কথা ভাবে না। হুঁশিয়ার! রে স্থ্য়ান জবাব দিলে না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে চলে এল। যখন বাড়ি গিয়ে পৌছলো, তার মাথা ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়।

পিপিং-এর পতনের পর খুদে খাটালের মানুষরা মন-মরা হয়ে পড়েছিল। কিছুটা বা ঘাবড়ে গিয়েছিল। সাংহাই-এর লড়ায়ের খবর শুনে আবার তাদের উত্তেজনা দেখা দিল, আশাও হোলো। কিন্তু আজকের আগে, শত্রু

কেমন তারা চোখে দেখে নি, কতখানি তাদের সইতে হবে তা কল্পনাও করতে পারেনি। আজ তারা তারই গন্ধ পেল। শত্রুর ভীতি বেড়ে গেল। খুদে জাপানীদের সম্বন্ধে বদলালো ধারণা। শুধু নগর দখল করতেই তারা আসে নি, মানুষের জীবনও তারা নেবে। খুদে খাটালের মানুষরা কুয়ানদের বাড়ির ফটকের দিকে তাকালো, সাবধান তাদের হতে হবে বৈকি। এমন কি 'খুদে জাপানী' কথাটাও বাৎচিতে আর চলবে না, পড়শীদের মধ্যে জাপানীর তাঁবেদার কুত্তা দেখা দিয়েছে।

প্রভাতপদ্ম কুয়ান ফটক বেশ এঁটে বন্ধ করে দিলেন, ভাবনা মনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সূর্যাস্তের পরে তিনি আরো ভয় পেলেন, কি জানি চিয়েনদের বাড়ি থেকে কেউ যদি প্রতিশোধ নিতে আসে। স্পষ্ট বলতে সাহস হোল না, তবু ইঙ্গিতে সবাইকে জানালেন, রাতে সবাই যেন একটু সজাগ থাকে।

বড় লঙ্কার আনন্দ আর ধরে না। তিনি ঘোষণা করলেন, কাজের প্রথম পর্ব তো শেষ। এখন পিছিয়ে পড়ার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। জোর কাজ চালাতে হবে। কথা মতো হরদম হুকুমও চললো—চাকররা তো তামিল করতে হয়রান। একটু পা জিরোবার আর সময় রইল না। স্বামীর সাফল্যের কামনায় তার পয়লা ফরমায়েস মদ। তারপর বন্ধুদের ডেকে পাঠালেন মাং জং খেলার আসরে। তারপর পোষাক বদলে গেলেন চিয়েনের খবর নিতে। ফিরে এসে আবার পোষাক ছাড়তে হোলো। আবার ট্যাপারির পুডিং-এর ফরমায়েস দিলেন। এ তাঁর নতুন আবিষ্কার, জাপানীরা এই পুডিং খেতে ভালবাসে।

প্রভাতপদ্মকে ঘাবড়ে যেতে দেখে জ্বলে উঠলেন, তুমি তো একটা মেনি-মুখো পুরুষ, ভালমন্দ চিনতে পার না। খাবার ষোলো আনা ইচ্ছে আছে, কিন্তু তাতে ঝলসে যাবার ভয়ও ষোলো আনা। কি রকম পুরুষ তুমি! বলে পথ করা কতো শক্ত, যেই পথ হোল, বাবু অমনি ভয়ে একেবারে কাবু! বুড়ো চিয়েন কি তোমার সাতকেলে বাপ নাকি যে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে শুনে একেবারে মূর্চ্ছা গেলে?

বাধ্য হয়ে প্রভাতপদ্মকে ফুর্তির ভাব টেনে আনতে হোল। বললেন,—খাঁটি যে পুরুষ কাজ করবার সাহস যেমন তার আছে, ফলের জন্যে সে ডরায় না। আমিও ডরাই নি।

বড় লঙ্কা নরম হয়ে বললেন, এই তো চাই!

পশ্চিমের বাড়িতে চিয়েন-গৃহিনী কাঁদছেন। কান্না তাঁর ছাপিয়ে উঠছে নিস্তব্ধ দুপুর। তাই শুনে বড় লঙ্কার গলা আর চড়ল না—চড়াবার সাহস হোলনা।

তেরো

হেমন্তের মাঝামাঝির উৎসবের আগে ও পরে পিপিং-এ দিনগুলি বড় সুন্দর। আবহাওয়া তখন খুব ঠাণ্ডাও নয়, আবার গরমও নয়। দিনরাত তখন সমান বড়। শীতকালের মতো মঙ্গোলিয়া থেকে ধুলোর ঝড় তখন বয়ে আসে না, আবার গ্রীষ্মকালের মতো শিলাবৃষ্টি হয় না। আকাশ তখন মনে হয় কত উপরে, কি ঘননীল আর উজ্জ্বল! তারা যেন সবাই মিলে হেসে হেসে পিপিং-এর মানুষদের বলে, শোন গো শোনো, প্রকৃতি আর তোমাদের শাসাবে না, ধ্বংসও আর করবে না। এমন দিনে তোমরা তো নির্ভয়। পশ্চিমের পাহাড় আর উত্তরের পর্বতমালা যেন তখন ঘন নীল হয়ে যায়। আর প্রতি সন্ধ্যায় তারা সূর্যাস্তের নানা রঙের পোষাকে সেজে ওঠে।

শান্তির দিনে ফলের পসরা বিছিয়ে ফলওয়ালারা বসে পথের ধারে ধারে, আবার ফলেব দোকানগুলিতেও দেখা যায় হরেক-রকম ফল। পিপিং-এর মানুষরাই শুধু তাদের নাম জানে। কত রকমারি আঙুর, রকমারি তাদের আকার, আপেল আর নাসপাতিও নানা রকমের—দেখ, শোঁকো, খাও। আরো আছে। খোসবাইওয়ালা আপেল, নাসপাতি, পিপিং আপেল, তার গায়ে আবার সোনালি তারা দিয়ে সাজানো। গন্ধে ঘর ম-ম করে, শোভাও বাড়ায়। চন্দ্রের পূজায় লাগে বালিসের মতো তরমুজ, তার উপরে সোনার তবক মোড়া। সেগুলি লাল আর হলদে ফুলের গুচ্ছের ভিতরে থাকে। এই ফলের পসরা দেখে মানুষের যে শুধু খাবারই ইচ্ছে হয় তা নয়, তারা খোসবাইয়ে গন্ধ-কানা হয়ে যায়। বুঝে উঠতে পারেনা কোন গন্ধটা ভাল। রং-কানাও হয়। আর হয় একটু বা গন্ধ-মাতাল।

ফলগুলি বেশ থরে থরে সাজানো থাকে। সাজানোরই বা কেতা কতো! দেখে মনে হয় যেন শিল্প-সৃষ্টি। সুন্দর ফলগুলিকে আরো সুন্দর করে তোলে। ফলওয়ালারা আবার গানও গায়। তারা যত্নে ফল সাজায়, আবার গানও গায়—সেও ফলের গান। ফলের প্রশস্তি। সুর কেঁপে কেঁপে বেড়ায় সুগন্ধি বাতাসে, আপেল আর আঙুরের সৌন্দর্যের সঙ্গে তারা যেন সঙ্গত রাখে। মানুষ চলতে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে থেমে যায়, শোনে, দেখে আর শোঁকে পিপিং-এর হেমন্তের সৌন্দর্য।

লিয়াঙসিয়াং বাদামেরও এই সময়। বড় বড়, নধর বাদাম বালি দিয়ে রাস্তার পাশের খুদে উনুনগুলোতে ভাজা হয়, গুড় দিয়ে জারিয়ে নেওয়া হয়। তাদের গন্ধে বাতাস মাতাল হয়ে ওঠে। এমন কি উনুনের কাঠের গন্ধও মিষ্টি। ভাটিখানার সামনে বড় বড় মাটির বোয়েম সাজানো, ফেরিওয়ালারা মাংসের টুকরো সাদা বরফের মতো পেঁয়াজের কুঁচি দিয়ে রাঁধে। এক পেয়ালি সরাব, চার ছটাক মাংসের ঝোল তিরিশ কি চল্লিশ সেণ্ট তার দাম—আর এতে পেটও ভরে। আবার কাঁকড়াও মেলে। সেগুলি বাক্সে করে বিক্রি করে ফেরিওয়ালারা পথে পথে। যাঁরা ভোজনবিলাসী, তাঁরা এসবের হালহদ্দ জানেন। চেঙ ইয়াঙ রেস্তোরাঁয় তাঁরা গিয়ে জোটেন, তার পর কাঠের ছোট হাতুড়ী দিয়ে কাঁকড়ার ঠ্যাঙ ফাটিয়ে মজ্জার রস গ্রহণ করেন।

এই সময়ে, এই খোসবাই আর ফলের কেয়ারীর মধ্যে পুতুলের দোকানও বসে। 'খরগোসের রাজা' সেরা খেলনা। সারি সারি দেখা যায় সাদা ঝক্‌ঝকে মুখ আর নানা রঙের শরীর। তাদের মাথায় রাজছত্র, পিছনে হলদে কাগজের ধ্বজা। পুতুলগুলির কোনোটা বা খুদে, কোনোটা বা বড়-সড়ো, কিন্তু সবগুলিতেই কারিগরের বাহাদুরীর ছাপ আছে। কেউবা বাঘ-সওয়ার, কেউবা ফুটন্ত পদ্মে সমাসীন। ভাস্কর্যের তুচ্ছ কীর্তি এরা, কিন্তু এরাই লাখে লাখে ছেলেমেয়ের মনে সৌন্দর্যের বীজ বুনে দেয়।

এই সময়ে ফেঙতাই থেকেও আসে লোকের মিছিল। ফেঙতাই-র ফুলের ফসলের জন্য খুব নামডাক। ওখান থেকে বাঁকে করে ঝোরা ঝুলিয়ে চন্দ্রমল্লী নিয়ে আসা মানুষরা। শহরের বড় বড় বাগিচার মালী আর সৌখিন চাষীরা এই সময়ে চন্দ্রমল্লী প্রদর্শনীর যোগাড়-যন্তর করতে থাকে। এক চন্দ্রমল্লীই পিপিং-এ হরেক রকমের। পৃথিবীর কোথাও বুঝি এত অজস্র ফুল নেই।

এই সময়ে তরুণ ছাত্ররা বসন্তের ফুলের মতোই এসে দেখা দেয় সিং হুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কেউবা আসে সেই হেইতিয়েন থেকে—যেখানে পদ্মের সাদা সরাব তৈরী হয়। আসে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে—জড়ো হয় গিয়ে উত্তব সাগর পার্কে। তারপর নৌকো ভাসিয়ে দেয় জলে। পদ্মের পাপড়ি তখন খসে যায়, তবু পাতায় পাতায় তখনো কিছুটা গন্ধের রেশ জড়িয়ে থাকে। তরুণ তরুণীরা পোশাকে সেই গন্ধ মেখে নিয়ে চলে যায়, দেহ সুগন্ধ হয়ে ওঠে।

এই তো সেই সময়, যখন পিপিং-এর সংস্কৃতিবান মানুষেরা আত্মীয়-বন্ধুর জন্য উপহার বাছতে শুরু করেন। অষ্টমচন্দ্রের উৎসবে এই উপহার বিলানো হবে। পথে পথে দোকানগুলিতে দেখা দেয় নানা আকারের মদের বোয়েম, উৎসবের মেঠাই যেন নতুন বৌয়ের ঝলমলে সাজ নিয়ে দেখা দেয়, দিকে দিকে গন্ধ ছড়ায়।

পিপিং-এর বসন্তে যেন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নেমে আসে। বুঝি স্বর্গের চেয়েও সে মনোরম।

বুড়ো দাদু চির জন্মতিথি অষ্টমচন্দ্রের তেরো তারিখে। পূর্ণিমার ঠিক দুদিন আগে। আবার সেটি মধ্য-হেমন্তের উৎসবেরও দিন। দাদু মুখে কিছু না বললেও, তাঁর মনে আশা, দিনটা আগের সব বছরের মতোই আনন্দে কাটবে। ফি-বছরেই জন্মতিথির সঙ্গে সঙ্গে উৎসব এসে যাওয়ায়, তিনি জন্মতিথিকেও ধর্মের পর্যায়ে এনে ফেলেছেন। এই দিনে তিনি নিজের সবচেয়ে ভাল পোষাকটি পরেন। আগেভাগেই লাল কাগজের থলেয় নতুন পয়সা ভরে রাখেন। ছেলেমেয়েরা যারা তাঁকে এসে প্রণাম করবে, তাদের দেবেন এই উপহার। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল কামনা করেন, তারপর নিজের অভিজ্ঞতা-মাফিক সবাইকে উৎসাহ আর পরামর্শ দেন। অতিথিরা যাতে পেট ভরে খেতে পান তারও ব্যবস্থা হয়, আর যেসব ফল, পিঠে বা তরমুজ তিনি পছন্দ করেন না, সেগুলি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছাঁদা বেঁধে দিয়ে দেন। তিনি দীর্ঘায়ুর প্রতীক এক বৃদ্ধ নক্ষত্র—এই প্রতীক হিসেবে তিনি হবেন ভদ্র, দয়ালু। অতিথিরাও তাঁর উপর খুশি হবেন, নালিশ করবেন না গোপনে, তাঁর আয়ু ক্ষয় করে দেবেন না এই তাঁর কামনা।

জন্মতিথির উৎসবের পরই বুড়ো দাদু, একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখনো চন্দ্র উৎসব শেষ হয় না। তিনি মনে করেন, উৎসবটা তার জন্মতিথির লেজুড়। সে উৎসব করলেই বা কি না করলেই বা কি! জন্মতিথিটা তাঁর, আর উৎসব সকলের। গোটা পরিবার—এই এক গোষ্ঠি মানুষ আর টাকাকড়ি সবই তো তাঁর সৃষ্টি। তাই এটুকু স্বার্থপর তিনি হবেন বই কি।

এবার জন্মতিথির দিন দশেক আগে থেকে, তাঁর ভাল ঘুম হয় নি। তিনি বুঝেছেন, জাপানের অধীনে থেকে তেমন জাঁকিয়ে জন্মতিথির উৎসবের আশা বৃথা, তবুও আশা ছাড়েন নি।

শ্রীযুত চিয়েনকে না জাপানীরা ধরে নিয়ে গেছে? তিনিই বা এই গোলমালে ক'দিন বাঁচবেন কে জানে! তাই উৎসবটা একটু না হয় ভালভাবেই হোক। কে বলতে পারে—এইটেই যে শেষ উৎসব নয়? তা ছাড়া, তিনি তো জানেন, জাপানীদের পাকা ধানে তিনি মইও দেননি। তারা চড়াও হয়ে তাঁর উৎসবটা মাটি করে দেবে এমনও কারণ নেই। যতই ওরা অবুঝ হোক, বুড়ো মানুষকে তার জন্মতিথির উৎসবটাও কি করতে দেবে না?

বুড়ো দাদু ভাবলেন, একবার পথে নেমে সরজমিনে ব্যাপারখানা কি দেখে আসবেন। চোখ মুদেই তিনি পথের চেহারা আঁচ করতে পারেন, তবু একবার চোখে দেখতে চান। যদি পথে আগের মতো ভিড় থাকে, তাহলে উৎসবে বাগড়া পড়বে না। বোঝা যাবে, জাপানীর অধীনে এসেও পিপিং শান্তিতেই আছে।

পথে বেরিয়ে পড়লেন বুড়ো দাদু। সদর সড়কে এসে শুঁ শুঁ করে নাক টানলেন। কই, ফুলের সে খোসবাই কোথায়? বাঁক কাঁধে ফলের পসরা নিয়ে ফলওয়ালাদেরও দেখা নেই। বন্ধু-বান্ধবকে উপহার দিতেই বা যাচ্ছে কোথায় মানুষ? চন্দ্রপূজার পিঠের দোকানও তেমন বসে নি। এমনিতেই তিনি আস্তে হাঁটেন, এখন যেন মনে হচ্ছে পা চলছে না। ফলের দোকান যখন বসেনি, তখন দেশে আর শান্তি নেই। আর চন্দ্রপূজার পিঠে যখন তেমন আসে নি, তখন মনে হচ্ছে, মানুষ এবার আর পূজা-পার্বণ করবে না। হঠাৎ শরীরটা যেন তাঁর ঠাণ্ডা হয়ে এল। জাপানীরা যদি তাঁর জীবনযাত্রায় বাধা না দিত, তিনি তো তাদের ঘৃণা করার কথা মনেও

আনতেন না। এবার বুঝলেন, জাপানীরা তাঁকে জন্মতিথির উৎসব করতে দেবে না। উৎসব করতেও তাঁর মানা।

কুতকুতে চোখে তাঁর জল খুব কমই ঝরে, কিন্তু আজ তো তিনি চোখের জলে পথ দেখতে পেলেন না। আবছা হয়ে গেল সব কিছু। পাশের হোটেল থেকে একটা টুল চেয়ে নিয়ে তার উপর ধপ করে বসে পড়লেন। আস্তে আস্তে উত্তেজনা কমে এল, তিনি ঠাণ্ডা হলেন।

আস্তে আস্তেই এবার বাড়ি ফিরে চললেন। পথে দু-একখানা দোকান বসেছে খেলনার। 'খরগোসের রাজা' থরে থরে সাজানো। আগে ছেলে নাতি, বা নাতির ঘরের পুতদের হাত ধরে তিনি খেলনার দোকানের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছেন। তারিফ করেছেন শিল্পকৌশল, সমালোচনা করেছেন, তারপর বাছাই করে একটা বা দুটো ছোট্ট খেলনা কিনে দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের হাতে। কম দামের মধ্যে কারিকুরি ভাল দেখেই কিনেছেন। কিন্তু আজ তিনি একা বেরিয়েছেন। তাই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। দোকানও মাত্র দুটো। একটা ফলের দোকানও বসে নি। বেখাপ্পা লাগছে তাঁর কাছে, কেমন যেন ঘাবড়েও গেছেন।

তাঁর মনে হোল, খুদে ধন আর নিউনিউর জন্যে দু-একটা খেল্‌না নিলে হয়। আবার তখুনি মত বদলালেন। দিনকালটা কি পড়েছে, এখন কি ছেলেপুলের খেলনা কেনা যায়! কিন্তু মন ঠিক করে ফেলবার আগেই—রোগা শিড়িঙ্গে ফেরিওয়ালাটা হেসে হেসে ডাকলে, আসুন বুড়োকর্তা, দু-একটা কিনুন—দু-চার পয়সা দিয়ে যান! ফেরিওয়ালা হাসছে, স্বরে তার ফুর্তির আমেজ। বুড়ো চি ভাবলেন, খেলনা না কিনেও উনি যদি দুদণ্ড ওর সঙ্গে আলাপ করেন, তাতেও ও খুশি হবে। বুড়ো চি তবু থামলেন না, এগিয়ে চললেন। শিড়িঙ্গে ফেরিওয়ালাটাও এগিয়ে এল—কিনুন না কর্তা কিনলেই লাভ—না কিনলে ক্ষতি! 'লাভ' কথাটা শুনে বুড়ো থেমে পড়লেন। এ তাঁর প্রকৃতির তাড়নায় থামা। ফেরিওয়ালার মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে, যেন বলতে চায়—হঁ্যা, জাঁদরেল খদ্দের পাকড়েছি বটে!

বুড়ো কর্তা, বসুন, পাকে একটু জিরান দিন! লোকটা একটা বেঞ্চি বার করে নিজের জামার আস্তিন দিয়ে ঝেড়ে পুঁছে দিলে। বুড়ো কর্তা,

আজ তিনদিন ধরে দোকান সাজিয়ে বসে আছি, জমার ঘরে আঁচড়ই পড়েনি। আর এ সময় মানুষ কিনবেই বা কোত্থেকে! সারা গরমকাল ধরে খেলনা তৈরি করলাম, এখন বসে থাকিই বা কি করে! তাই এসে দোকানপাট সাজিয়ে বসলাম। কিন্তু—বুড়ো বসে পড়েছেন দেখে—সে এবার ধানাই-পানাই ছেড়ে আসল কথায় এল। কর্তা, আপনি এই বড় দুটো নিয়ে যান। আমি হলপ করে বলছি, একেবারে লোকসান দিয়ে বেচছি। কোনটা নেবেন? ঐ যে কালো বাঘ-সোয়ারী যেটা? না—হলদেটা—দুটোই ভাল।

দেখ, দুই বাচ্চার জন্যে কিনবো, দুটোই একরকম হওয়া চাই। নইলে ঝগড়া বাঁধবে। বুড়ো বুঝলেন তাঁকে ফেরিওয়ালা কায়দায় পেয়েছে। তাই বোলচালে এবার ওকে ঢিট্ করা দরকার।

তা একই রকম তো বহুৎ আছে কত্তা—দেখুন না! শিঁড়িঙ্গে ফেরিওয়ালা বুড়োকে পালাতে দেবে না। কালো বাঘ-সোয়ারী চান—না পদ্মের উপর চান? দাম একই। আর সস্তাই আমি দেব।

না, না, অতো বড় নয়। বাচ্চারা একেবারে একরত্তি। খেলনাগুলো বেশি বড় হলে তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। বুড়ো ফেরিওয়ালাকে আর এক ঠেলা মারলেন। মনটা একটু খুশি।

কিন্তু ফেরিওয়ালা নাছোড়বন্দা। সে বেচবেই। তাহলে ছোটই নিন কত্তা। ছোট আর বড় দামে বেশি তফাৎ হবে না। ছোটতে বরং মেহনৎ বেশি। মাল-মসলা কম লাগে, কিন্তু কারিগরি তো সমান। সময়ও যায় সমান। নিন কত্তা, তাই-ই নিন!

দুটো ছোট খেলনা তুলে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, দেখুন না কত্তা, কি কারিগরি!

সত্যিই সুন্দর খেলনা দুটি! পঁচাত্তর বছরের বুড়োরও ভাল লাগলো, ছেলেপুলের মতোই ভাল লাগলো। মুখে লাল রঙ নেই কিন্তু ঠোঁটের রেখায় সুন্দর লাল রং। লম্বা সাদা কান, ভিতরে একটু লালচে ছোঁয়া। উর্দির উপরের দিকটায় ঘন লাল রং, আর কোমর থেকে ছেয়ে আছে ঘন সবুজ পাতা আর ফুটন্ত পদ্ম। পাতার দলগুলি সুন্দর, ফুলের পাপড়িগুলিও তাই। তারা যেন সজীব। মনে হয় পাতা নড়ে উঠবে, কাঁপবে পাপড়ি।

বুড়ো দাদুর চোখ জলজ্বল করে উঠলো, কিন্তু নিজেকে সংযত করতে তিনি জানেন। এই মাটির পুতুলে পয়সা নষ্ট করতে তিনি নারাজ। খাদের ধারে এসে ঘোড়ার রাশ টানতে তিনি ওস্তাদ। এই জন্যেই তিনি বাড়িঘর করেছেন, ব্যবসায় দাঁড়িয়েছেন। তিনি আবার বললেন, আমার মনে হয়, মাঝারিগুলিই ভাল। ঠিক বড়ও নয়, আবার ছোটও নয়। চট করে নজর দিয়ে দেখলেন, মাঝারিগুলো তেমন সুন্দর নয়। অবশ্য তার জন্যে দামও কমই হবে।

ফেরিওয়ালা নিরাশ হোলো, কিন্তু পিপিং-এর ফেরিওয়ালাদের ভদ্রতা-মাফিক সে চেপেই রাখলো তার নিরাশা। বললে, আপনার মর্জি-মাফিক যেটা হয় বেছে নিন কত্তা। খেলনা বই তো নয়।

বুড়ো ঝাড়া পঁচিশ মিনিট ব্যয় করে এক জোড়া বেছে নিলেন, আরো পঁচিশ মিনিট গেল দরাদরিতে। দাম ঠিক হবার পর আবার জাঁকিয়ে বসলেন। পয়সা কি অমনিই বেরোয় থলি থেকে; আরো কিছুক্ষণ তো যাক। টাকা আছে গেঁজের থলিতে, বেশ নিরাপদেই আছে। এ যেন খাস কামরায় বাঁধা পেয়ারের কুত্তা। কোথাও নড়া-চড়ার জো নেই।

ফেরিওয়ালারও তাড়া নেই। এমনি এক বুড়োকে দোকানে পাওয়া তো লাভ—এযেন বিনে পয়সায় বিজ্ঞাপন; আর দরদামও ঠিক হয়ে গেছে, এবার একটু দোস্তি পাতাতেই বা দোষটা কি! এবার স্বরে তার দেখা দিয়েছে অন্তরঙ্গতার আমেজ। সে বললে, এমনি ধারা যদি চলে কত্তা, তাহলে যে আমাদের কারিগরির দফারফা হয়ে যাবে।

কেন? বুড়ো থলেটা বার করতে গিয়ে থেমে গেলেন।

ধরুন, এবার যদি মাল না বেচতে পারি, সামনের বার কি হাঁদার মতো আবার খেলনা তৈরী করব? না, আর না! কিন্তু এমনি যদি বছরের পর বছর ধরে চলে, তাহলে এই হাতের কাজ তো আর থাকবে না কত্তা।

ক'বছর আর এসব চলবে?—বুড়ো দাদুর মনটা কেমন করে উঠলো।

কে জানে! মাঞ্চুরিয়ায় তো বছরের পর বছর ধরে এমনি চলছে।

বুড়ো দাদু একটু কেঁপে উঠলেন। তাড়াতাড়ি টাকা বার করে দিলেন ফেরিওয়ালার হাতে।

নাও বাপু। তা বছরের পর বছর ধরে চলুক, আমি তো আর দেখতে আসব না। ততদিনে গোরের তলায় গিয়ে ঢুকব।

কথা বলতে বলতে বুড়ো দাদু খেলনার কথা প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলেন। ফেরিওয়ালা তাঁর হাতে সযত্নে তুলে দিলে খেলনা জোড়া।

বছরের পর বছর কেটে যাবে! তিনি বিড়বিড় করে বকতে-বকতে চললেন আপন মনে। মানস চোখে দেখলেন, তার কফিন চলেছে শহরের দরোজার বাইরে। জাপানী শাস্ত্রীরা সেখানে মোতায়েন। তাঁর বংশধরেরা তখনো বাস করছে পিপিং-এ। সেখানে নেই পাল-পার্বণের সমারোহ, নেই ছেলেমেয়েদের হাতে খরগোসের রাজা। এই কুটির-শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আরো কত জিনিস যে যাবে। পিপিং-এর শিল্প চলে যাবে—চলেও যদি না যায়—শুকিয়ে যাবে তার কুটির-শিল্পের ধারা, ছিন্নমূল হয়ে যাবে। কিন্তু বুড়ো তো তা জানেন না। তিনি বাড়ির পথে চললেন। বুড়ো ঘোড়ার মতো চোখ বুজেও তাঁর নিজের আস্তানায় পৌঁছতে পারেন। চিয়েনদের বাড়ির কাছে এসে তাঁর চিয়েনের কথা মনে পড়লো। তাইত, খেলনা কেনা তো উচিত হয় নি। তাঁর এক আত্মার মিতা জীবিত কি মৃত তিনি জানেন না, অথচ নাতি-পুতির জন্যে খেলনা কেনার তাঁর শখ হোল!

চিয়েনদের বাড়ীর সদর দরজা খুলে গেল। বুড়ো দাদু তাড়াতাড়ি চললেন। তিনি চিয়েন পরিবারের কাউকে খেলনা দেখাতে চান না।

কয়েক পা গিয়েই থেমে পড়লেন, একটু অনুতাপই হোলো। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, চিয়েন-গিন্নী এসে ফটকের বাইরে দাঁড়িয়েছেন। বেঁটে খাটো মানুষটি—প্রজাপতির চেয়েও কোমল। তাঁর বগলে নীল কাপড়ের একটা পুঁটলি। গভীর চোখ দুটি মেলে একবার লোকাস্ট গাছটার দিকে তাকালেন, আর একবার পুঁটলিটার দিকে। যেন বাড়ির বাইরে এসে দিশা হারিয়ে ফেলছেন। বুড়ো দাদু ফিরেই এলেন। চিয়েন-গিন্নী তাঁর লম্বা গাউনটা একটু তুললেন—পুরানো গাউন, ঝুল বড়, পায়ের গোড়ালিতে এসে ঠেকেছে। তিনি ছুটেই বুঝি পালাবেন। বুড়ো দাদু জলদি কাছে এসে ডাকলেন, চিয়েন-গিন্নি! দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীমতী, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। তাঁর মুখের মাংসপেশী যেন ভাব ফোটাতে ভুলে গেছে। শুধু চোখের পাতা উঠছে পড়ছে ঘন ঘন।

শেষে বুড়ো দাদুই বললেন, শ্রীযুত চিয়েনের খবর কি ?

চিয়েন-গিন্নী মাথা নোয়ালেন, কাঁদলেন না। হয়তো চোখের জল সবই খরচ হয়ে গেছে। এবার ফিরে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। বুড়ো এলেন পিছনে। ভিতরে এসে ভাঙা গলায় বললেন, চিয়েন-গিন্নী, সবাইকেই তো জিজ্ঞেস করলাম, কেউ বলতে পারে না তিনি কোথায় আছেন।

চি-খুড়ো, আমি তো বছরের পর বছর উঠোনের বাইরে কখনো পা বাড়াইনি। এখন তো সারা শহর তালাস করে ফিরছি।

আপনার বড় ছেলে কেমন আছে ?

ওর তো হয়ে এল। বাবা গ্রেফতার হয়েছেন, ভাই মারা গেছে, নিজে অসুস্থ। তিনদিন ধরে তো দাঁতে কিছু কাটেনি, একটা কথাও কয়নি। চি-খুড়ো, জাপানীরা যদি এমনি করে মানুষকে ধ্বংস না করে পিপিং-এর দেয়াল তোপ দেগে চুরমার করে দিত, তাহলে বোধ হয় ভালই হোত। চিয়েন-গিন্নী মাথা তুললেন, চোখ দুটোয় তাঁর আগুন জ্বলছে। কিন্তু এখনো পিটপিট করছে চোখ। হয়তো মনিকোঠার আড়ালে যে জলের পুঁজি আছে, আগুনে সেই জল লেগে ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে।

বুড়ো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সাহায্য করতে তিনি চান। অন্য কারো এই বিপদ হলে তিনি সহজ ভাবেই বলতেন, কি করবে তোমার বরাত। কিন্তু চিয়েন-গিন্নীকে একথা কি বলা যায়! ওদের গোটা বাড়িটাই ভাল। ওদের উপর এতটা ধকল যাওয়া ঠিক নয়। তিনি এবার শুধালেন, কোথায় যাচ্ছিলেন ?

শ্রীমতী চিয়েন নীল কাপড়ের পুঁটলিটার দিকে তাকালেন। মুখখানা কুঁচকে গেল। লজ্জা করলে চলে না, তাই মুখ তুলে বললেন, বাঁধা দিতে যাচ্ছিলাম। ঠোঁটে জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুললেন। কালো মেঘ ঠেলে দিয়ে যেন রোদের রেখা ঝলমল করে উঠলো। 'দেখুন তো, আগে যখন আমার হাতে খরচ-খরচার টাকা থাকতো, কিছু কিনতেই ডরিয়ে মরতাম। আর এখন কিনা জিনিস বাঁধা দিতে চলেছি! একেই বলে বরাত !'

বুড়ো চি সাহায্যের সুযোগ পেলেন। দেখুন—আমি আপনাকে গোটা কয়েক টাকা ধার দিতে পারি।

না, চি-খুড়ো, দৃঢ় তাঁর স্বর। বুঝি বা ভাঙা স্বরে দেখা দিয়েছে তীক্ষ্নতা। গোটা কয়েক টাকাই তো। আমাদের ভিতরে যে সম্পর্ক—

না। আমার স্বামী জীবনে কারো কাছে হাত পাতেন নি। উনি বাড়ি নেই—আমিও হাত পেতে ধার নিতে—কথা শেষ হোল না। তিনি দৃঢ় হ'তে চান ; এই দৃঢ়তার কি মূল্য। হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, চি-খুড়ো, আপনার কি মনে হয় ? উনি কি বেঁচে আছেন ? ফিরে কি আসবেন ?

বুড়ো দাদুর হাত কাঁপছে। জবাব নেই মুখে। বহুক্ষণ ভেবে বললেন, চিয়েন-গিন্নী, প্রভাতপদ্ম কুয়ানকে জিজ্ঞেস করলে হয় না ?

আমিই যাব, বুড়ো তাড়াতাড়ি বললেন, আপনি তো জানেন, আমিও লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারিনা।

না, যাবেন না। ও মানুষ নয়। জীবনে কখন খারাপ কথা উচ্চারণ করেন নি চিয়েন-গিন্নী। 'ও মানুষ নয়' কথাটায় তাঁর সমস্তখানি ঘৃণা ফুটে উঠলো, ফুঁসে উঠলো সমস্ত অভিশাপ। তিনি এবার বললেন, আমি যাই। দরজা দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বুড়ো দাদু হকচকিয়ে গেলেন। এমন শান্ত, ভদ্র, লাজুক মেয়েমানুষের যে এমন সাহস থাকতে পারে একথাই বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনিও পেছু পেছু চললেন। থামাতেই বুঝি চাইলেন, কিন্তু চিয়েন-গিন্নী ততক্ষণে মোড় ঘুরেছেন। আজ সদর দরজা বন্ধ করতেও ভুলে গেছেন চিয়েন-গিন্নী। অথচ সদর তো আঁটো-সাঁটো করেই বন্ধ হয়ে থাকে রোজ। বুড়ার বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। খেলনা দুটো লোকাস্ট গাছের উপর আছড়ে ভাঙতে ইচ্ছে হোল, কিন্তু ইচ্ছে চেপে রাখলেন। দাম দিয়ে কেনা জিনিস, ভাঙতে মন ওঠে না।

বাড়ি ফিরলেন ক্লান্ত হয়ে। খুদে ধনের মার হাতে খেলনা দুটো দিয়ে চুপে চুপে ঢুকলেন ঘরে। খুদে ধনের মা খেলনা নিয়ে ব্যস্ত, তাই সে বুড়ো দাদুর মুখের ভাব টের পেলে না। সে বললে, তাহলে এবারও খেলনার দোকানপাট বসেছে ! কথাটা বলেই আপসোস হোলো। বুড়ো দাদুকেই বুঝি খোঁচা মারা হোল। সে একটু লজ্জা পেয়েই তাড়াতাড়ি হাঁক পাড়লে, ওরে ও খুদে ধন, দেখ্ এসে, বুড়ো দাদু কেমন সুন্দর খেলনা এনেছেন !

তীরের মতো ছুটে এল খুদে ধন আর নিউনিউ। খুদে ধন হাত বাড়িয়ে একটা খেলনা দখল করে বসলো। নিউনিউ তাকিয়ে রইলো খেলনার দিকে। মুখখানা হাসিখুশি।

নিউনিউ খেলনাটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে খুদে ধনের সঙ্গে বুড়ো দাদুর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

দাদু, খুদে ধনের মুখে হাসি, তুমি আমাদের জন্যে এনেছ দাদু ?

নিউনিউও ধন্যবাদ দিতে চায়, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছেনা।

যাও, খেল গে, বুড়ো দাদুর আধ-বোজা চোখ। এবার এই নিয়ে খেল—সামনের বছর—

সামনের বছর কি দাদু ? আরো বড় খেলনা দেবে ? খুদে ধন শুধালো।

এই এত্ত বড় ? নিউনিউ ভাইয়ের দেখাদেখি বললে।

দাদু চোখ বুজলেন, মুখে রা নেই।

অষ্টমচন্দ্রের তেরো তারিখে খুদে ধনের মা আর রে স্বয়ান পঁচাত্তর বছরের জন্মতিথির উৎসবের জোগাড়-যন্তর করলো। কিন্তু এবার প্রতিবারের মতো তেমন আনন্দ হোলো না।

চৌদ্দ

শ্রীযুত আর শ্রীমতী কুয়ান রে ফেঙ আর তার বৌকে ঘটা করেই অভ্যর্থনা করলেন। প্রভাতপদ্ম রে ফেঙ-এর হাত প্রায় মিনিট তিনেক ধরেই রইলেন, যেন ছেড়ে দেবার আর ইচ্ছেই নেই। বড় লক্ষ্মী এমন ভাবে জড়িয়ে ধরলেন রে ফেঙ-এর বৌকে, তার কেয়ারী-করা চুল প্রায় এলোমেলো হয়েই গেল। চিয়েনের গ্রেফতারের পর খুদে খাটালের সবাই কুয়ানদের বিষ নজরে দেখছে। তাই রে ফেঙ আর তার স্ত্রীকে বাড়িতে পেয়ে বড় লক্ষ্মীর মনে হোল, খুদে খাটালের 'জনমত' বদলে গেছে। চি-পরিবার এ মহল্লার আদি বাসিন্দে, তাঁরাই এখানকার প্রতিনিধি। তাঁদেরই ঘরের ছেলে আর বৌ যখন এসেছে,

তখন আর কি! রে ফেঙ উপহারও তেমন কিছু আনে নি, তবু বড় লঙ্কা মহা মান দেখিয়ে তা গ্রহণ করলেন। খুদে খাটালের সবাই যে এখনো তাঁকে শ্রদ্ধা করে, রাজমাতার মতোই শ্রদ্ধা করে—এযেন তারই প্রতীক।

কুয়ানদের সঙ্গে রে ফেঙ আর তার বৌ জমে গেল। এখানে যা কিছু দেখলো, শুনলো, বুঝলো, তাইতো ওরা চায়। বড় লঙ্কা নিজের হাতে কাফি তৈরী করে দিলেন। এ কাফি ইংরেজ রাজবাড়ির কাফি। পূব শহরের এক নামডাকওয়ালা হোটেল থেকে নতুন ধরণেব চন্দ্রপূজার পিঠে এনেছিলেন, নিজেব হাতে কেটে সেই পিঠে দিলেন ওদের। কাফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে রে ফেঙ-এর যেন একটু একটু করে নেশা ধরলো। কুয়ানের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাও যেন আত্মার গভীরে গিয়ে পৌছতে লাগলো। কুয়ানের ভাবভঙ্গী দেখে হিংসেই হোল। রুক্ষ মুখখানা ঝলসে উঠলো। চোখ দুটো পীচমঞ্জরী আর মেদীর দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে, আবার বুজে আসছে। যেন জবর নেশা লেগেছে. মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

এমন কি রে ফেঙ-এর বৌয়ের চর্বির ঢিবি মুখখানাও জীবন্ত, মোটা পিপের মতো গতরখানা গড়াচ্ছে না, একেবারে সিধে হয়ে আছে। তাই তো দেখে মনে হয়, হঠাৎ তার ঘাড়-গর্দান আলাদা হয়ে গেছে, একটু ঢ্যাঙা তাকে দেখাচ্ছে। হাসছে, কথা কইছে, কথায় কথায় সে তার ডাক নামটা বলে দিলে। একমাত্র তার বাপেব বাড়ি ছাড়া এ নাম কেউ জানে না।

এবার বড় লঙ্কা প্রস্তাব করলেন, আসুন, এক দান মাজং খেলা যাক!

রে ফেঙ তেমন টাকাকড়ি আনে নি, তবু রাজি না হয়ে উপায় কি! মধ্য-হেমন্তের উৎসবের দিন, মাজং খেলা তো রীতি। যদি গররাজি হয়, তাহলে কুয়ান-পরিবারের রীতির বিরুদ্ধেই যাবে। রে ফেঙ-এব বৌ চট করে বললে, আমরা দুজনে মিলে এক হাতে খেলব। আমি আগে খেলব। বলতে বলতে সে নিজের সোনার আঙটিটার উপর হাত রেখে স্বামীকে ইসারা করলে। সোনার আঙটিটা যখন আছে, তখন হারলেও মাথা হেঁট হবে না। রে ফেঙ স্ত্রীর দূরদর্শিতা মেনে নিলে, কিন্তু ওকে প্রথম খেলতে দিয়ে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো। মুখখানা আরো যেন রুক্ষ হয়ে উঠলো।

এবার বড় লক্ষ্মা প্রভাতপদ্মকে বললে, কিগো তুমি খেলবে নাকি ?

'তোমরা মেয়েরাই খেল। আমরা পুরুষেরা চা করে খাওয়াব।' প্রভাত-পদ্মের মেয়েদের উপর শ্রদ্ধা একজন লেখাপড়া জানা মার্কিন মানুষের মতোই।

বড় লক্ষ্মা হুকুম দিলেন। দাস-দাসীর পাল অমনি ছুটে এল। এক লহমায় মাজং-এর টেবিল পাতা হোল। দাস-দাসীর ভাবভঙ্গী যেন একেবারে ফৌজি।

পীচ-মঞ্জরী মেদীকে খেলতে দিলে। এ তার ভদ্রতা। কিন্তু আসলে তার ভয়। বড় লক্ষ্মার সংগে খেলতে বসলেই ঝগড়া বাঁধবে।

কাওদী, মেদী, রে ফেঙ-এর বৌ আর বড় লক্ষ্মা বসে পড়লেন। প্রভাতপদ্ম রে ফেঙের সঙ্গে আলাপ করছেন, মেয়েদের খেলার দিকে ভুলেও নজর দিচ্ছেন না। তিনি অতিথিকে বললেন, মাজং খেলা আর মদ খাওয়া— এ নিয়ে জোর-জবরদস্তি করতে নেই। জোর করে মাজং-এ বসানোর তো কোনো যুক্তি নেই। এ যেন কান ধরে গলায় মদ ঢেলে দেবার মতো ব্যাপার। এই তো আমি, খুব-একটা মদ খাইনে, মাজং খেলতেও তেমন বসিনে। তাই অন্যকেও পেড়াপীড়ি করা আমার স্বভাব নয়। সামাজিক উৎসবে এইটেই তো ঠিক।

রে ফেঙ সায় দিয়েই চললো। আবার আড় চোখে বড় লক্ষ্মার দিকেও তাকাচ্ছে। বড় লক্ষ্মা যেন সিংহী। ডান চোখ নিজের পাশাগুলির দিকে; বাঁ চোখে অন্যের মুখের হাবভাব লক্ষ্য করছেন, তাদের পাশার দান ফেলা দেখছেন। তারপর দুচোখ একসঙ্গে বুলিয়ে নিচ্ছেন টেবিলের উপর। অতিথির দিকে তাকিয়েও একটু মুচকি হাসলেন। তাঁর হাসিতে ধূর্তামি যেমন আছে, তেমনি আছে সম্ভ্রান্ত ভাব। একটা ঘুটি তুলে তিনি যেন হাত দিয়ে ছুঁড়ে মারছেন না। পাশা যেন তার দেহের আকর্ষণে ছুটে আসছে, আবার যখন দান পড়ছে, মনে হচ্ছে, হাত, কব্জি, কনুই, এমন কি স্তন থেকে ছিটে-ছড়িয়ে পড়ছে। তার দান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুটিগুলি নেচে নেচে উঠে অন্য খেলুড়েদের ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। তিনি ইচ্ছে করেই সবাইকে ঘাবড়ে দিচ্ছেন।

রে ফেঙ তার বৌয়ের দিকে তাকালো। সিংহীর পাশে সে যেন নিরীহ এক হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া বনে গেছে। তার বাঁ হাতের মুঠোয় পাশা দুখানা শক্ত

করে ধরা, মনে হয় এমনি করে ধরে না রাখলে বুঝি ফসকে যাবে। ডান হাত দিয়ে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। তার পালা আসবার আগেই সে হাত বাড়িয়ে দিলে। হাত বাড়িয়েই বুঝলে, পালা আসে নি, আবার হাত সরিয়ে নিতে গিয়ে এক কাণ্ড! সমস্ত ঘুঁটি ছড়িয়ে ছত্রখান। রে ফেঙ প্রভাতপদ্মের সঙ্গে বার্তাচিৎ চালাচ্ছে, কিন্তু আশঙ্কায় কাঁপছে বুক। বৌয়ের হাতের সোনার আঙটিটা বুঝি গেল!

পরপর তিন-তিনটে বাজি জিতে নিলেন বড় লঙ্কা। আরো জিততেন, হঠাৎ এমন সময় চিয়েনদের বাড়ির উঠোন থেকে মেয়েলি কান্নার রোল উঠলো। বড় লঙ্কা তখনো খেলা চালিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু শরীরে ঘাম দিচ্ছে, খেলাও ঢিমে-তেতালা হয়ে গেছে। একটা ভুল চালই দিলেন তিনি, রে ফেঙের বৌ মোটা হাতে জিতলো।

প্রভাতপদ্ম রে ফেঙের বৌকে জিততে দেখে হাততালি দিতে গেলেন, কিন্তু হাতে হাত লাগাতে গিয়ে দেখেন ঘামে তেলতেলে হয়ে গেছে।

কাণ্ডারী এবার বললে, বাবা, তুমি আমার হাতটা খেল।

বেশ, বেশ! তিনি বসে পড়লেন। চিয়েনের বাড়ির কান্নার রোল এবার মুষল ধারায় বৃষ্টির মতো প্রবল হয়ে উঠছে।

বড় লঙ্কা একটা পাশা টেবিলের উপর সশব্দে ফেলে বললেন, না, এ অসম্ভব। দুটো মেয়েমানুষ বছরের পূজা-পার্বনের দিনে এমন মরাকান্না জুড়ে দিয়েছে কেন?

তাতে আর কি হয়েছে, একটা ঘুঁটি তুলে নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরা মরাকান্না কাঁদুক, এস আমরা খেলি!

রে ফেঙ টেবিলের কাছে এসে বললে, আর ক' বাজি বাকি। একটু জিরিয়ে নিলে হয় না?

তার বৌ বললে, খেলায় সবে বরাত ফিরেছে। তুমি বাড়ি যেতে চাও, যাও। কেউ তো আটকে রাখছে না!

হাঁ, হাঁ, খেলা তো চলবেই। এখনো অন্ততঃ ষোলোটি বাজি খেলা হবে। আর সেই তো খেলার নিয়ম।

কুয়ান একটা সিগারেট ধরিয়ে দুটো ধোঁয়ার গোলা নাক দিয়ে বার করে দিলেন।

রে ফেঙ আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। বৌ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেনা, কিন্তু ওকে আর কিছু বলতেও সাহস হয় না। সে জানে স্বামী স্ত্রীর মিল নির্ভর করে স্বামীর হাসবার ক্ষমতার উপর। যত ভুল বোঝার ব্যাপার আছে সব মেনে নিলেই হয়।

উঃ আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, বড় লঙ্কা খেলতে খেলতে বললেন, ঐ মেয়েমানুষগুলোকে ধরে এনে ফাঁসি লটকে দিতাম। অমন পড়শী থাকাও এক উৎপাত। এক দান মাজং ধীরে সুস্থে খেলতে দিলে না বাপু!

দরজা খোলা, উঠোন দেখা যায়। বড় লঙ্কা দেখলেন কাওদী আর পীচ-মঞ্জরী সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি হাঁক ছাড়লেন, দুটিতে মিলে কোথায় যাচ্ছিস?

পীচ-মঞ্জরী চট করে বেরিয়ে গেল, কিন্তু কাওদী মাকে ভয় করে না। সে মহড়া নিলে। পশ্চিমের বাড়ি যাচ্ছি আমরা।

কি! বড় লঙ্কা একটু দাঁড়িয়ে পড়ে প্রভাতপদ্মকে হুকুম দিলেন, যাও, গিয়ে ওদের বারণ কর!

প্রভাতপদ্ম পাশা হাতেই ছুটলেন। যখন উঠোনে এলেন, ততক্ষণে ওরা উধাও হয়ে গেছে।

প্রভাতপদ্ম ফিরে এলেন। বড় লঙ্কা রেগে-মেগে বললেন, তুমি একটা অপদার্থ! দুটো ছুঁড়িকে আটকাতে পারলে না। সখ করে তো একটা বেবুশ্যে পুষেছ, এখন তাকে সামলাতে পারছনা! নিজের মেয়েকেও তোমার সামলানো দায়!

প্রভাতপদ্ম একটু হেসে বললেন, উপপত্নী আমিই না হয় পুষেছি, কিন্তু মেয়ে তো আমাদের দুজনেরই। সব ঝুঁকিটাই বা আমি নেব কেন?

আর খেলা চলে না।

ফেঙের বৌয়ের মুখখানা হাড়-পাকা টোমাটোর মতো লাল হয়ে উঠলো। আবার সে ভাল হাত পেয়েছে, কিন্তু প্রভাতপদ্ম এরই মধ্যে উঠে গেছেন।

রে ফেঙ গিয়ে তাকে একটু সান্ত্বনা দিলে, চিয়েনদের বাড়িতে কেউ হয়তো মারা গেছে। বুড়োকে যদি জাপানীরা গুলী করে না মেরে থাকে তাহলে হয়তো বড় ছেলেটারই অসুখ বেড়ে গেছে। চল, এবার বাড়ি

ফিরি। আমাদের বাড়ি থেকে কান্না এত জোর শোনাবে না। বৌ তার চামড়ার বটুয়াটা তুলে নিলে, আর এক হাতে 'ভাল হাত'টা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গট্মট্ করে বেরিয়ে গেল।

প্রভাতপদ্ম একবার বললেন, যাবেন না! কিন্তু সরে গিয়ে আবার পথও করে দিলেন।

বড় লঙ্কা তাদের রাখতেই চান, কিন্তু তেমন চেষ্টা কোথায়! শুধু মুখ ফুটে বললেন, যাবেন না! সত্যি, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন? আচ্ছা. তাহলে আসুন! আবার আসবেন কিন্তু।

রে ফেঙ্ আর তার বৌ চলে যেতেই বড় লঙ্কা প্রভাতপদ্মের সঙ্গে তুল্‌কালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিলে। কি আক্কেল গা তোমার? অতিথির সঙ্গে যে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিতে যেতে হয়, তাও জান না! না, সদর দরজার পথ মাড়াতেই তোমার ভয়? পশ্চিমের বাড়ীর মাগীগুলো কি বাঘ নাকি যে এক গোরাসে তোমাকে খেয়ে ফেলবে?

প্রভাতপদ্ম জবাব দিতে চান না. তাই আপন মনে বললেন, তাহলেও খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হোত।

বড় লঙ্কা কথাটা শুনে হাত নেড়ে রুখে দাঁড়ালেন, কি বললে? ভারি একখানা কথা বলেছ!

সাতসূর্য, ন'কর্তা লি, ন'গিন্নি, রে সুয়ান একে একে সবাই চিয়েনদের বাড়িতে এলেন। ব্যাপারটা স্পষ্ট। চিয়েনদের বড় ছেলে মারা গেছে। তার মা আর বৌ কাঁদছেন।

সাতসূর্য পা দাপিয়ে বললে, এ কেমন পিথিমি বাপু—বুড়ো গেল জেলে, ছোঁড়াটা মলো! সে গাল পাড়তে গিয়েও থেমে গেল।

রে সুয়ান ন'কর্তা লির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, দুঃখ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা—এগুলিতে কোনো কাজ হয় না। বুড়ো চিয়েন তার বন্ধু, তাঁর বড় ছেলে তার ইস্কুলের সঙ্গী। কিন্তু তাকে শান্তই থাকতে হবে, কাজ তার বহু।

বড় ছেলের পরণে এখনো সেই ছেঁড়া কোট আর ট্রাউসার। যেন ঘুমিয়ে আছে বলে মনে হয়। শীর্ণ মুখে মৃত্যুযন্ত্রণা আর রোগের ছাপ

নেই। রে স্বয়ান কাছে গিয়ে তার রোগা হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিতে চাইল, কিন্তু আবার ইচ্ছা চেপে রাখলো। সে জানে, যে শক্রকে রুখতে না চায়, মরণের আগে এমনি করেই সে চোখ বোজে। পিপিং-এর শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ রুখে দাঁড়ায়নি। সেও তাদেরই একজন। তারও হয়তো এমনি মৃত্যু আসবে, এমনিভাবে রোগে ভুগে ভুগে সেও চোখ বুজবে। সে ঠিক করেছিল, কাঁদবে না। কিন্তু কান্না ভেঙে এল চোখে। মৃত বন্ধুর জন্যে কাঁদলো, আর কাঁদলো বিজিত পিপিং-এর লজ্জায়।

ন'গিন্নি গিয়ে শ্বাশুড়ী আর বৌয়ের হাত ধরলেন। কেঁদে কেঁদে তাঁরা থেমে গেছেন। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, দম বন্ধ হবার জোগাড়। ন'গিন্নি তাঁদের পিঠে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগলেন; আবার নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো।

ন'কর্তার চোখের জল মণিকোঠোয় জমে আছে, ঝরে পড়ছে না। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে চুপ করিয়ে রেখেছে। এরই মধ্যে ক'বার মূর্চ্ছা গেলেন শ্বাশুড়ী আর বৌ, আবার চোখ খুললেন। এবার ন কর্তা বললেন, আপনারা কেঁদে কি মরা মানুষ ফিরিয়ে আনতে পারবে গা? থামো, থামো! জোগাড়-যন্তর করতে হবে তো। মরা তো বাসি করতে পারব না।

সাতসূর্যের আর সইল না, সে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। হলদে আর লাল ফুল ফুটেছে। তার মনে হোল, গায়ের জ্বালা মেটাতে সে ওগুলোই গিয়ে উপড়ে ফেলে। মানুষই মলো, আর তোরা এখনও ফুটে আছিস! তেরি—মা—কা—

রে স্বয়ান কান্না থামিয়ে আস্তে ডাকলে, খুড়ি, অ-খুড়ি! একটু সান্ত্বনাই সে দিতে চায়, কিন্তু এই পরাধীন দেশে কাকে কে সান্ত্বনা দেবে। এ যেন কসাইখানার দুটো ষাঁড়—একটার জন্যে আর-একটা গোঙিয়ে উঠতে চায়।

চিয়েন-গিন্নির চোখ এবার খুলে গেছে, তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। হাত-পা তাঁর বরফ-ঠাণ্ডা। বুকে এখনো জীবনের ধুকধুকানি চলছে, কিন্তু দেহ আড়ষ্ট।

ছেলের বৌটির হিক্কা উঠেছে। ন'গিন্নি এখনো তাকে ধরে আছেন। তাঁরও চোখ কেঁদে কেঁদে লাল। চোখ মুছছেন আর সান্ত্বনা দিচ্ছেন, বাছা, বাছা, একটু বুঝদার হও। তুমি ম'লে তোমার শাশুড়ীকে কে দেখবে বৌ ?

বৌ মাথা তুলে তাকালো। কান্না থেমে গেছে। সে হঠাৎ হাঁটু গেঁড়ে বসে সবাইকে অভিবাদন জানাল। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ সে যথারীতি জানালে। ন'গিন্নীর চোখে আবার বান ডাকলো! তিনি বললেন, বাছা ওঠ, যেমন পোড়া বরাত আমার! বৌ উঠতে পারলো না। তার হাত-পা কাঁপছে থরথরিয়ে, সে আবার মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো।

এবাব চিয়েন-গিন্নির গোঙানি শোনা গেল। ন'কর্তা বললেন, চিয়েন-গিন্নি, আপনি এবার এদিকের কথা একটু ভাবুন। যাহোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হয়।

চিয়েন-গিন্নি যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন, সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

কাওদী আর পীচ-মঞ্জরী বহুক্ষণ থেকেই সদর দরজার পথে দাঁড়িয়ে আছে। কান্না থামতেই ওরা এগিয়ে এল। সাতসূর্য ওদের দেখতে পেয়ে চট্ করে এগিয়ে গেল। কারা এল আবার কে জানে! কাছে এসে তার গলার শিরা দড়ির মতো জেগে উঠলো। অনেকক্ষণ থেকেই সে একটা কাণ্ড বাঁধাতে চাইছিল, এবার ছুতো পেয়ে গেল। সে রুখে দাঁড়িয়ে বললে, এখানে তো থেটার হচ্ছে না। বাঁদর বা কুকুরের খেল্ও না। আপনাদের রঙ-তামাসার কিছু নেই। সরে পড়ুন বলছি!

পীচ-মঞ্জরী বললে, সাতসূর্য, তুমিও তো ওঁদের বিপদ দেখেই ছুটে এসেছ। আমরাও তাই এসেছি। আমরা কিছু সাহায্য করতে পারি না ?

খুদে সুইর কাছে সাতসূর্য শুনেছে, পীচ মঞ্জরী খারাপ মেয়ে নয়। সে তো ভুল করেই বসেছে তাহলে!

পীচ-মঞ্জরী নিজেই এগিয়ে এল। ঘরে ঢুকে ন'কর্তাকে উঠোনে ডেকে নিয়ে গেল।

ন'কর্তা, পীচ-মঞ্জরী বললে, জানি, পড়শীরা সবাই আমাদের বাড়িখানাকে ঘেন্নার চোখে দেখে, কিন্তু তার জন্যে কাওদী আর আমার কোনো দোষ

নেই। আমরা কারো ক্ষতি করিনি। আমরা চিয়েন-গিন্নিকে এই কথা বলতেই এসেছি। কিন্তু উনি যা কাঁদছেন, তাতে তো কিছুই বলা চলে না। আপনি আমাদের হয়ে একটু বলুন না!

ন'কর্তা তার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। ওদের প্রথম আসতে দেখে তিনি কুয়ানদের গোয়েন্দাই ভেবেছিলেন, কিন্তু এখন পীচ-মঞ্জরীর কথা শুনে বুঝলেন—সন্দেহটা যেন একটু বেশিই করে ফেলেছেন।

কাওদীও বললে, ন'কর্তা, চিয়েন-গিন্নি খুব গরীব—তাই না?

ন'কর্তা পীচ-মঞ্জরীর চেয়েও কাওদীকে ঘৃণা করেন বেশি। তাই তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, গরীব তো কি হয়েছে? চিয়েন-পরিবারের শিকড় ছিঁড়ে গেছে, আশা-ভরসা আর নেই। তোমাদের দুজনের যদি কিছু করবার না থাকে, তো এখান থেকে চলে যাও। দোহাই তোমাদের, চলে যাও!

পীচ-মঞ্জরী তাড়াতাড়ি বললে, ন'কর্তা, কাওদী আর আমি ক'টা জিনিস এনেছি। সে একটা কাগজের ছোট্ট পুলিন্দা বাড়িয়ে দিলে। হাতের চেটোর ঘামে কাগজ ভিজে গেছে। চিয়েনদের বাড়ির কাউকে বলবেন না। আপনার যেমন খুশি কাজে লাগাবেন।

ন'কর্তা একটু বা নরম হলেন। কাগজের পুলিন্দাটা হাতে তুলে নিলেন। তিনি জানেন, চিয়েনরা বড় গরীব, আর অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে এক কাঁড়ি টাকাই লাগে। তাই তিনি ওদের সামনেই পুলিন্দাটা খুলে ফেললেন। পুলিন্দার ভিতরে পীচ-মঞ্জরীর ছোট্ট একটা সোনার আংটি আর আছে কাওদীর পঁচিশ ডলারের নোট।

ন'কর্তা বললেন, আমি এগুলো রাখছি। যদি না লাগে তো ফেরৎ দেব। আর যদি লাগে তো খরচের ঠিক ঠিক হিসেব পাবে।

পীচ-মঞ্জরী আর কাওদী খুশি। খুব খুশি। তারা যেন কাজের মতো কাজ করেছে।

ওরা চলে যেতে ন'কর্তা রে স্থয়ানকে ডেকে পরামর্শ করতে বসলেন। এবার চটপট সব করে ফেলতে হবে। পোষাক তো এখনও ছাড়ানো হয়নি। এমনি ধারা যদি দেরী হয়, নিয়ে যাবে কখন? আজকাল যা দিনকাল, চটপট সব করে ফেলাই তো ঠিক। কখন কি হয় কে জানে!

রে স্বয়ান বার বার ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। এবার বললে, দেখুন, অন্ত্যেষ্টির জন্যে কাপড় কেনবার দরকার নেই। বাড়িতে যা আছে তাই-ই পরবে। এমন দিনকালে অতো ঘটা করবার দরকার নেই। একটা পোক্ত কফিন কিনলেই হবে, আর ষোলজন বেহারা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি বার করে নিয়ে যাব। কি—আপনি কি বলেন?

ন'কর্তা মাথা নেড়ে বললেন, ঠিকই বলেছ বড়, কিন্তু মন্ত্র পড়াবার জন্যে পুরুত আনতে হবে। অন্যদিকে টেনেটুনে এই দিকটায় একটু খরচা করা দরকার। তা পুরুত তো কমসে কম পাঁচজন চাই।

ন'কর্তা, রে স্বয়ান বললে, এসব নিয়ে যদি চিয়েন-গিন্নির সঙ্গে এখন পরামর্শ করতে যাই, তাহলে কাজই এগুবে না। উনি তো কেঁদে কেঁদে সারা! যাই, বাড়ি গিয়ে খুদে ধনের মাকে ডেকে নিয়ে আসি। উনি এসে চিয়েন-গিন্নির সঙ্গে কথা বলে যাহয় ঠিক করবেন।

রে স্বয়ান বাড়ি যেতেই বুড়ো দাদু ডাকলেন। সে জানে, বুড়ো দাদুকে মরার খবরটা দিলে তিনি মনমরা হয়ে যাবেন। কিন্তু এড়াবেই বা কি করে, তিনি তো জানবেনই।

পিপিং-এর পতনে বুড়ো দাদুর মন খিঁচড়ে গেছে, কিন্তু তবু সামলে নিয়েছেন। কিন্তু চিয়েনের গ্রেপ্তার আর জন্মতিথির উৎসব তেমন জাঁক করে না হওয়ায় তিনি মুষড়েই পড়েছেন। এবার চিয়েনের ছেলের মরবার খবর তো হবে তাঁর কাছে বিষমাখা তীরেরই সামিল। আজই কিনা মরলো ছোট চিয়েন—বুড়ো দাদুর জন্মতিথির দিনে—পূজা-পার্বণের দিনে!

রে ফেঙ চোরের মতো আড়ি পেতে শুনলো বুড়ো দাদু আর বড় ভাইয়ের কথা। কুয়ানদের বাড়িতে বলতে হবে তো! প্রভাতপদ্মের আর বড় লঙ্কার নেক-নজর চাই, তাতে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়েই উঠবে। আর যদি কুয়ানরা তাকে বড় চাকরী পাবার ব্যাপারে সাহায্যে না-ই করে, তবুও ওদের বাড়ি যাওয়া-আসায় অলাভ নেই।

রে স্বয়ান বুড়ো দাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দু'ভাইয়ে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল! রে ফেঙ তার লাল চোখ দেখে ঠাওরালে বড় ভাই চিয়েন-গিন্নির দরদী। বড় ভাইকে সে ডেকে খেজুর গাছের তলায় নিয়ে এল। খেজুর গাছ দেখতে ভাল নয়। অকালেই পাতা ঝরে যায়, কুৎসিত

মেয়েমানুষের মত দেখায়। কুৎসিত মেয়েমানুষের মাথার টাক পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনটি। গাছের ডগায় এখনো ক'টা পাকা খেজুর আছে। খুদে ধনের ঢিল এখনো তাদের নাগাল পায়নি।

রে ফেঙ বললে, বড় ভাই, চিয়েনদের সাহায্য করতে যাওয়া ঠিক হয়নি! জাপানীরা যদি সদা-সর্বদাই তোমাকে চিয়েনদের বাড়িতে দেখে, তাহলে হয়তো বিপদই ঘটবে। আর তুমি যদি আমার কথায় কান না দাও, আমি বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে চাই। আমি জড়িয়ে পড়তে রাজি নই। এই আমার হক্ কথা।

রে স্যুয়ান হঠাৎ রেগে উঠলো, মুখ তার লাল। কি চাও তুমি? বিষয়-সম্পত্তির বখরা চাও। যাও—এখুনি চাটি-বাটি গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়!

রে ফেঙের বৌ রোলারের মতো গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে এসে বলল, রে ফেঙ, ওগো, তুমি ভিতরে চল! যখন চাটি-বাটি গুটোতে বলেছে, তাই-ই করব। নইলে যে লাথি মেরে খেদিয়ে দেবে গো! রে ফেঙ রে স্যুয়ানের সামনে থেকে ছুটে গিয়ে বৌয়ের কাছে দাঁড়ালো।

বুড়ো দাদু ঘর থেকে ডাকলেন, রে স্যুয়ান, অ—রে স্যুয়ান! তারপর জবাবের অপেক্ষা না করে এক মস্ত বক্তৃতা ঝাড়লেন, দেখ, তোমরা এখন গোলমাল বাঁধিয়ো না! সেজ ছোঁড়ার তো খবরই নেই—বড়, কি বলে তুমি মেজকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে? মধ্য-বসন্তের এই পূজা-পার্বণের দিনে কোথায় বাড়ির সবাই একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকে—আর আজকে কিনা এই অনাছিষ্টি কাণ্ড! বখরা করবার তোরা কে বাপু? আগে আমি চোখ বুজি, তারপর বখরা করিস! আর ক'দিনই বা আছি! একটু তর্ সইছে না?

রে স্যুয়ান জবাব দিলে না। মাথা নিচু করে সে উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল। সদর দরজার বাইরে য়ুন মেই-এর সঙ্গে দেখা। তার চোখ লাল। সে বললে, যাও, জলদি যাও। চিয়েনগিন্নির কান্না থেমেছে, সাতস্যূর্য গেছে আত্মীয়-কুটুমদের খবর দিতে। বৌয়ের বাপের বাড়িও খবর দেবে। যাও, চট করে গিয়ে একটা বিলি-বন্দেজ করে দাও।

রে স্যুয়ানের রাগ এখনো কমেনি, কিন্তু চিয়েনদের বাড়ি গিয়ে যোগাড়-যন্তর করতে হবে। অন্যকে সাহায্য করেই নিজের রাগ বুঝি সে ভুলে যেতে পারে। সারারাত চিয়েনদের বাড়িতেই সে কাটিয়ে দিলে।

পনেরো

চিয়েন-গিন্নি আর তাঁর ছেলের বৌ আস্তে আস্তে কাঁদছেন। শুধু আত্মীয়-স্বজন আসতেই কান্নার জোর একটু বা বাড়ছে। চিয়েন-গিন্নির একদিনেই মুখ-চোখ বসে গেছে। বসা-চোখ তবু ঝলসে উঠছে। সে ঝলসানি যেন নিরীহ মাদী বেড়ালের মতোই ভীষণ। যখন সে দেখে দুষ্ট ছেলেপুলেরা তার খুদে ছানাদের জ্বালাতে এসেছে, সে এমনি করেই তাকায়, ফুলে ফেঁপে ওঠে। এ যেন মুরগীর মতো। উপরে শকুন উড়তে দেখে পাখার নিচে জাপটে আছে ছানাগুলি। তিনি আর কাঁদছেন না, কথাও বলছেন না। মাঝে মাঝে চোখের দৃষ্টি হানছেন, ঝলসানি উঠছে। আবার নিভেও যাচ্ছে।

সবাই তাঁর এই ভাব দেখে ঘাবড়ে গেল।

ন'কর্তার চিয়েন-গিন্নিকে ভালই লাগছে, সহজ সরল মানুষটি, প্যাঁচ নেই। যখনি তিনি একটা উপায় বাতলাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে সায় দিচ্ছেন, প্যাঁচ কসছেন না। শুধু বৌদ্ধ পুরুতদের কথা বলতে তিনি মাথা নেড়ে বারণ করলেন। ন'কর্তা অবাক হয়ে গেলেন। হয়তো চিয়েন পরিবার বিদেশী ধর্মে বিশ্বাসী—কিন্তু জিজ্ঞেস করবার মুরোদ হলো না। কিন্তু গীর্জ্জায় যেতে তো কখনো দেখেন নি, বাড়িতেও তো বিদেশী গন্ধ নেই।

ন'কর্তা শেষে ছেলের বৌকেই শুধালেন। সে বললে, শ্বশুরঠাকুর আর আমার স্বামী পদ্য ভালবাসেন, ওঁরা দেবতা বা বুদ্ধের ধার ধারেন না।

ন'কর্তা পদ্য কথাটার মানে জানেন না, তা ছাড়া পদ্য আব বুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কটা কি তাও বোঝেন না। তাই তিনি বেশি কথা বলতে পারলেন না। শুধু টাকাকড়ি কি আছে তাই-ই জিজ্ঞেস করলেন।

বৌ ইতস্ততঃ না করে বললে, একটা আধলাও নেই।

ন'কর্তা মাথা চুলকালেন। রে সুয়ানকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন কথাটা।

রে সুয়ান একটু ভেবে বললে, জানি, খুদে খাটালের প্রায় প্রতিটি মানুষই সাহায্য করতে চাইবে, কিন্তু চিয়েন-গিন্নি অমনি চাঁদা আদায়ে রাজি

হবেন না। আমরা নিজেরা তো সবাই মিলে বড় জোর আট কি দশ ডলার তুলতে পারি। কিন্তু এতে তো কিছুই হবে না। তাই বৌয়ের বাপের বাড়ির, ওদের নিজেদের লোকের কাছে জিজ্ঞেস করাই ভাল।

হাঁ, তাই-ই ভাল। এই সময়ে সবই তো নগদ খরচ—বাকি-বকেয়া তো চলে না। জাপানী শয়তানগুলো যদি না আসতো, আমি ধারেও একটা কফিন কিনে আনতে পারতাম। এখন তো আধসের চালও ধারে মেলে না—কফিন তো দূরের কথা!

চিয়েন-গিন্নির ছোট ভাই আর ছেলের বৌয়ের বাবা—দু'জনেই এলেন। চিয়েন-গিন্নির ভাই ইয়ে মশাই মস্ত পণ্ডিত মানুষ। রোগা হাড়-জিরজিরে প্রৌঢ় মানুষটি, মুখখানা রোগা বলেই চোখ দুটো আরো ড্যাবডেবে দেখায়। যখন চোখ দুটো স্থির হয়ে থাকে, তাঁকে দেখে জ্ঞানী বলেই মনে হয়। কিন্তু চোখ দুটো স্থির খুব কমই থাকে।

অমন একজোড়া চোখ আর ছুরির মত পাত্‌লা ঠোঁট মিলে তাঁকে যেন পাখীর মতোই হাল্কা দেখায়—যেন উড়াল দেবে বাতাসে এমনি তাঁর ভাবখানা। তিনি গম্ভীর নন, আবার চঞ্চলও তাঁকে বলা যায় না। ভাল মানুষ। এক বৌ গোরের নিচে, আর আর এক বৌ শয্যাশায়ী। দু' বৌ মিলে বিইয়েছে দু'গণ্ডা ছেলেপুলে। এরা যদি না থাকতো, তাহলে এমনি হাড় জিরজিরে অবস্থা তাঁর হোত না। একটু চেষ্টা করলেই তিনি বিখ্যাত হতে পারতেন। কিন্তু লোকাস্ট গাছের পাতার মতো আটখানা মুখে খাবার আর আট জোড়া পায়ে আট জোড়া জুতো জুগিয়ে জুগিয়ে তিনি হদ্দ হয়ে গেছেন, এতেই যশের আশা তাঁর উপে গেছে। যতই তিনি মেহনৎ করুন, আটটা ছেলেপুলের মোজা আর জুতোর খরচ বয়ে বয়ে তিনি চোখে ধাঁধাঁ দেখেন। তাদের বুঝি ভালবাসতেও পারেন না। কিন্তু এ তাঁর বরাত!

চিয়েনের একেবারে আপন লোক তিনি, সবচেয়ে আসল মিতা। বোন আর বোনাইকে মাঝে মাঝে দেখতে আসেন। চিয়েনের সঙ্গে বসে নানা আলাপ-আলোচনাও জমে ওঠে। এর নাম তিনি দিয়েছেন মনের ময়লা ঘসা। কিন্তু প্রায়ই আসা হয়ে ওঠে না। আট-আটটি তাঁর ছেলেমেয়ে তাছাড়া আছেন চিররুগ্না স্ত্রী। জ্বালানি কাঠ, চাল, তেল, নুন এই সবের চিন্তায় তিনি বাঁধা।

পয়লা দিন রে স্বয়েনের সঙ্গে তিনিই রাত জাগলেন। রে স্বয়ানের তাঁকে ভালই লাগলো। দেশের ভাবনা তাদের মিলিয়ে দিল। তিনি বললেন, আমাদের ইতিহাস দীর্ঘ, চীনের মানুষ বলে লজ্জা পাবারও আমাদের কিছু নেই। কিন্তু আমরা যে নাগরিকের দায়িত্ব নিতে চাই না, এইটে আমি প্রশংসা করতে পারি না। পিপিং তো বহুদিন গেছে, কিন্তু ক'জন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে? চীনে মানুষের এই যে বাঁচবার ইচ্ছে, এই যে অপমান হজম করে থাকা, এই নিয়েই গাল দেওয়া উচিত। আমরা এসব বলছি বটে—কিন্তু আপনি-আমিও—তিনি থেমে পড়ে ভুলটা শুধরে নিলেন, না আমার ও-কথা বলা ঠিক হয়নি।

রে স্বয়ানের মুখে মিউনো হাসি, তা আর কি হয়েছে! আমরা সবাই সমান।

তবুও নিজের কথাই বলা ভাল। আটটা ছেলেমেয়ে, রুগ্না স্ত্রী—আমি যেন মাছির মতো কাগজের আঁটায় জুবড়ে গেছি। উড়ে যেতে চাই, কিন্তু নড়তে-চড়তে পারি না। আমরা—থুড়ি—আমাকে মাপ করবেন! আমরা নই—আমি তো একটা বুড়িরও অধম!

রে স্বয়ান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, আমিও তো মেয়েমানুষেরও অধম।

রে স্বয়ান আর ন'কর্তা এবার ইয়েব সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন! তাঁর শীর্ণ মুখ কালো হয়ে উঠেছে। শরীরে রক্ত নেই বলে লাল হয় না। ক'বার কথা কইতে চেষ্টা করে বললেন, আমার টাকাকড়ি নেই। আমার বোনেরও যে আছে তা মনে হয় না।

ইয়ে অপ্রতিভ হচ্ছেন দেখে রে স্বয়ান তাড়াতাড়ি বললে, আমরা যতো গরীব এসেই জুটেছি।

বৌয়ের বাপের এবার খোঁজ পড়লো। তিনি ঢ্যাঙা মানুষ, চওড়া তাঁর কাঁধ, ভারী গর্দানা, মাথা তো নয় যেন চৌকো পিলপে। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, শুধু মাথায় আছে ক'গাছি সাদা চুল। মাথার তালু আর মুখ লাল, আর সবচেয়ে লাল তাঁর নাকের ডগা। তিনি এক বৈঠকে দেড় বোতল কাওলিয়াঙের মদ টানতে পারেন। যৌবনে তিনি ছিলেন সৌখীন পালোয়ান, ওস্তাদ ভার-তুলিয়ে; আর পুরানো ধরণে ঘুষির লড়াইও চালাতেন। কিন্তু একখানা পুঁথিও উল্টে দেখেন নি। তা আটান্নটা বসন্ত আর হেমন্ত তো

কেটে গেল তাঁর উপর দিয়ে—বয়েসও কম হোল না। এখন খেলাধূলোর চর্চা আর করেন না, কিন্তু ষাঁড়ের মতো এখনো তাঁর তাকদ।

সেজ ওয়াঙের একটা ছোট চা-খানায় আফিস। খোসাইওয়ালা চা যখন কেৎলির জলে ছাড়েন, তাঁর চোখ থাকে খদ্দেরের উপর। আসা-যাওয়া দেখেন কান পেতে শোনেন তাদের কথা, আর মনে মনে পয়সার হিসেব করেন। যখনই কোনো দাঁও মারবার সুযোগ পান, অথবা প্রস্তাব তাঁর মনে ধরে যায়, তিনি তখনি কাজে নেমে পড়েন। বিয়ের ঘটকালিও তাঁর পেশা, তাছাড়া বেচা-কেনার, কর্জ দেওয়া-নেওয়ার দালালিও করেন। মগজে তাঁর হিসেব-কষার যন্ত্রপাতি নেই, কিন্তু অঙ্কগুলো সেখানে সাজানোই থাকে। দর-দাম একেবারে মুখে মুখে বলে দিতে পারেন। টাকা তিনি চেনেন, কিন্তু দাতা হতেও তাঁর বাধে না। যখন কেনাকাটা করতে যান, দর কষাকষির চূড়ান্ত করে ছাড়েন, তারপর টাকাটা বার করেন।

একদা একই বাড়িতে তিনি থাকতেন চিয়েনের সঙ্গে। কিন্তু চিয়েন-মশাই কখনো তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করেন নি, বরং মাঝে মাঝে নিজের হাতের তৈরী মদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরই জন্য দুজনে জমেছিল ভাল। চিয়েন কবি, তাঁর পেটে আছে কাব্যের আগুল, আর ওয়াঙের পেটে আছে হিসেবের গাদা। যখন তাঁরা কাব্য বা হিসেবের কথা না বলতেন, মুখখানা মদের প্রভাবে লাল হয়ে উঠত, নিজেদের মানুষ বলেই মনে হোত। এই বন্ধুত্বেরই খাতিরে বিয়ের সম্বন্ধ হোলো। ওঁরা বেয়াই হলেন।

কিন্তু চিয়েনদের বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সেজ ওয়াঙ একটু বা পস্তালেন। চিয়েনরা হিসেব কষতে জানেন না, আর আসল কথা হিসেবই নেই তো, কষবেন কি! একটু খোঁজখবর নিয়ে জানলেন, মেয়ের আর যা-ই হোক, শাশুড়ী বৌ-কাট্‌কী নয়। স্বামী-স্ত্রীতেও মনের মিল হয়েছে। আরও একটা কথা। চিয়েনরা গরীব হলেও তাঁদের মান খোয়ান নি। শুধু যে কর্জ করতেই তাঁরা আসেন নি তা নয়, টাকাই তাঁরা চেনেন না। আর তাঁদের ঘরের চোলাই মদে এখনো তেমনি সু-তার আছে। আত্মীয়তা মদের তার নষ্ট করতে পারেনি। তাই আফশোস চেপে রাখলেন ওয়াঙ। মাঝে মাঝে মেয়েকে গোপনে টাকাটা-সিকেটাও দিতে লাগলেন। টাকার সুদ-আসল দুই-ই গেল, কিন্তু এখানে সে হিসেব খতিয়ে দেখতে বসলেন না।

আজ চিয়েনদের বাড়িতে এসেই তিনি বুঝলেন, কফিন তাঁকেই কিনতে হবে। তবু নিজে থেকে কিছু বলবেন না। দেখবেন, ওরা কি বলে। তাঁর টাকাটা যেন অপেরার বিখ্যাত তারকার মতো। তোমাকে তার আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তার আগমনের আগে বাজবে বাজনা। তবে তো তার প্রবেশ।

ন'কর্তা আর রে স্বয়ান এসেছে জয়ঢাক বাজাতে। ওরা ঢাকের বাদ্যি দিয়ে যবনিকা তুলবে। যবনিকা তোলা হোল, ওরাই পাড়লো কথা। সেজ ওয়াঙ্ তখনি রাজি, দুশো ডলারের ভিতরে হলে দেখ, আমি খরচা করব। যদি এক পয়সাও বেশি হয়, আমি পারব না। আর যা দিনকাল পড়েছে, এ সময় কারো হাতেই তেমন নগদ টাকা নেই।

এই বলে তিনি ন'কর্তার সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। ন' কর্তা যা বলেন, তাতেই তাঁর সায় আছে। কিছুক্ষণ আলাপ করেই তিনি বুঝলেন, ন'কর্তা কাজ জানেন, তাঁর টাকাটা বাজে খরচ হবে না। রে স্বয়ানকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না। একে ছোকরা বয়েস, তায় নিরীহ—একেবারে সংসারি বুদ্ধি নেই।

ন'কর্তা চলে গেলেন যোগাড়-যন্তর করতে। রে স্বয়ান আর ইয়ে আলাপ শুরু করলেন, দুজনের মধ্যে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। চিয়েনের নামও তাঁরা করছেন না। তাঁদের আশা, বুড়ো এখনো বেঁচে আছেন, ছাড়া পেয়ে ফিরে এসে আবার সংসারের দায়-দায়িত্ব নেবেন; কিন্তু তাঁর কথা মুখে তাঁরা উল্লেখ করলেন না।

আলাপে আলাপে কি করে দুটি মেয়েমানুষ খেয়ে-পরে বাঁচবেন, সেই সমস্যায়ই তাঁরা এসে গেলেন। হঠাৎ রে স্বয়ানের একটা কথা মনে হোল, ওদের কি কোনো দামী কিছু আছে—যেমন ধরুন ছবি বা দুষ্প্রাপ্য বই? যদি তেমন কিছু থাকে, তাহলে আমরা বরং সেগুলো ন্যায্য দামে বেচবার চেষ্টা করতে পারি। তাহলে কিছুদিন চলবার মতো টাকা পাওয়া যাবে।

ইয়ের চোখ পিট্ পিট্ করছে, তিনি বললেন, আমি তো জানি না। আর যদিই বা থেকে থাকে, এই দিনকালে কে-ই বা সেগুলি কিনবে? আপনি আমি শান্তির দিনের ভাবনা ভাবছি। কিন্তু আজকাল—

চিয়েন-গিন্নিকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয় ?

ইয়ে বললেন, আমার বোনকে আপনি চেনেন না। আমার বোনাইয়ের উপর তার অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি চিয়েনের নামটা এড়িয়েই গেলেন। আমার বোন নিজে সারাদিন উপোস থাকবে, কিন্তু তবু বোনাইকে জোগাবে মদের খরচা। তিনি বই কিনতে চাইলে খোঁপা থেকে রূপোর কাঁটা খুলে তখুনি বেচে দেবে। তাই বলি, ওঁর যদি কোনো দামী জিনিসও থাকে, সে ছোঁবেই না—তা বেচা তো দূরের কথা !

ওঁরা এর পর কি করবেন ?

ইয়ে বহুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এমনি তিনি ভারি কথুকে মানুষ, কিন্তু একেবারে চুপ মেরে গেলেন। এবার আস্তে আস্তে বললেন, আমি এসে ওদের সঙ্গে থাকতে পারি। দেখাশুনোর জন্যে একজন মানুষের তো দরকার হবেই। আমার বোনের চোখ দুটো আপনি দেখেছেন ?

বে স্থয়ান মাথা নাড়লেন।

ওর চোখের ঐ নজর ভাল নয়। ওর স্বামী গ্রেফ্‌তার হয়েছেন, দুই ছেলে মারা গেছে—আমার ভয় হয় উনি কিছু-একটা করে বসবেন। তাই আমার উদ্বেগেরও অন্ত নেই। আমাকে তাই এখানে এসে থাকতে হবে। কিন্তু আরো দু-দুটো মানুষকে খাওয়াব কোথা থেকে বলুন ! যখন দেশ চলে যায় শত্রুর হাতে, তখন তো আত্মীয়-বন্ধুর সম্পর্কটাও থাকে না ; তাছাড়া আমার বোন নিরিবিলিতে থাকতে ভালবাসেন। ধরুন, আট-আটটা ছেলে-মেয়েকে এনে ছেড়ে দিলে ওরা কি আর এই ফুলের কেয়ারী আস্ত রাখবে ! দলে-পিষে-মাড়িয়ে এক কাণ্ড করবে না ! আর চেঁচামেচিতে দেবে কানে তালা লাগিয়ে। সত্যি কথা কি, ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। মন তো তাই আরো খারাপ, কিছু ভেবে উঠতে পারছি না।

এবার কফিন এল—মজবুত কফিন, কিন্তু কুশ্রী। বার্নিস নেই, সবগুলো খুঁত দেখা যাচ্ছে। বড় ছেলেকে একটা পুরাণো পোষাক পরিয়ে কফিনে শুইয়ে দেওয়া হোলো।

সেজ ওয়াঙ্ কফিনটার উপর দুবার তাঁর প্রকাণ্ড হাতখানা দিয়ে চাপড় মারলেন। তাঁর মুখ আরো কালো হয়ে গেছে, চোখ জলছে। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, তুমি শেষে এমনিভাবে চলে যাবে—এ তো বুঝি নি !

চিয়েন-গিন্নির চোখে তবু জল নেই। এবার কফিন বন্ধ করা হবে। ডালাটা বন্ধ করে মারা হবে পেরেক। হঠাৎ উনি ছুটে এসে জামার ভিতর থেকে বার করলেন একতাড়া কাগজ আর ক'খানা ছবি। এগুলি তিনি কফিনের ভিতর রাখলেন। সবাই দেখছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই।

ছেলের বৌ জোরে কাঁদছে। সেজ ওয়াঙ মেয়ের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই—কাঁদে না—কাঁদে না! কিন্তু মেয়ের কান্না তো থামলো না। তিনিও চুপ করে গেছেন, তাঁর চোখেও জল।

সারা খুদে খাটালেরই এ এক পরম দুঃখের দিন। ষোলো জন গরীব-গুরবো মানুষ পাওয়া গেল—শোকের পোষাকও তাদের জোটেনি। ন'কর্তা তাদের নিয়ে কফিন ধরাধরি করে বার করে আনলেন লোকাস্ট গাছের তলায়। এখানে রয়েছে কফিন বয়ে নিয়ে যাবার খাঁচাটা। বড় ছেলের কাঁদবারও ওয়ারিশ নেই। ছেলেপুলে তার হয়নি। তাই বৌ নিজেই এল। তার চুলে চিরুণী পড়েনি, গায়ে একটা পুরু চটের মতো জামা। সে কফিনের আগে আগে যাবে—আত্মাকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কবরখানায়। বৌকে যেন ভূতের মতো দেখাচ্ছে। তার পাশে আছেন সেজ ওয়াঙ। মেয়েকে ধরে আছেন। বাজনদারও আছে ক'জন, ওরা বাজাচ্ছে। ন'কর্তা কাঠি বাজাচ্ছেন, কিন্তু এ বাজনার তাল কাটা চলবে না। বাজনদাররা তারই সঙ্গে সঙ্গত করছে। কাঠির বাজনা যে-সে ব্যাপার নয়। সে যেন বেহারাদের চোখ আর কান। আস্তে আস্তে বাজছে কাঠি। চিয়েন-গিন্নি এবার খচ্চর-টানা গাড়িতে উঠে পড়লেন। রোগা খচ্চর, বুড়ো থুত্থুরে। বেয়ারারা ছুটছে কফিন নিয়ে, তার সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারছে না। চিয়েন-গিন্নির চোখে এখনো জল নেই, অদ্ভুত তাঁর দৃষ্টি। কফিনটার দিকে তাকিয়ে আছেন তো আছেনই। গাড়ির দুলুনিতে মাথাটাও একটু দুলছে।

বুড়ো দাদুর শরীরটা ভাল নেই। তাই তিনি খুদে ধানের কাঁধে ভর দিয়ে নিজের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছেন। বাইরে যাবার সাহসও বুঝি নেই। কেমন যেন তাঁর ভয় করছে! খুদে নিউনিউ বাইরে যেতে চাইছে, কিন্তু তার মা টেনে টেনে রাখছেন।

রে স্থয়ান, খুদে স্থই, সাতস্থর্য, এরাও চলেছে কফিনের সঙ্গে। এক কুয়ানদের বাড়ি ছাড়া, পাড়ার আর সবাই এসে দাঁড়িয়েছে ফটকের বাইরে তারা কাঁদছে। চিয়েনের ছেলের বৌকে দেখে বিধবা মা তো এমন হয়ে গেলেন; মনে হোল এখুনি বুঝি ডুকরে কেঁদে উঠবেন। তাঁকে অনেক করে শান্ত করে তাঁর নাতি বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। শ্রীমতী ওয়েন একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে ভিতরে চলে গেলেন। ন'গিন্নির উপর চিয়েনদের বাড়ি পাহারার ভার, কিন্তু তিনিও খুদে খাটালের মুখ অবধি কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এলেন। এবার ন'কর্তা ধমকে তাঁকে ফেরালেন।

তুঙ চি মেন দরোয়াজার বাইরে চিয়েনদের সমাধি-গুম্ফা। যখন ঢাক-মিনারের কাছে এল শবযাত্রা, সেজ ওয়াঙ চিয়েন-গিন্নির হয়ে বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। রে স্থয়ানের বেশি হাঁটার অভ্যেস নেই। তবু শহরের ফটক পর্যন্ত যাবার তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু ইয়ের প্রস্তাবটা মনে ধরলো। তাঁর রোগা শরীর। এরই মধ্যে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তিনি হাঁফাচ্ছেন। আর কিছুদূর গেলেই মুখ থুবড়ে পড়বেন। পিপিঙ-এর রীতি এই যে, নিকট আত্মীয় শবযাত্রার সঙ্গে কবরখানা পর্যন্ত যাবেন। তাই ইয়া একটু বা দোমনা হয়ে পড়েছিলেন। তিনি একা ফিরে গেলে ব্যাপারটা একটু কেমন বেতরো দেখায়। এবার ন'কর্তার প্রস্তাবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। রে স্থয়ানকে তাই নিজের দলে টেনে নিতে চাইলেন। তাঁর মুখের ভাব-গতিক দেখে রে স্থয়ান রাজি হয়ে গেল।

খুদে স্থই আর সাতস্থর্য ফিরতে নারাজ, তারা শেষ অবধি যাবে।

ইয়ে বেশ মুষড়েই পড়লেন। গাড়ির কাছে এসে বোনের কাছে বিদায় নিলেন। চিয়েন-গিন্নির কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—কফিনটার দিকে তার চোখ। ভাইয়ের কথা শুনলেন কি, শুনলেন না কে জানে। ইয়ে গাড়ির সঙ্গে চলতে চলতে আবার বললেন, বোন, আমি কাল না পারি, পরশুই আসবো, এখন যাই। আরো কি যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু কথা জোগালোনা; চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। গাড়ি চললো এগিয়ে।

রে স্থয়ান আর ইয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। কফিন এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। পথ বিছিয়ে আছে—শহরের পূব দরোয়াজা ধূলোর আস্তরণের

ভিতর দিয়েও ধূ ধূ দেখা যায়। দীর্ঘ—দীর্ঘ পথ। আস্তে আস্তে কফিন চলেছে—দূরে দূরে চলে যাচ্ছে। টেলিফোনের তারের জাল এবার নেমে এসেছে নিচে—মনে হয় ঐ তারের ফাঁস দিয়ে কফিনটাকে বুঝি শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু দূরের ফটকের মিনার তাকে টেনে নিয়ে চলেছে এক অদৃশ্য আকর্ষণে। ফটকের সুড়ঙ্গ হাঁ করে আছে। সে তাকে গিলে ফেলবে, তারপর উগরে দেবে। এমনি করে ও তো রোজই গেলে আর ওগ্‌রায়। মৃতের তো এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

বহুক্ষণ ওরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার চললেন বাড়ির দিকে ; দুজনেই চুপচাপ।

রে স্নুয়ান জানেনা কোথায় সে চলেছে। মাথা নিচু করে চলেছে, ঢাকমিনার ছাড়িয়ে চলে গেল। হঠাৎ সে মুখ তুললো। তাই তো এ কোথায় এলাম ?

ইয়েও যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন, তাইত, আমারও তো এ পথ নয়।

রে স্নুয়ান ফিরে চললো, ইয়েও চলেছেন পিছনে। রে স্নুয়ান ভাবলে, ইয়ে অতি-ভদ্রতা দেখাচ্ছেন। সে তাই বললে, ইয়ে-মশাই, আপনাকে আর আসতে হবে না।

ইয়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে, কামিজের আস্তিনে মুখ পুছলেন ; ঠোঁট তাঁর কাঁপছে। এবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, চি-মশাই আপনার কাছে একটা টাকা হবে ? কিছুটা ময়দা কিনে নিয়ে যেতাম। আট-আটটা ছেলে-মেয়ে ! আবার বুক ঠেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

রে স্নুয়ান তাড়াতাড়ি একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে ইয়ের হাতে গুঁজে দিলে, তারপর ফিরে চললো বাড়ির দিকে।

ষোল

রে স্থয়ান আর ন'গিন্নি অস্থির হয়ে উঠেছেন। আঁধার হয়ে এল, কবরখানায় যারা গিছলো, তাদের এখনো দেখা নেই। ন'গিন্নি ঘরদোর সাফ করে বসে আছেন ওদের জন্য হা-পিত্যেশ করে। ওরা ফিরে এলে বাড়ি গিয়ে একটু গা এলিয়ে দেবেন। তিনি কুঁড়ে হয়ে বসে থাকার মানুষ নন, তাই আবার ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে ঝাঁট দিতে লাগলেন। ঘর দোর এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো ঝেটিয়ে যাচ্ছেন, কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। রে স্থয়ান কতবার বললেন, কিন্তু কান কে দেয়! এই ঝাঁটপাট দিচ্ছেন, টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছেন, এই আবার ঘর-বার করছেন। আর বিড়বিড় করে বকছেন—বুড়ো মিন্সের যত অনাছিষ্টি কাণ্ড! এই যে দেরী হচ্ছে, এর যত দোষ যেন ন'কর্তার।

ডুবন্ত সূর্য মেঘের স্তরে পীচ ফলের ঘন রঙ্ ঢেলে দিলে। সেই সোনালি আলোয় দেয়ালের ধারের ফুলের দলে দলে আলো ঝরে পড়লো। লাল ফুলে লাল আলো যেন জমাট রক্তের দাগ। এবার সূর্যাস্তের মেঘে লাগলো সীসে-ধূসর পোঁচ। সোনা মেঘে ধূসর ফাটল দেখা দিয়েছে। লাল ফুল এখন ঘন রক্তরাগে উজ্জ্বল—এ উজ্জ্বলতা কালো ঝিলিক হানে। আস্তে আস্তে মেঘ ছড়িয়ে পড়লো। সারা আকাশ জুড়ে লাল আর ধূসর পোঁচ। আকাশে যেন ধরে আছে থোকায় থোকায় আঙুর, আপেলের স্তূপ হয়ে আছে। আঙুরের রঙ আরো উজ্জ্বল। ধূসরও নয়, নীলও নয়—এ যেন এক অজানা রঙ। ও রঙ দেখলে দুরু দুরু কাঁপে বুক, এক ভয়ংকর সৌন্দর্যে মন ভরে যায়। লাল আপেলের স্তূপ এবার অগ্নিগোলকে রূপ পেল, ভিতরে ভিতরে তার ঘন রক্তের দাগ ফুটে আছে। তারপর যেমন বাসি ফুল বিবর্ণ হয়ে যায়, ঝরে পড়ে, তেমনি করে হঠাৎ সূর্যাস্ত ম্লান হয়ে গেল। এখন ধূসর ছায়ার মিছিল। আকাশ অন্ধকার। সূর্যাস্ত যেন খসে পড়ছে। চাপড়া চাপড়া সোনালি আলো খসে যাচ্ছে ঝুর্ ঝুর্ করে।

রে স্থয়ান আস্তে ডাকলো, ন'গিন্নি, আপনি যান, বাড়ি গিয়ে একটু জিরোন। সারাদিন খেটেছেন। একটু জিরোনো তো দরকার।

জিরোতে কি দেবে! ঐ বুড়ো-হাবড়াটাই তো যত নষ্টের গোড়া! এখনো ফিরে এল না! না, ন'গিন্নির বাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই, চিয়েন-গিন্নির আসা পর্যন্ত তিনি থাকবেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, ঐ শোন ছেলে, ওরা বুঝি এল!

আর তর সইল না ন'গিন্নির, তিনি ছুটে আঙিনায় চলে গেলেন, হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন।

খচ্চর-টানা গাড়িটা থামলো এসে ফটকে। সেজ ওয়াঙ চেঁচিয়ে উঠলেন, বাড়িতে কি মানুষ জন আছে! একটা আলো নিয়ে এস তো!

রে স্থয়ানও উঠোনে এসেছিল, সে তাড়াতাড়ি আলো আনতে ছুটলো।

রে স্থয়ান আলো নিয়ে এসে দেখলো, ধুলোয় হলদে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, খচ্চরটায় গায়েও ধুলো। লেজ ঝাড়তেও সে পারছে না এত ক্লান্ত। মানুষগুলোও ধুলো মেখে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে।

সেজ ওয়াঙের বাজর্খাই গলা আবার শোনা গেল, এই—তোমরা ওকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এস!

ন'কর্তা, সাতসূর্য—খুদে সুই—সবারই মুখ মাথায় ধুলো বালি, চোখ দুটো শুধু তারই ভিতরে ফুটে আছে। তারা নিঃশব্দে এগিয়ে এল।

রে স্থয়ান আলো তুলে ধরে দেখলে, চিয়েনের ছেলের বৌকে ধরাধরি করে ওরা নামাচ্ছে। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির ভিতরে উঁকি মেরে দেখলে। গাড়ির ভিতরটা ফাঁকা। চিয়েন-গিন্নি নেই। ন'গিন্নি চোখ রগড়াচ্ছেন, কিন্তু ভাল করে ঠাহর করতে পারছেন না।

কি ব্যাপার গো—কি ব্যাপার? হাত তাঁর কাঁপছে।

সেজ ওয়াঙ আবার হুকুম দিলেন, এই পথ ছাড়!

ন'গিন্নি তাড়াতাড়ি সরে যেতে গিয়ে খুদে সুইর ওপর পড়ে গেলেন।

সেজ ওয়াঙ ক্ষণে ক্ষণে গলা চড়াচ্ছেন, হুকুম বেজে উঠছে, এই আলো নিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও! অমন সংএর মত দাঁড়িয়ে থেক না!

রে স্থয়ান তাড়াতাড়ি আলো হাতে এগিয়ে গেল।

ফটক থেকে উঠোন পেরিয়ে ওরা এসে উঠলো ঘরে। সেজ ওয়াঙ এবার চুপ করে মেঝেয় বসে পড়লেন। ষাঁড়ের মতো তাকদ থাকলে কি হবে, তাঁরও যেন দম ফুরিয়ে গেছে।

কি হোল আবার ?

ন'কর্তা তো নুয়েই পড়েছেন, পা বুঝি আর চলে না। কিন্তু শান্ত ভাবটুকু বজায় আছে। তিনি ন'গিন্নিকে ডেকে বললেন, ওগো; তুমি চট করে গিয়ে একটু চিনির পানা করে আন। যদি এখানে উনুনে আগুন না থাকে, বাড়ি গিয়ে করে নিয়ে এস!

ন'গিন্নি তাড়াতাড়ি বললেন, এখানেই উনুনে আগুন আছে। তোমরা তো এসে গরম চিনির পানা চাইবে, তাই উনুনটা ধরিয়েই রেখেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি গা—কি হয়েছে ?

যাও, কাজে যাও! বকবকানির সময় নয়! ন'কর্তা সাতসূর্য আর খুদে সুইব দিকে তাকালেন, বাড়ি গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে আমার বাড়িতে যেও। ওখানেই যাহোক কিছু মুখে দেবে। তারপর গাড়োয়ান কোথায় গেল ?

গাড়োয়ান ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

ন'কর্তা কিছু টাকা বার করে তাকে দিয়ে বললেন, সাঙ্গাৎ, আজ ধকল গেছে বটে তোমার! আর-একদিন তোমাকে ডেকে আনব—এক সঙ্গে ছ'-এক গেলাস চলবে। যতই মিষ্টি কথা বলুন, দরাদরি করে যা ঠিক হয়েছিল তাই-ই দিলেন। একটু বকশিসও করলেন না।

গাড়োয়ান না দেখেই টাকা কোর্তার জেবে পুরে রাখলো। শুধু বললে, আচ্ছা দিনই কাটলো ন'কর্তা! আমি এবার যাই।

ন'কর্তা তাকে বিদায় দিতে আর ফটক অবধি গেলেন না, সেজ ওয়াঙকে ডেকে বললেন, এখন ইয়ে-মশায়ের কাছে খবরটা দিতে কাকে পাঠাবেন ?

আমি কি জানি! আমার হাঁফ ধরে গেছে! সেজ ওয়াঙ তখনো মেঝেয় বসে ধুঁকছেন। তাঁর নাকে হলদে ধুলো লেগে আছে। দেখে মনে হয় যেন সদ্য-ওপড়ানো মাটি মাখা মূলো। ইয়ের কথা এখন কে ভাবে! আমি এখন ছুটতে পারব না বাপু। আমার পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে।

ন' দাদু, কি হয়েছে বলুন ? রে সুয়ান এবার জিজ্ঞেস করলে!

ন'কর্তা আস্তে আস্তে বললেন, হবে আর কি। চিয়েন-গিন্নি কফিনে মাথা ঠুকে মারা গেছেন।

কি—কি বললেন ?

রে স্থয়ান দুঃখিতই হোল। ভারি তার আফশোস, সে কফিনের সঙ্গে কেন গেল না। যদি একটা লোক চিয়েন-গিন্নিকে চোখে চোখে রাখতো, তাহলে তো আর এমনটিই হোত না! আর ইয়ে-মশাই আর সেতো অদ্ভুত আলো দেখেছিল তাঁর চোখে।

চিয়েনের ছেলের বৌ পড়ে আছে। দাঁত-কপাটি লেগে গেছে। ন'গিন্নি গরম চিনির পানা একটু একটু করে তার মুখে ঢেলে দিচ্ছেন। এবার নিঃশ্বাস পড়ছে, মুখ দিয়ে উঠছে অদ্ভুত শব্দ। মেয়ের স্বর শুনে সেজ ওয়াঙ মেঝে থেকে উঠে পড়লেন। আহা যেমন বরাত মেয়ের! এমন বরাতের কথা কি ভাবা যায়! কেউ কখনো শুনেছে! তিনি বাইরের ঘর থেকে ভিতরের ঘরে এসে ঢুকলেন। রাগটা একটু কমেছে। মনে মনে তিনি ঠিক করে নিয়ে বললেন, ওরে, তুই ভাবছিস কেন? তোর বেটা তো রয়েছে, সে-ই সব দেখবে। খোর-পোষের ভাবনা হবে না। যদি যেতে চাস তো এখুনি আমার সঙ্গে চল্। কি—যাবি নাকি ?

রে স্থয়ান সেজ ওয়াঙকে এখুনি ছেড়ে দিতে নারাজ। সে আস্তে আস্তে ন'কর্তাকে শুধালো, মরা কোথায় ?

আরে আমি না থাকলে মহা মুশকিলই হোত। কফিন ছাড়া মরা মন্দিরে কি রাখতে দেয়? তাই সাত তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম পুব দরোজার কাছে। সেখানে একটা দেশলাইয়ের প্যাকিং বাক্স জোগাড় করলাম। ধারেই নিতে হোল। তারপরে এলাম পদ্ম মন্দিরে। শুধু পায়ে পড়তে বাকি রেখেছি, তবে তো দুদিনের জন্যে মরা রাখতে রাজি হলেন। আমরা আসল কফিন তৈরী করে নিয়ে যাব, তবে মরা গোর দেওয়া হবে। বাবাঃ জীবনে এমন ধকল যায়নি!

ন'কর্তা এমনি তো ধীর, গম্ভীর, কিন্তু আজ যেন আর রাশ টেনে রাখতে পারছেন না। তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। এবার হাঁক পাড়লেন, কই গো গিন্নি, এক পিয়ালি চা দাও, গলা যে ফেটে চৌচির হয়ে গেল!

ন'গিন্নি সবই শুনেছেন আড়াল থেকে, তাই মুখ ঝামটা মেরে 'বুড়ো মিন্সে' বলার আর তাঁর সাহস নেই। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, এই যে দিচ্ছি!

রে স্থয়ান এবার বললে, সেজ ওয়াঙকে এখন ছাড়া হবে না। উনি আর-একটুক্ষণ থাকুন।

সেজ ওয়াঙ ভিতরের ঘর থেকে বাইরে এলেন। তিনি কথাটা শুনেছেন।

কেন আমাকে ছাড়বে না কেন শুনি? ব্যাপারটা কি? আমি কি কারো কিছু ধারি নাকি? এই মাত্র জামাইকে গোর দিয়ে এলাম, এবার কি মেয়ের শ্বাশুড়ীর গোর দেওয়ার খরচাও আমাকে করতে হবে? যাও, ঐ ইয়ে-পণ্ডিতের কাছে যাও। উনি তো ওর আপন বোন।

রে স্থয়ান রাগ চেপে হাসি মুখে বললেন, দেখুন সেজোখুড়ো, ইয়ে-মশাইকে কাটলেও এক ফোঁটা রক্ত বেরুবে না। উনি আমার কাছ থেকেই এইমাত্র পাঁচ টাকা ধার নিলেন। উনি গোর দেয়ার খরচ করবেন—আপনি ভাবলেন কি করে?

আমি তো ওকে পাঁচটা পয়সাও ধার দিতাম না! সেজ ওয়াঙ বসে পড়ে বললেন, এক হাত দিয়ে পায়ে হাত বুলাচ্ছেন, আর-এক হাত দিয়ে মুখের ধুলো ঝাড়ছেন।

রে স্থয়ান এবার সোজাসুজি বললে, উনি গরীব মানুষ। আর এই দিন-কালে মাস মাইনেটাও লোকে ঠিকমতো পাচ্ছে না। তার উপর ওর আবার আট-আটটি ছেলেপুলে। ওর সামর্থ্য কি? তাই খুড়ো, আপনাকেই এ দায় উদ্ধার করে দিতে হবে। আপনি ছাড়া হবে না।

ন'গিন্নি এক কেৎলি গরম জল নিয়ে এসে সবাইকে পেয়ালায় পেয়ালায় চা ঢেলে দিলেন। ন'কর্তা উবু হয়ে বসেছেন মেঝেয়। সেজ ওয়াঙ এখনো বেঞ্চের উপর বসে আছেন। দুজনে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন ঘনঘন। চায়ের উষ্ণতা যেন ওয়াঙের মনের জমাট বরফের স্তূপ গলিয়ে দিলে।

ঠিক আছে। চি-মশাই ইয়ে-পণ্ডিতকে নিয়ে আসুন! আমি টাকা-কড়ি যা লাগে দেব, কিন্তু ওকে খবর দিয়ে আসুন। বুদ্ধিমান মানুষ কখনো অন্ধকারে টাকা ঢালে না।

রে স্থয়ান ক্লান্ত। তবু সে ইয়ে-মশাইয়ের খোঁজে যাবে ঠিক করলো।

চাঁদ এখনো ওঠেনি। ফটকের সামনেটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ফটক থেকে দু-এক পা এগুতেই রে স্থয়ান চমকে উঠলো। কিসের উপর যেন পা পড়ছে।

গোল জিনিস-আবার লাঠির মতো লম্বা-তাও অতো শক্ত নয়—নরম। পাখানা সে সরিয়ে নিলে। বুঝি বা সাপ! কিন্তু এ অঞ্চলে তো এত বড় সাপ নেই। তাহলে?

হঠাৎ যেন লম্বা জিনিসটা নড়ে উঠলো। একটা গোঙানির শব্দ।

মার, মার! আমার কিছু বলবার নেই!

রে স্থয়ান স্বর শুনে চিনলো। কে—চিয়েন খুড়ো!

আর সাড়াশব্দ নেই। রে স্থয়ান নুয়ে পড়লো। চোখ চেয়ে আছে অন্ধকারে। খুঁজছে। এবার সে দেখতে পেল, চিয়েন মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। ধড়টা ফটকের ভিতরে, পা দুটো বাইরে। রে স্থয়ান হাঁতড়ে গিয়ে হাতখানা ধরলো। কোমল হাত, কিন্তু বড় রোগা। আর কি ঠাণ্ডা! বাড়িতে সবাইকে সে চেঁচিয়ে ডাকলো, ওয়াঙ খুড়ো, ন'দাদু, আপনারা শীগ্গীর আস্থন!

ওঁরা স্বর শুনে ছুটে এলেন। সেজ ওয়াঙ এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হোল আবার?

আস্থন, শীগ্গির আস্থন—চিয়েন খুড়োকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে হবে। রে স্থয়ান অধীর হয়ে উঠলো।

আরে কে—আমার বেয়াই নাকি? ওয়াঙ ছুটে এসে রে স্থয়ানের প্রায় ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

আহা বেয়াই, খুব সময়ে এলে যাহোক! তিনি চিয়েনের পা দুটো ধরলেন।

ন'কর্তা হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে মাথাটা তুলে নিলেন।

ঘরে এসে ওঁরা মেঝেয় নামিয়ে রাখলেন চিয়েনকে। সত্যিই চিয়েন। কিন্তু আগের মতো তো নয়।

চিয়েনের গোলগাল মুখখানায় মাংস বলতে কিছু নেই। শুধু যেন চামড়া ঝুলে আছে। তাঁর চুল লম্বা, তাতে কাদা-মাটি-খড় লেগে লেগে আছে। কপালের চামড়া রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে, কপালে পড়েছে ভাঁজ। চোখ বোজা; তাঁর মুখে একটাও দাঁত নেই। গায়ে শুধু একটা পাতলা জামা। তাও আবার ফালি ফালি করে ছেঁড়া। কোথাও বা ফালি-গুলো ঝুলে আছে, কোথাও গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। আর সারা জামা

কাদা আর রক্তে মাখামাখি। পায়ে জুতো নেই—কাদা আর ময়লা জমে জমে আছে। আবার ফুলেও উঠেছে। দেখে মনে হয়, ওরা যেন পা নয়, দুটো ছোটেখাটো শুয়োর—এইমাত্র হাওড়ের পাঁক থেকে উঠে এসেছে।

সবাই তাকিয়ে আছে। করুণা আর ক্রোধ মোচড় দিয়ে উঠেছে বুকে; বিস্ময়ের আমেজও বুঝি আছে।

ন'গিন্নি এক পেয়ালা গরম পানা এনে হাজির করলেন। রে স্থ্যান অতি সন্তর্পণে বুড়োর মাথা তুলে ধরলো। ন'গিন্নি আস্তে আস্তে খাইয়ে দেবেন।

চিয়েনের ঠোঁট নড়ছে, গোঙাচ্ছেন। ন'কর্তা একটা বেতের চেয়ার নিয়ে এলেন ঘর থেকে। চিয়েনকে তাঁরা ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। সেজ ওয়াঙ হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। এতক্ষণ ভাল দেখা যায়নি পিঠখানা, এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কামিজটার কিছুই নেই—শুধু ফালি আর ফালি। রক্ত থানা থানা হয়ে আছে—ফালিগুলো আটকে আছে, কোথাও বা ক্ষতমুখ দিয়ে ঝরছে রক্ত। রক্তের লাল ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আবার কতগুলো ক্ষতমুখ কাল্‌চে মেরে আছে, ফুলে আছে। একটার মুখ থেকে বেরুচ্ছে সাদা পুঁজ। ফালি ফালি কাপড়—কালচে আর দগ্‌দগে লাল ক্ষত—সব মিলে এ যেন এক ঠাস বুনোনি। বহুদিন লেগেছে এ কারিকুরিতে। জাপানী পুলিশ বাহাদুরী দেখিয়েছে বটে!

সেজ ওয়াঙ চেঁচিয়ে উঠলেন—বেয়াই, বেয়াই, এমন দশা কে করলে?

রে স্থ্যান বাধা দিলে, এখন থামুন! ন'দাদু যান, গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসুন!

আমার কাছে কিছু গুঁড়ো ওষুধ আছে, যাই নিয়ে আসি। ন'কর্তা উঠে পড়লেন।

না—না গুঁড়ো ওষুদের কর্ম নয়। আপনি একজন বিদেশের পাশ-করা ভাল ডাক্তার নিয়ে আসুন। সার্জনই চাই।

ন'কর্তার গুঁড়োর ওপর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু তর্ক করতে সাহস হোল না। তিনি কোনরকমে পা টেনে টেনে বেরিয়ে গেলেন। পা চালাবার আর যেন শক্তি নেই।

আর-এক পেয়ালা চিনির জল করে আনলেন ন'গিন্নি। একটু খেতেই চিয়েনের পেটে শব্দ হোল। চোখ এখনো বোজা, শুধু ফোকলা মুখখানা একটু নড়ে উঠলো। কি যে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কেউ বুঝতে পারলো না।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। এবার চিয়েনের স্বর স্পষ্ট হয়ে উঠলো, মার—আবার মার! আমার তো কিছু বলবার নেই—কিছুই বলবার নেই! বলছেন আর হাত দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরছেন, যেন ব্যথা রাখছেন চেপে। হঠাৎ তিনি চোখ খুললেন। এ চোখ যেন মন্দিরের দেবতার—তেমনি আয়ত আর উজ্জ্বল—কিন্তু পাথরের চোখ। দৃষ্টিশক্তি তার নেই।

সেজ ওয়াঙ তার পাশে মেঝেয় বসে পড়ে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে বললেন, বেয়াই—দেখ—চোখ চাও—আমি এসেছি।

রে স্যুয়ান ডাকলো, চিয়েন খুড়ো—এই যে আমি রে স্যুয়ান! চিয়েন চোখ বুজলেন আবার চোখ খুললেন। কেমন যেন দৃষ্টি—সে-দৃষ্টিতে স্বচ্ছতা আছে, নেই আলো, নেই ভাব-ব্যঞ্জনা। কি যেন ভাবছেন। তবু মনে আনতে পারছেন না।

ভিতরের ঘরে ন'গিন্নি চিয়েনের ছেলের বৌকে বললেন, লক্ষ্মীটি উঠো না। শুয়ে থাক, যদি না শোন, আমি এখুনি উঠে যাব।

চিয়েনও যেন কেমন হয়ে গেছেন। তাঁর চোখ বোজা, মাথাটা এক-পাশে হেলে পড়েছে, কি যেন কান পেতে শুনছেন। ভিতরের ঘরে স্বর শুনে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওঃ এবার তিন নম্বরের পালা! তিন নম্বর ভয় পেও না! ঠোঁট কামড়ে যদি ছিঁড়েও যায় সেওভি আচ্ছা!

ছেলের বৌ ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কেঁদে উঠলো, বাবা!

রে স্যুয়ান ভাবলে, তার স্বর আর শোকের পোষাক দেখে চিয়েন হয়তো খানকটা ঠাহর করতে পারবেন, কিন্তু তাঁর চোখে কিছুই মালুম হোল না।

বেতের চেয়ারে হাত রেখে বৌ অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। চিয়েন হাতে ভর দিয়ে মেঝে থেকে বুঝি উঠতে চেষ্টা করলেন। রে স্যুয়ানও সুযোগ বুঝে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিতে গেল। কিন্তু চিয়েন পাগলের তাকদ ফিরে পেয়েছেন। তিনি উঠে পড়লেন। মনে হোল, তাঁর বসা

চোখ কোটর থেকে ঠিকরে পড়ছে। তিনি বলতে লাগলেন, এবার মনে পড়েছে! ওর নাম কুয়ান। হাঃ হাঃ হাঃ! ওকে আমি বলব, দেখ, দেখ, আমি মরিনি! আর একবার চেষ্টা করে তিনি দাঁড়ালেন। রে স্ুয়ান তাঁর সুমুখে, কিন্তু তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। শীর্ণ গাল দুখানা কেঁপে উঠলো, পেছু হঠেই গেলেন। কে তুমি? কে তুমি? আমাকে কি বৈদ্যুতিক শক্ দেবে? মাথা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন।

চিয়েন খুড়ো, আমি রে স্ুয়ান। আপনি আপনার বাড়িতে ফিরে এসেছেন।

চিয়েনের চোখ দুটি যেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো—খাঁচায়-পোরা বাঘ। রে স্ুয়ানের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু সে কে চিনতে পারলেন না।

সেজ ওয়াঙের মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, বেয়াই, আপনার স্ত্রী আর ছেলে মারা গেছে। তাঁর আশা, চিয়েন এই শোক সংবাদ শুনে হয়তো এক ধাক্কায় বর্তমানে এসে পৌছবেন।

সেজ ওয়াঙ কি বলছেন চিয়েন বুঝতেই পারলেন না। তাঁর ডান হাতের আঙুল দিয়ে টিপে ধরেছেন কপাল, যেন কি মনে করতে চেষ্টা করছেন। এবার এগিয়ে চললেন। ফোলা পা তুলতে পারছেন না, কষ্টই হচ্ছে, আবার তুলে কোথায় যে ফেলবেন তাও যেন জানেন না। কয়েক পা গিয়েই মনটা তাঁর ভারি খুশি হয়ে উঠলো। তাইত, ভুলতে কি পারি? আমি যাব, ঐ কুয়ানের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াব। বলতে বলতে তিনি এগিয়ে গেলেন। কষ্টই হচ্ছে, মনে হয় পায়ে যেন বেড়ি বাঁধা।

রে স্ুয়ান কিছু ভেবে পেল না, তাই সেজ ওয়াঙের ফন্দিটাই তার যুতসই মনে হোল। কিন্তু সেটাও ভেস্তে যেতে দেখে সে ভাবলে, যদি চিয়েন কুয়ানের সঙ্গে মোলাকাৎ করতেই যান, তাহলে না থামালেও চলবে। সে তাই গিয়ে বুড়োর হাত ধরলো।

সরে দাঁড়াও! চিয়েন কারো সাহায্য চায় না। সরে দাঁড়াও! কেন ধরতে এসেছ! আমি পারব, যেতে পারব। বধ্যভূমিতে যাবার শক্তিও আমার আছে।

রে স্থয়ান কি আর করবে, পেছনে পেছনে চললো। সেজ ওয়াঙ আর তাঁর মেয়েও পেছু নিলেন।

কুয়ানদের ফটকের কাছে আসতে ক'বার যে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলেন চিয়েন, তার গোণা-গুণতি নেই। সেজ ওয়াঙ আর রে স্থয়ানের শুধু ভয়, কখন তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

কুয়ানদের বাড়ির ফটক খোলা। ক'বার ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করলেন চিয়েন, কিন্তু সিঁড়িতে ওঠা তো সম্ভব নয়। তাঁর ফোলা পা আর নড়ে না।

সেজ ওয়াঙ বেয়াইকে ধরে তুলে দিলেন ভিতরে।

কুয়ানরা দুজন অতিথির সঙ্গে তাস খেলতে বসেছেন। একজন মেয়ে-মানুষ আর একজন পুরুষ অতিথি। পুরুষটির জাঁদরেল চেহারা, দেখে মনে হয় সমর-নায়কদের তাঁবে সে কর্নেল বা জেনারেলই ছিল। মেয়েমানুষটির বয়েস বছর তিরিশের উপরে। দেখে মনে হয় এক সময়ে ছিল বেশ্যা, এখন বিয়ে-থা করে ঘরকন্না করছে। লোকটি ছোটখাটো একজন সমরনায়ক। মেয়েমানুষটি তার রক্ষিতা। তিয়েনসিনেই সে থাকতো, সম্প্রতি এসেছে পিপিং-এ। গুজব শোনা যাচ্ছে, এই লোকটাই নাকি গোয়েন্দা দপ্তরের বড়কর্তা হবে। তার জন্যেই কুয়ানরা তাকে ভোজে ডেকেছেন, তার রক্ষিতাকেও সঙ্গে আনতে বলেছেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে এবার তাস পেতে বসেছেন। লোকটার নীতিজ্ঞানের বালাই নেই। টেক্কা, সাহেব, কি বিবি হাতে এলেই সে দাগ দিয়ে রাখছে। তারপর বেঁটে দেবার সময় নির্লজ্জের মতো বলে উঠছে, আপনার হাতে টেক্কার জোড়া উঠেছে। তাস বিলি শেষ করে সে বাকি তাসগুলো উল্টে-পাল্টে দেখছে। ওর মন যেমন কুঁচুটে, তেমনি ওর হাত। গোপনে কাউকে ঠকাতেও পারে না। সোজাসুজি ঠকায়, পুরাণো সমর-নায়কদের হাল-চাল ওর বেশ রপ্ত।

কুয়ানরা স্বামী-স্ত্রী পাকা খেলোয়াড়, এমন ঠকানো তাঁরা ইচ্ছে করে কেন বরদাস্ত করবেন! কিন্তু আজ তাঁরা একেবারে ঠিক করে বসে আছেন, এই লোকটার কাছে এক কাঁড়ি টাকা হারলেও মুখ বুজে সয়ে যাবেন। আজ বাদে কাল লোকটা হবে গোয়েন্দা দপ্তরের বড়কর্তা। তাই প্রভাতপদ্ম যত হারছেন, তত চাঙা হয়ে উঠছেন। মাঝে মাঝে মেয়েমানুষটির দিকে

চোখ ঠারছেন, চোখ মারছেন। বড় লঙ্কার কিন্তু এতটা সয়না। তাই তিনি মাঝে মাঝে রাগ চেপে রাখতে পারছেন না। মুখের ফুস্কুড়িগুলো এই লাল হয়ে উঠছে, এই কালচে মেরে যাচ্ছে। প্রভাতপদ্ম আবার পায়ের জুতোর ডগাটা দিয়ে ঠেলে ঠেলে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছেন। অতিথিদের চটালে তো চলবে না। আখের যে ওদের হাতে।

প্রভাতপদ্ম দরজার মুখোমুখি বসেছিলেন, তাই চিয়েনকে তিনিই প্রথম দেখতে পেলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হাতের তাস ফেলে তিনি উঠে পড়তে গেলেন।

বড় লঙ্কা শুধালেন, কি গো তোমার কি হোল? কুয়ান জবাব দেবার আগেই তিনি দেখলেন, ওরা এগিয়ে আসছেন। খেঁকিয়ে উঠলেন, কি চাও? তারপর চিয়েনকে দেখে থ মেরে গেলেন। হাতের তাস খসে পড়ে গেল।

সমরনায়কও দেখেছে, কিন্তু খেলায় সে মত্ত। সে বললে, ওহে কুয়ান, খেল, খেল!

সামনে চিয়েন এসে দাঁড়ালেন। প্রভাতপদ্ম দেখছেন আর তাঁর ঠোঁট নড়ছে। যেন গুরুমশায়ের সুমুখে পোড়ার মতো। কি বলবেন আগে আউড়ে নিচ্ছেন।

সেজ ওয়াঙ বেয়াইয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

রে সুয়ান কামরায় ঢুকবে না ভেবেছিল, কিন্তু নিজেকে সে ভীরুই ভাবলে। আস্তে আস্তে সেও ঢুকে পড়লো।

প্রভাতপদ্ম রে সুয়ানকে দেখে হাত তুলে অভিবাদন জানাতে গেলেন, কিন্তু হাত উঠলো না। স্তব্ধ হয়ে বসে পড়লেন।

এসব কি কাণ্ড! হুঙ্কার ছাড়লো গোয়েন্দা বিভাগের হবু কর্তাটি।

চিয়েন আরো সামনে এগিয়ে এলেন, ফিরে এসে কাউকেই তিনি চিনতে পারেন নি, কিন্তু এবার প্রভাতপদ্মকে চিনলেন। বহুদিন ধরে মুখস্থ কবিতার মতো ঝরে পড়লো তাঁর কথা। এ যেন ঝরণা, উৎসমুখ খুলে গেছে, ঝরঝরিয়ে ঝরছে। শ্রীযুত কুয়ান, আপনি ভীত হবেন না। আমি একজন অসহায় কবি। বল প্রয়োগ করতে জানি না। তবু এসেছি, আপনাকে দেখাতে এসেছি, আমি এখনো মরিনি। জাপানীরা মারার কারিগর, কিন্তু আমার অস্থি চূর্ণ করে দিলেও, মাংস ছিঁড়ে ফেললেও, আমার

মন তো তারা বদলাতে পারেনি। আমার মন অটুট রয়েছে, চীনে মানুষের মনই রয়েছে। শুনুন, আপনাকে একটা কথা শুধাই। আপনার মন কোন্ দেশে—সে কি চীনে আছে? তার জাত কি শ্রীযুত কুয়ান? অনুগ্রহ করে আমার কথার উত্তর দিন।

কথা শেষ করে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন; টলছেন।

রে স্বয়ান তাড়াতাড়ি তাঁকে গিয়ে ধরলো।

প্রভাতপদ্ম চুপচাপ, শুধু ঠোঁট চাটছেন। চিয়েনের চেহারা, তাঁর স্বর তাঁকে একটুও গলাতে পারে নি। তাঁর শুধু ভয়, চিয়েন বোধ হয় ছুটে এসে তাঁর টুঁটি টিপে ধরবেন।

এবার হবু কর্তাটি বললে, শ্রীমতী কুয়ান, এসব কি ব্যাপার?

বড় লঙ্কা চিয়েনের কথার মর্ম বুঝতে পেরেছেন। চিয়েন লড়তে আসেন নি, আর লড়তে এলেই বা ডর কিসের! গোয়েন্দা দপ্তরের হবু কর্তাটি তো পাশেই আছেন। তাই তিনি একটু জোর ফলাতে গেলেন, হাঙ্গামা বাঁধাতে এসেছে ওরা! যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও!

সেজ ওয়াঙ-এর চৌকো মাথা আর লালচে নাক চক্‌চক করে উঠলো। তিনি লম্বা পা ফেলে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, কে বেরিয়ে যাবে? দেখি! প্রভাতপদ্মের গলা তিনি টিপে ধরে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন। প্রভাতপদ্ম হুড়মুড় করে গিয়ে চেয়ার নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কি, তুমি বাড়ি বয়ে এসে মারছ? বড় লঙ্কা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সমর-নায়কের দিকে সাহায্যের জন্য তাকালেন।

সমর-নায়ক উঠে এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রক্ষিতাটিও ইঁদুরের মতো গিয়ে লুকিয়েছে।

হান-এর সন্তানরা মেয়েমানুষের সঙ্গে লড়েনা। সেজ ওয়াঙ এই বলে প্রভাতপদ্মকে তুলে আনলেন। তিনি তখন কচ্ছপের মতো হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন। বড় লঙ্কা পথ থেকে সরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে, ওয়াঙ হাত তুললেন, হাতখানা গিয়ে চটাস্ করে পড়লো বড় লঙ্কার গালে। দুটো তাঁর দাঁত খসে পড়লো। রক্ত ঝরতে লাগলো মুখ থেকে। তিনি হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে আছে এস, মেরে ফেললে গো!

যদি চেঁচামেচি কর তো মেরেই খুন করে ফেলব!

বড় লঙ্কা মুখ চেপে ধরে আছেন, টু শব্দটি করবারও তাঁর সাহস নেই। এক পাশে সরেও গেলেন। বাইরে গিয়ে পুলিশ ডাকাই তাঁর ইচ্ছে, কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে, পুলিসগুলোও ঠুঁটো হয়ে বসে আছে। দেশ যে দখল হয়ে গেছে, আর কি সুযোগ-সুবিধে তেমন মিলবে! বড় লঙ্কাও দেশের জন্য একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

সমর-নায়ক আর তার রক্ষিতা পালাবার পথ খুঁজছে। এদিকে সেজ ওয়াঙ ভাবছেন, ওরা বুঝি দলবল ডাকতে যাচ্ছে, তাই চেঁচিয়ে উঠলেন, এক পা নড়বেনা বলছি!

লড়াই থামাবার রে সুয়ানের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। কিন্তু তার ভয়, চিয়েন আবার মূর্চ্ছা না যান। সে চিয়েনকে দু-হাত দিয়ে ধরে সেজ ওয়াঙকে বললে, থাক্, থাক্! এবার চলুন যাই!

সেজ ওয়াঙ কিন্তু নাছোড়, টেবিলের চারদিকে ঘুরছেন আর বলছেন, আমি ওদের একটু সমঝে দিয়ে যাব। ভয় পেওনা। হাড়-গোড় না ভেঙে কি করে লোককে পিটতে হয় তা আমি জানি।

প্রভাতপদ্ম চটপট টেবিলের নিচে সেঁধিয়ে গেছেন। সেজ ওয়াঙ তার একখানা পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে বার করে আনলেন। একটা মরা কুকুর টেনে ভাগাড়ে ফেলে দিচ্ছেন এমনি তার ভাবখানা।

প্রভাতপদ্ম মুষ্টিযুদ্ধের নীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। আর উপায় না দেখে সেজ ওয়াঙের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনি আমার বাবা, আমাকে মারবেন না!

সেজ ওয়াঙ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। মারবার আর পথ নেই। প্রভাতপদ্ম তাঁকে বাপ বলে ডেকেছে, আর তো তাকে মারা যায় না। লালচে নাকখানা ঘসে ঘসে আরো লাল করে তিনি হতাশ হয়ে বললেন, যা বেটা, এবার অল্পে অল্পে পার পেয়ে গেলি! এবার বসে পড়ে চিয়েনকে কাঁধে তুলে নিয়ে রে সুয়ানকে বললেন, চল যাই! দরজার বাইরে এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সেজ ওয়াঙ, থাকি নিউ স্ট্রীটে। যখন হয় আমার ওখানে যেও, আমি আদর করেই বসাব, চা খাওয়াব।

সতেরো

ধীরে ধীরে সেরে উঠলেন চিয়েন। এখনো রাতদিন ঘুমোন, জেগে থাকেন খুবই কম। খিদে-তেষ্টা পেলে বোঝেন। রে স্যুয়ান তার ফার-কোটটা গোপনে একদিন দোকানে গিয়ে বাঁধা দিয়ে ক'টা মুরগীর ছানা কিনে নিয়ে এল। রোগীর জন্য সুরুয়া হবে।

সে জানেনা—শীতে আবার কোটটা ছাড়িয়ে আনতে পারবে কিনা। যাকগে শীতে না হয় গায়ে ফারকোট না-ই উঠবে, চিয়েন সেরে উঠলেই সে খুশি হবে।

চিয়েনের ছেলের বৌ এখনো কেমন রোগা, মুখখানাও কেমন শুকনো। ন'গিন্নি তাকে একটু যত্ন-আত্তি করবেন ভাবেন, কিন্তু বৌটা একেবারে রাজি নয়। নিজের অসুখের ভাবনা তো ভাবেই না আবার শ্বশুরের সেবাও করে।

সেজ ওয়াঙ চায়ের দোকানে যাবার পথে রোজ বেয়াই আর মেয়েকে একবার দেখা দিয়ে যান। চিয়েন এখন খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, তবু কাউকে চিনতে পারেন না। তাই সেজ ওয়াঙ যখনি খপর করতে আসেন—চিয়েন ঘুমোন আর জেগে থাকুন—তিনি বিছানার কাছে গিয়ে একটু মাথা নাড়েন। বেয়াইয়ের সঙ্গে কথার আশা তো নেই-ই, মেয়ের সঙ্গেও তেমন কথা হয় না। কি-ই বা বলবেন। রাঁড়ি মেয়ে তো রাঁড়িই থাকবে, শত হলেও সধবা হবে না। তাই দুঃখ করে ফায়দাটা কি! তবে যখন বোঝেন, মেয়ের হাতে টাকাকড়ি নেই, তিনি দুটি কি তিনটি টাকা রোগীর বিছানার উপর রেখে তাঁর মেয়েকে বলেন, বিছানার ওপর টাকা রেখে গেলাম রে। এমন তাঁর স্বর, মনে হয় যেন পৃথিবীময় আকাশবাণী ঘোষণা করছেন।

যখনি চিয়েনদের বাড়িতে ঢোকেন বা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান, তিনি কিছুক্ষণ ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি এই-ই দেখাতে চান যে, কুয়ানদের তিনি তোয়াক্কা রাখেন না! তারা দেখুক, যা করবার করুক! ওদের বাড়ির কাউকে না দেখলে তিনি জোরে জোরে দু-একবার কেসে ওঠেন। খুদে পাটালের ছেলেমেয়েরা ওর কাসবার ঢঙটা রপ্ত করে নিয়েছে। কুয়ান যখন পথ চলেন, তাঁর পেছনে গিয়ে ওরা অমনি করে কেসে ওঠে।

তাই বলে কুয়ান যে বাড়ির ভিতরে বসে থাকেন তা নয়, তিনি এখনো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই বড় বড় চাকরীর হালহদ্দ জানছেন। তিন-তিনটে চাকরীর সড়ক আছে। একটা নগরের সরকার। কিন্তু নগরের সরকারে তিয়েনসিনের দলের প্রভাবই বেশি। দুই নম্বর হচ্ছে, নব জনসংঘ, সরকারের এ দপ্তরটা একেবারে হালফিল সৃষ্টি হয়েছে। এখনো গায়ে তার বারুদের গন্ধ। এটা প্রচার দপ্তর। জাপ সেনা-বাহিনীর 'সহৃদয়তা' প্রচারের ভার এরই উপর। নিজেরা চীনকে যে কসাই-খানা করে তুলছে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে, তাকেই ঢাকবার জন্যে এ দপ্তর। কিছুটা ঢাকাও বুঝি পড়ছে। যার ক্ষমতা আছে, বুদ্ধি আছে, সে-ই এ দপ্তরে ঢুকতে পারে। আর তিন নম্বর সড়ক হচ্ছে, গোপন আন্দোলনের বুড়োদের নেক-নজরে পড়া। এরা রাজনীতির ধার ধারেন না। নিজেদের আর সাঙ্গো-পাঙ্গদের নিরাপত্তা খোঁজেন। এরা জাপানীর শত্রুও হতে পারেন, কিন্তু জাপানীরা যদি সুযোগ দেয় তো তাদের দলেই ভিড়ে যাবেন, দরকার হয়তো তাদের হাতে হাত মিলিয়ে কাজও করবেন। এঁদের বড় চাকরীর দরকার নেই, শত্রুর উপদেষ্টা হয়েই এঁরা খুশি। এঁদের ক্ষমতাও অগাধ। পোক্ত বনেদের উপর তার ভিত্।

প্রভাতপদ্ম অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলেন নব জনসংঘেই তিনি ঢুকে পড়বেন। এই নতুন সংঘটার কাজ কি, তা নিয়ে মাথাও ঘামালেন না। শুধু এইটুকু বুঝলেন, জাপানীদের তিনি পয়লা নম্বরের সহযোগী হতে পারবেন। পীচ-মঞ্জরীর কাছ থেকে দু-একটা অপেরার গান শিখেছিলেন তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে দেবেন। প্রচারে প্রচারও হবে, ওদিকে বরাতের সড়কও খুলে যাবে। এই দিকেই লেগে পড়লেন। ক'দিন ঘুরেও তেমন সুবিধে হোল না, তবু দমলেন না কুয়ান। রে ফেঙকেও তিনি ছুটো পথ বাত্‌লে দিলেন। রে ফেঙ্‌-এর রুক্ষ মুখখানায় একটু লালচে আভাই দেখা দিল। সে ভাবতেও পারেনি যে, কুয়ানের এতটা দূরদৃষ্টি আছে, এত তাঁর ক্ষমতা। কিন্তু কুয়ান তাকে নব জনসংঘ-এর কথা বলেন নি, রে ফেঙকে ওখানে টেনে এনে প্রতিযোগিতা বাড়াতে তিনি রাজি নন। কোথায় প্রাণ খুলে দিতে হবে, কোথায় বা মুখটি বুজে থাকতে হবে, তা তাঁর জানা।

পশ্চিম শান্তির সড়কে নব জনসংঘের পত্রিকার আফিস। এখান থেকে একদিন ফানুস ওড়ানো হোলো আকাশে। ফানুসের নিচে একটা ঝাণ্ডা, তাতে বড় বড় হরফে লেখা : পাওতিঙ-এর পতনের স্মরণে।

নব জনসংঘ সুযোগটা ছাড়লেন না। জাপানীরা চুপচাপ থাকলেও নব জনসংঘ ছাড়বেন কেন। চীন আর জাপানে তাঁরা প্রভেদ জানেন না। যার কাছে ভাল খাওয়া-পরা পাবেন, তারই তাঁরা দাস। তাঁদের জাতীয়তাবোধ যেন মাছি বা ছারপোকার সামিল। তাঁরা মস্ত এক মিছিলের তোড়জোর করলেন। আর আর দলগুলোকে টেনে আনা শক্ত হবে বলে, ওরা ছাত্রদের দলে টানলেন। যত মধ্যশিক্ষা আর নিম্নশিক্ষা ইস্কুলের ছাত্র আছে তাদের নিয়ে মিছিল বেরুবে, এই-ই ঠিক হোল।

রে ফেঙ খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। আগে যখনি আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবরা উৎসব করেছেন, সে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। এমন কি শোকের ব্যাপার হলেও সে ছুটে গেছে, গিয়ে পান ভোজন করেছে, দেখেছে, উপভোগ করেছে। মেয়েরা শোকের সাদা পোষাক পরলে ঢের বেশি সুন্দর দেখায় এই তার মত। শোকের অনুষ্ঠানে গিয়ে তাই তার চোখ বারবার পড়েছে মেয়েদের দিকে, মদ আর খাবারের দিকেও পড়েছে ঝোঁক। এসব ঝোঁক মিটে গেলে সে কান পেতে রয়েছে যাতে পুরুতদের মন্ত্রের উচ্চারণে খুঁত ধরতে পারে। এই তার স্বভাব। বাড়িতে এসে এসব আবার ফলাও করে তার বলাও চাই। শোকের ঘটা অন্যে করবে, কিন্তু উপভোগের ব্যাপারটা তার নিজের। দুটোর ভিতরে সে বেশ একটা প্রভেদ রেখে চলেছে। কিন্তু তার মতো মানুষও দেশের এই পতনের উৎসবে যেন লজ্জাই পেল। আর যেই সে পথে পাঁচরঙা ঝাণ্ডা দেখলে, ট্রামে ট্রামে দেখলে দেবদারু পাতার মালা আর নানারঙের নিশান, তার নিজেরও মনে হোল, শোকের মিছিল চলেছে—আর এ শোক দেশের মৃত্যুর শোক। দেশ তো যেন একটা বৃহৎ পরিবার—সেও সেই পরিবারেই একজন। কিন্তু অনুভূতি তো এক লহমার—ক্ষণিকের উত্তেজনাই বুঝি সে নিয়ে এলো।

রে ফেঙ যে ইস্কুলের ম্যানেজার, সেখানে তার একজন সহকর্মী আছে। তার নাম ল্যান, আর লোকে তাকে ডাকে, রক্তসূর্য। ইস্কুলে আসতেই

লোকটা তাকে ধরে বসল, ফেঙ, তোমাকে এই মিছিলে সাহায্য করতেই হবে। সে বেশ পেড়াপীড়িই করলে।

ল্যান ইস্কুলের একজন মাস্টার, চীনা ভাষা পড়ায়। কিন্তু হেড-মাস্টারের চেয়ে তার দাপট বেশি। সে একজন লেখক। প্রবন্ধ বা কবিতা সে আধুনিক ধরণেই লেখে। তার চেহারার মতোই সেগুলির ভঙ্গী। লোকটা বেঁধে, মুখখানা ভারি সরু। নাকটা বাঁয়ে যেন হেলে আছে, চোখদুটো অনবরত যেন ঘুর ঘুর করছে। তার প্রবন্ধ আর কবিতা খাঁটি তার চেহারারই মতো। সে যা কিছু লিখতে যায় তাতেই 'যদিচ', 'কিন্তু', 'পরন্তু'—এই কথাগুলি ছড়িয়ে দেয়—নিজে ভাবধারা এমন করেই ঘুরিয়ে বলে, পেঁচিয়ে লেখে। যেমন তার-মুখের বুকনি, তেমনি তার লেখা। একেবারে তালগোল পাকানো। তাই লেখাগুলি সম্পাদকের দপ্তর থেকে অমনোনয়নের ছাপ খেয়ে ফিরে ফিরে আসে। যত তাড়াতাড়ি যায়, তত তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

দাঁত মাজতে লোকটা ভাল বাসেনা, তাই মুখে তার বদবু লেগেই আছে। আবার কথাগুলো তার চেয়েও খারাপ। এই জন্যে সহকর্মীরা তাকে চটায় না, তাই তার গুমোরও খুব। এখন তো সে ইস্কুলের অত্যাচারী শাসক। যদি কেউ সাহস করে তার গালে এক ঘা বসিয়ে দেয়, সে ছুটেই পালাবে—এমন কি তল্পি-তল্পা গুটিয়ে নেবার জন্যেও অপেক্ষা করবে না। কিন্তু তার সহকর্মীরা নিরীহ জীব। তারা কারো গায়ে কখনো হাত তুলতেই সাহস করেনা—এক মাত্র অবাধ্য ছাত্র ছাড়া।

জাপানীরা যখন পিপিঙ দখল করলে, ল্যান নিজের নাম পাল্‌টে রাখলে। রক্তসূর্যের বদলে এবার পূর্বগগনের সূর্য হয়ে দাঁড়ালো তার নাম। এর সঙ্গে উদিত সূর্যের বুঝি বা একটু মিলই আছে। শত্রুর কাগজে, বিশ্বাসঘাতকদের কাগজে, সে লেখা পাঠাতে লাগলো। ল্যান-এর প্রবন্ধের কোনো অর্থ হয় না, কিন্তু কাগজগুলির এখন মাল-মসলার অভাব, তাই সাদা পাতা রাখার চেয়ে ওরা ওই লেখাগুলিই ছাপিয়ে দিতে লাগলো। দুটো ছোট্ট তিলের মতো পূর্ব সূর্য নামটা দিনের পর দিন বেরুতে লাগলো। যখনই নিজের লেখা বেরোয়, সযত্নে সে কেটে রাখে, ইস্কুলের কোন খাতায় সেঁটেও রাখে। আবার সেগুলি টাঙিয়ে দেয় নোটিশবোর্ডে-দেয়ালে। সহজে

তার মুখে হাসি ফোটেনা, কিন্তু দেয়ালের গায়ে নিজের লেখা সাঁটা দেখে তার অট্টহাসিই শোনা যায়। নামের সড়ক খুলে দিয়েছে বলে জাপানীদের উপর তার অঢেল কৃতজ্ঞতা। আর সবচেয়ে যেটা তার মনমতো হয়েছে, সে হচ্ছে ফি লেখার আট সেণ্ট করে দক্ষিণা। আট সেণ্টের দিকেই এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় যেন আট-আটটা ডলার। আট ডলারও বুঝি নয়—আশী ডলার—আটশো ডলার।

এহেন ল্যান যোগ দিয়েছে নব জনসংঘে।

গত দু'দিন ধরে উৎসবের তোড়জোড়ে তার কেটে গেছে, খসখস করে লিখে গেছে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রচার সাহিত্য! এর জন্যে তেমন কষ্টও তাকে করতে হয়নি। এক বিকেলে বসে সে অমন চল্লিশ পঞ্চাশটা প্রবন্ধ তৈরী করতে পারে। কিন্তু উৎসবের তোড়জোড় তো সহজ নয়। তাই শিক্ষক আর ছাত্রদের সবাইকে জড়ো করে সে অনেক শাসানি দিলে। ছেলেরা যখন মিছিল করে বেরোয়, ব্যায়াম শিক্ষক তাদের নেতৃত্ব করেন। এই নিয়মই চলে আসছে। কিন্তু পূর্বসূর্য ব্যায়াম শিক্ষককে বলতে ভরসা পেলে না। তার ঘুসির ভয় তার যথেষ্ট। তাই রে ফেঙ-কে সে চেপে ধরলো।

আরে ভাই, সে অনেক কষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, আর কেউ যদি মিছিলে না যায়, তুমি আর আমি তো আছিই। পালের গোদা যে আমি আর তুমি। আমি হব সেনাপতি আর তুমি হবে আমার সহকারী।

রে ফেঙ-এর রুক্ষ মুখখানায় বুঝি একটু ঝিলিক দিয়ে গেল। উত্তেজনা সে ভালবাসে, তার উপরে ভালবাসে খেতাব। তা খেতাবও তো আপসে-আপ এসে গেল। সহকারী সেনাপতি—কম জাঁদরেল তো নয়!

সে তাই বললে, তা ভাই, আমি তো সাহায্য করতে রাজি, কিন্তু ছাত্রেরা যদি বেঁকে বসে?

আরে, বেঁকে বসলে, সিধে করে দেব। যে যাবে না, তাকে দূর করে দেব ইস্কুল থেকে। সোজাসুজি কথা!

আঠারো

কুয়ানদের বাড়িতে এক সময় গেছে, যখন বড় লঙ্কা আর পীচ-মঞ্জরী ষড়্ করে এক সঙ্গে প্রভাতপদ্মের উপর আক্রমণ চালাত। ছোট ওয়েনের স্ত্রী সূর্যাস্তের মহিমা ছিলেন দুই সতীনের এই সহযোগিতার মূল-কারণ?

ছোট ওয়েন চীনের লোকায়ত্ত রাষ্ট্রের প্রথম বছরে, প্রথম মাসে, প্রথম দিনে জন্মেছিলেন। প্রাসাদেই তাঁর জন্ম হয়। প্রাসাদের চারিদিকে ছিল বাগিচায় ঘেরা, কত-শো তার উঠোন আর নহবৎখানা। যখন তিনি শিশু তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল সোনা দিয়ে ঘেরা। মোহরের বন্যা বয়ে যেত আশেপাশে। তাঁর খেলনার ভিতরে ছিল ছোট ছোট সোনার পুতুল, খুদে চায়ের পেয়ালাও দামী পাথর কেটে তৈরী হয়েছিল। সে পরিবেশে কিছুই বেমানান ছিল না। বিশ কি ত্রিশ বছর আগে জন্মালে তিনি হতেন একজন মহামান্য আমীর। খেতাবও বর্তাতো। তাঞ্জামে চড়ে ঘুরতেন, আর সেই তাঞ্জাম টানতো আটজন বেহারা। তিনি যেতেন সম্রাট সম্ভাষণে। সম্রাটের কাছে পেতেন খেলাৎ আর দরাজ হাতে বক্‌শিস। যাক, ছোট বেলার কথায়ই আসা যাক। তাঁর ছিল সুন্দর সুন্দর পায়রা। আর কত তার রঙ! সূর্যাস্তের ভাসমান মেঘের মতো সেই নানারঙের পায়রার দল নীল আকাশে ঝাঁকে ঝাকে উড়ে বেড়াত। কাঁচের বোয়েমে বোয়েমে থাকতো ঝিঁ ঝিঁ পোকা। তারা আবার বনেদী পোকা, ঘরোয়ানা তাদের মস্ত। যখন এই পোকাগুলির লড়াই হোত, কত যে বাজী উঠতো তার কে হিসেব রাখে! ঝক্‌ঝকে আসরফির কাঁড়ি জমে জমে উঠতো। আর সে টাকা পাখা মেলে উড়ে উড়ে বেড়াত বাজি-লড়িয়েদের পকেটে। তাঁর খাওয়া-পড়া, খেলা, সবই ছিল যুবরাজের মতো, শুধু ছিল না যুবরাজের বিধিনিষেধ।

হাঁ, কিন্তু এত খাওয়া-পরা, হাসি তামাসার মধ্যে তিনি প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। তা যারা সোনার মধ্যে থাকেন, সোনায় বিভোর হয়ে যান, তাঁদের তো একটু-আধটু অসুখ হবেই। নীরোগ হবার তাঁদের জো কি! অসুখে পড়লে যত্ন-আত্তিটা একটু বেড়েই যেত—বুঝি বা বাড়াবাড়িই চল্‌তো।

টাকা জলের মতো খরচ হোত। রোগ তো নয়, মনে হত প্রাসাদে এক ঘটা পড়ে গেছে। নীল রক্তের রোগ এক হিংসের ব্যাপার। গরীব-গুরবোর স্বাস্থ্যের চেয়ে তার দাম ঢের বেশি। দেখলে হিংসেই লাগে।

ছোট ওয়েন ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান। বই মুখে করে বসে তিনি থাকতেন না, আর বইয়ের তেমন পরিচয়ও তাঁর হয়নি। কিন্তু যে কোনো খেলা একবার দেখেই তিনি শিখে নিতেন। যখন তাঁর আট বছর বয়স, তখন তিন-চারটে পালা গান তাঁর মুখস্থ হয়ে গিছলো। দশ বছর হতে না হতে তিনি শিখলেন বাঁশী আর বীণা বাজাতে। সে আবার যে সে বাজানো নয়, একেবারে ওস্তাদই হয়ে উঠলেন।

চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে, আমীর ওয়েনের বিরাট তিনমহলা প্রাসাদ, সোনালি মাছ, নানা রঙের কবতুর সব চুরমার হয়ে গুঁড়িয়ে গেল। একেবারে ছাতু ছাতু হয়েই গেল। কিন্তু এতে তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। ওসব তো আর তিনি কেনেন নি, তাই কি তার কিম্মৎ তাও জানতেন না। তিনি তখন একেবারে হিসেবে কাঁচা, আনাড়ি। আধসের ময়দা কি চালের কি দাম তাও জানতেন না। এই সব আরামের জিনিসগুলো যখন একে একে মিলিয়ে গেল, তিনি একদিন চোখ খুলে দেখলেন, সবই চলে গেছে শুধু আছে বাঁশী আর বীণা।

তাঁর পরিবার থেকেই বাগদান করা হয়েছিল, সূর্যাস্তের মহিমা সেই সুবাদেই তাঁর স্ত্রী। তাঁর নিজের বংশের মতো অতো বড় বংশ নয়। নেই রাজকীয় মহিমা, কিন্তু তাঁরাও বনেদী ঘর। অভিজাতদের শিরোমণি ছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁরাও নিঃস্ব হয়ে পড়লেন এক আঘাতে। তবু বাগদান হয়ে গেছে, বাগদত্তা বধূ হয়ে ঘরে এলেন। কিন্তু ঘরখানা আর তখন প্রাসাদ নয়। ছোট বাড়ি। সেখানে টেবিল থেকে মায় এক কুচি পেঁয়াজ পর্যন্ত তাদের নিজেদের কিনতে হবে। তাঁরা কেন যে সোনার চামচ মুখে করে সোনার ভিতরে জন্মেছিলেন, সেইটেই তখন তাঁদের কাছে এক ধাঁধা। কেনই বা ওঁদের খেলাৎ গেল, খেতাব গেল, তাও যেন ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। এ যেন স্বপ্ন। স্বপ্নে ওঁরা দেখলেন মাত্র। যাক স্বপ্ন স্বপ্নেই চুকে বুকে গেল। তখন ওঁরা এসে আছড়ে পড়লেন বাস্তবে। ওঁরা জানতেন, এক জোড়া ফুলের মতোই ওঁরা সুন্দর। মাথার উপর ছাউনি যদি কোনো

রকমে বরফ আর বাদল ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে আর ওঁদের পায় কে! ওঁরা বসন্ত দিনের পাখীর মতোই খুশি হয়ে উঠবেন। 'জাতীয় আন্দোলন' কাকে বলে সে সম্পর্কে ওঁরা তখন অজ্ঞ, পৃথিবীতে ক'টাই বা মহাদেশ আছে, তাও তাঁদের অজানা। অতীত সম্বন্ধেও তাদের অতো উচ্ছ্বাস নেই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নেই ভাবনা। আজকের রুজিটা জুটলেই হোল, থাকলেই হোল আজকের রেস্ত। আবার ভাবনা কিসের! খেয়ে-দেয়ে ওঁরা শুরু করতেন গান। এমনি করেই কাটতে লাগলো দিন। ক্রমে গান থেকেই আমদানি হতে লাগলো চাল আর ময়দা। তাই জীবন-সংগ্রাম এড়িয়ে ওঁরা গানটাকেই পেশা করে নিলেন। ইতিহাসের মহা বিবর্তন হয়ে গেল, বদলালো সমাজ-ব্যবস্থা—কিন্তু ওঁরা তেমনি রইলেন। দুটি শিশু। জীবনের ধার ধারেন না। এ যেন দুঃখকষ্টের মধ্যে এল এক মহান আশীর্বাদ হয়ে।

ছোট ওয়েন এখন ভুলে গেছেন যে তিনি আমীর ছিলেন। কেউ তাঁকে আগের খেতাব জুড়ে ডাকলে তিনি বুঝি চমকেই উঠবেন। বিয়ের পর স্বাস্থ্যটাও ভাল হয়েছে। বেঁটে-খাটো মানুষটি, চৌকো মুখখানা, টানা ভ্রূ। মুখখানা মন টানে। গর্ব তাঁর নেই, আবার নিজেকে ছোটও তিনি ভাবেন না। সাদাসিদে সহজ মানুষটি। যার দিকে তাকান, সোজাই তাকান; যখন চলেন, মন্থর পদে চলেন। সবার কাছেই তিনি বিনয়ী। ভদ্র। আবার গায়ে পড়ে কারো অন্তরঙ্গ হতে যান না। পড়শীরা কেউ যদি তাঁর সাহায্য চাইতে আসে, তিনি না বলেন না; যা পারেন দিয়ে দেন। এই জন্যেই তাঁর পেশার জন্যে কেউ তাঁকে হীন চোখে দেখে না; বরং তাঁর ব্যবহারের জন্য শ্রদ্ধাই করে।

সূর্যাস্তের মহিমা রোগা, বড় নরম মানুষটি। কিন্তু স্বামীর চেয়ে তাঁর উৎসাহ বেশি। শক্তি বেশি। ডিমের মতো লম্বাটে তাঁর মুখ, গ্রীবাও তাঁর সুডৌল। গায়ের চামড়া ভাল, রং ফরসা। ভ্রূ ধনুকের মতো বাঁকানো। সূক্ষ্ম যেন তুলির লিখন। তারই নিচে চোখ উজ্জ্বল, আয়ত। চোখ নিচু করে আস্তে আস্তে তিনি হাঁটেন, মনে হয় কত সন্তর্পণে চলেছেন—একটা পোকা দলে দিতে বুঝি চান না। ওঁকে এমনি মুখ নিচু করে চলতে দেখে, কেউ কি বিশ্বাস করবে, তিনি মঞ্চের অভিনেত্রী, অপেরার গায়িকা? কিন্তু

যখন মঞ্চে গিয়ে দেখা দেন, তখন তাঁর মুখখানা পীচ-ফুলের পাপড়ির মতোই ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে। অভিনেত্রীর মতোই তাঁর দেহ। তিনি যখন হাঁটেন ছন্দ যেন দুলে দুলে ওঠে। যখন বাজনা বাজে মঞ্চে, তারই তালে তালে তিনি পা ফেলে চলেন। বা বুঝি ভুলই হোলো। ওঁরই ছন্দের তালে তালে বাজে বাজনা। দরকার হলে তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলতে পারেন—তখন আর হাঁটেন না—মনে হয় যেন উড়ে গেলেন মঞ্চের আর এক প্রান্তে। তার গান, অভিনয়, মুখসজ্জার বিশেষত্ব তাঁকে পেশাদার অভিনেত্রীর ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু তবু তিনি সৌখীন। কোনো দলে এখনো তিনি স্থায়ীভাবে যোগ দেন নি।

তিনি গান করেন মঞ্চে, আর ছোট ওয়েন তারই সঙ্গে বাঁশী বা বীণায় সঙ্গত করেন। ছোট ওয়েন বাজিয়ে বলে জাঁক করেন না, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে ওস্তাদ। সূর্যাস্তের মহিমার গান বা অভিনয়ে যদি বা কেউ খুঁত ধরেন, কিন্তু এমন কেউ নেই যিনি ছোট ওয়েনের বাজনার তারিফ না করেন। তিনি বীণা বাজালে তবে তাঁর বৌয়ের গলা খুলে যায়। ক্লান্তির রেশ যায় মুছে। তাই ছোট ওয়েনের রোজগার তাঁর স্ত্রীর চেয়ে ঢের বেশি। তাঁকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো রকমারি পোষাক কিনতে হয় না। আর সব সময়েই ডাকও আসে। গাইয়ে অঢেল, কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গত করবে এমনি মানুষেরই তো অভাব।

খুদে খাটালে এঁরা যখন আসেন, তখন থেকেই এখানকার ফচকে ছেলে-ছোকরারা মাথা সুগন্ধ তেলে চুকচুকে আর পরিপাটি করে রাখছে। যাদের তেল জোটে না, তারা মাথায় জল চাপড়েই সে কাজ সারছে। যে কোনো অছিলায় ওদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করবারও কামাই নেই। লোকাস্ট গাছ দুটোর তলায় আছে ফাঁকা জমিটুকু। সেখানে এসে ওরা কারণে-অকারণে একটিবার দাঁড়িয়ে যায়—সূর্যাস্তের মহিমাকে এক-পলক বা এক-ঝলক দেখাই ওদের ইচ্ছে। কিন্তু তিনি তো বড়-একটা বেরোনই না; আর যখন বেরোন তখন মাথা নিচু করেই চলেন। কেউ তাঁর কাছেও ঘেঁসতে পারে না। তাই ক' মাস যেতেই সবাই বুঝতে পারলে, গান পেশা হলেও এদের স্বভাব-চরিত্র ভাল। এখানে সুবিধে হবে না। ছোকরারা চুলে সুগন্ধি তেল আর পমেড মাখা ছেড়ে দিলে।

প্রভাতপদ্ম ছোকরা নন, কিন্তু তিনিও তখন ঐ জন্যই ঘুরঘুর করতেন। হর-ঘড়ি ঘর-বার করতেন। তিনি সূর্যাস্তের মহিমাকে শুধু পাড়ায়ই দেখেন নি, তাঁকে থিয়েটারেও দেখেছেন। তাঁর মনে হোল, ওঁর সঙ্গে খাতির করতে না পারলে, কর্তব্য করাই হবে না। তিনি একটু ব্যস্ত হয়েই পড়লেন। তা পড়বেনই তো! বয়েসে, গুণে সূর্যাস্তের মহিমা তো পীচ-মঞ্জরীর ঢের ঢের ওপরে। যদি ওর উপর নজর না দেন, তাহলে তো লোকে বলবে, উনি পাকা জহুরী নন, জহর চেনেন না। যতো ঝুটা মাল নিয়েই তাঁর কারবার। তিনি এও জানতেন, ছোকরারা যতই মাথা তেল চুকচুকে করুক, কিন্তু তাঁর নিজের উপর এ আস্থা আছে; তিনি যদি এগিয়ে যান, ছোকরাদের কোনো আশা নেই। তাই তিনি এগুবেন বলেই ঠিক করলেন।

খুদে খাটালে আর সদর সড়কে ক' বারই তাঁর সূর্যাস্তের মহিমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। পিছুও নিয়েছেন। একটু বা খুকখুক করে কেসেছেন, চোখও মেরেছেন, কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। তাই তিনি কৌশলের ধারাটা বদলে দিলেন। কয়েকটা সস্তা উপহার বগলদাবা করে তাঁর নতুন পড়শীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন।

পূবের বাড়িখানার দুটি ঘর নিয়ে থাকেন ওয়েনরা। বাইরেরটা বসবার, আর ভিতরেরটা শোবার ঘর। শোবার ঘরের দরজায় ফুটফুটে সাদা পর্দা খাটানো। ওই পর্দা ঠেলেই পাওয়া যায় শোবার ঘর। বসবার ঘরে আসবাবপত্র তেমন নেই। শুধু একটা চায়ের টেবিল আর দুখানা টুল। এক কোণে কতগুলি নল-খাগড়া জমা করা আছে। ওঁরা যখন যুদ্ধের নাচ নাচেন, তখন ওগুলো হয় তলোয়ার কি বর্শা। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই বলেই ঘরখানায় সূর্যাস্ত নাচতে পারেন। এ তাঁর মহলা-ঘর।

কুয়ান আসতেই ছোট ওয়েন তাঁকে আদর করে বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। কুয়ান অপেরা সম্বন্ধে একটু-আধটু জানেন। ওই নিয়েই কথা চালাবেন ভাবলেন।

কথা বলতে বলতে খুদে ওয়েন দেখলেন, তাঁর অতিথির চোখ যেন সাদা পর্দাটার দিকেই পড়ে আছে। তাই তিনি হাঁক পাড়লেন, মহিমা, কুয়ান-মশাই এসেছেন। যেন কুয়ান তাঁর বহু দিনের বন্ধু।

আস্তে আস্তে মহিমা পর্দাটা তুলে বেরিয়ে এলেন। নীল গাউন তাঁর পরনে। ঢিলেও নয়, আবার খাটোও নয় গাউন। বেশ আঁটাসাঁটো, মানানসই। পায়ে সাদা মখমলের চটি। মুখে একটু হাল্‌কা করে পাউডার ঘসেছেন। তিনি এসেই অতিথির দিকে তাকিয়ে বললেন, কুয়ান-মশাই আপনি বসুন!

কুয়ান আসন থেকে উঠতে গিচলেন, আবার বসেও পড়লেন। একটু বা হক্‌চকিয়ে গেছেন। ভারি সুন্দর দেখতে সূর্যাস্ত। কিন্তু তেমন করে তাকাবারও তাঁর সাহস নেই। তাঁর স্বর নয় গান, কিন্তু সে গান বেশি শোনার তাঁর সাধ নেই—ওতে নেশা ছুটিয়েই দেয়। তিনি যে বিষয় নিয়ে কথা বলছেন, ওঁবাও তাতে যোগ দিলেন। কিন্তু যাই-ই বলুন, তাঁদের ভাষা সংযত, অভিব্যক্তিও তাই। একটা যেন গণ্ডী আছে, তার বাইবে তাঁরা যেতে চান না। সে সীমারেখা লঙ্ঘন করতে তাঁরাও চাননা, প্রভাতপদ্মকেও দেবেন না। প্রভাতপদ্মের এগিয়ে যাবার রীতি রপ্ত, কায়দা-কানুন জানা। তিনি এবার ভাঁড়ের ভূমিকা নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এ ভূমিকা এখানে অচল।

ওঁদের কাছে লোক আসা-যাওয়ার কামাই নেই। কেউ বা সূর্যাস্তের ওস্তাদ—নাচ গান শেখাতেই আসেন, কেউ বা ছাত্র—শিখতে আসেন। আবার ছোট ওয়েন-এর কাছে বীণা শিখতেও বহু লোক আসে। মেয়ে পুরুষ, বুড়ো, ছেলে-ছোকরার দল আসছে যাচ্ছে অনবরত। দেখে মনে হয় এঁরা অকেজো মানুষ. কিন্তু আসলে তা নয়। এঁদের ছাড়া কোনো সমাজই সম্পূর্ণ নয়। ওঁরা যেমন অকেজো, ওঁদের দিয়ে অ-কাজই হয়। যাঁরা আসেন যান, তাঁরা নিজেরাও তা জানেন। নিজেদের কদর আর কিম্মৎ তাঁদের জানা। তাই যাঁরা তাঁদের স্বগোত্র নয়, তাঁদের সঙ্গে মাখামাখি করেন না। এঁরা ঢুকে, কুয়ানকে একটু মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করলেন। এ ঠিক কুয়ানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয়, নিজেদেরই আত্মসম্মানের নিরিখ। আবার যাবার সময়ে শুধু বললেন, আচ্ছা আবার দেখা হবে। শুধু এইটুকু। এর চেয়ে বেশি নয়।

কুয়ান ঝাড়া চার ঘণ্টা বসে রইলেন। ওঁরা অপেরা নিয়ে নানা কথা বলতে লাগলেন, নাচের পাঁয়তারা আর মহলা দিলেন, বীণার গৎ নিয়ে নানা

কথা হোল। কুয়ান চুপ করে বসেই রইলেন। ওয়েনরাও কুয়ান থাকায় কিছু মাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন না। সহজ ভাবভঙ্গী—যেন তিনি এখানে হাজির নেই এমনি তাঁদের ভাবখানা। কুয়ানের শুধু মনে হতে লাগলো, এঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চান না। ক'বার উঠে পড়বেন ভাবলেন। কিন্তু যেতে মন চায় না। আবার এও বুঝলেন, হাঁদার মতো এখানে বসে থাকাও ঠিক নয়, এখানে থাকতে হলে ওঁদের কথায় যোগ দিতে হবে। একবার সুযোগ পেয়ে তিনি ছোট ওয়েনকে বললেন, আমিও পালা গানের দু একটা সুর জানি। ওয়েনকে একথা বলার উদ্দেশ্য, তিনি যখন সুর ভাঁজবেন, ওয়েন যেন তখন বীণায় সঙ্গত করেন। কিন্তু ওয়েন ভ্রূক্ষেপই করলেন না, এমন কি তারিফ করে একবার যে মাথাটা দুলিয়ে সায় দেবেন—তাও না। শুধু কুয়ানের কথাটা তিনি যেন ঠেলে সরিয়ে দিলেন। কুয়ান আবার ভাবলেন, উঠে পড়বেন, চলে যাবেন।

এই সময়ে ঘরে বহুলোক দেখে ওয়েন সাদা পর্দাটা তুলে দিলেন। কুয়ানের চোখ যেন বন্ধ হয়ে গেল।

শোবার ঘর চোখে পড়ছে। দেয়ালে সাদা ঝক্‌ঝকে কাগজ লাগানো। মনে হয় যেন বাসর ঘর। বিছানায় স্প্রিং-এর গদি। কয়েকটি মাত্র আসবাব। সেগুলোও দামী কাঠের। দেয়ালে একখানা দামী দৃশ্যচিত্র। কুয়ান মিলিয়ে দেখলেন, তাঁর ঘরের চেয়ে ঢের ভাল সাজানো। রুচিরও যথেষ্ট পরিচয় আছে। প্রভাতপদ্ম প্রথমে দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। তারপর ছবিখানা ভাল করে দেখবেন এই ভান করে ঢুকে পড়লেন। সারা ঘরময় তাঁর চোখ ঘুরে ঘুরে বেড়ালো। ঘর দেখে একবার তিনি এসে বসে পড়লেন বিছানায়। বালিসের উপরের কারুকাজ দেখতে লাগলেন। আর এক ঘণ্টা কেটে গেল। এই এক ঘণ্টার ভিতরেই এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেললেন। সূর্যাস্তের গান আর অভিনয়ই একমাত্র পেশা নয়, তার আরও একটা পেশা থাকতেই হবে। তা না হলে এমন সব আসবাবপাত্র আর ছবিই বা আসবে কোথা থেকে? তিনি দিব্যি কাটলেন, অন্ততঃ ক'মিনিটের জন্য হলেও এ বিছানায় তিনি একবার শোবেনই।

পরদিন একটু তাড়াতাড়ি এসে হাজির হলেন। ওয়েনরা তাঁকে তেমন ঘটা করেও এনে বসালেন না, আবার খুব একটা অভদ্রতাও করলেন না।

তাঁরা আগের মত ব্যবহারই করলেন। খুব দূরেও রাখলেন না, আবার কাছে টেনেও নিলেন না। দুপুরের খাবার সময় এসে গেল। কুয়ান এবার তাঁদের নিমন্ত্রণ করে বসলেন। একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে তাঁর সঙ্গে ওঁরা যদি খান তো উনি কৃতার্থ হবেন। ওয়েন নানা কাজের অজুহাত দেখিয়ে অস্বীকার করলেন।

তিন দিনের দিন আরো তাড়াতাড়ি এসে হাজ্‌রে দিলেন কুয়ান। আগের মতই ওয়েনেরা ভদ্রতা দেখালেন, কিন্তু গলে গেল না। কুয়ান ভাবনায় পড়লেন। তিনি যত এগুচ্ছেন ব্যাপারটা কিন্তু তত এগুচ্ছে না। ততো কেন, মোটেই না। কিন্তু তাই বলে হার মেনে পিছিয়ে যাওয়া তো যায় না। আর শুধু এখানে ধর্ণা দিয়েই ভাল লাগছে, কেউ কথা বলুক চাই না বলুক—শুধু সান্নিধ্যটাই মনোরম, এতেও তিনি একটু যে না খুশি এমন তো নয়।

এই চার পাঁচ দিনের মধ্যেই বড় লঙ্কা আর পীচ-মঞ্জরী মিতালী পাতিয়ে ফেললেন।

বড় লঙ্কার পরিবারের সোনার মহিমা যদি প্রভাতপদ্মের মনে জেল্লা না ধরিয়ে দিত তা হলে তিনি তাকে বিয়েই করতেন না। বিয়ের আগেই বড় লঙ্কার মুখখানা দাগী হয়ে যায়। বিয়ের পর বড় লঙ্কা প্রভাতপদ্মকে খুবই ভালবাসতেন। সত্যিই তিনি ছিলেন ভালবাসার যোগ্য লোক। তখন তাঁর ভরা যৌবন, তার উপরে তিনি একটু বা ছিলেন কল্পনাবিলাসী। তাই বড় লঙ্কা ভয়ে ভয়ে থাকতেন: কি জানি কখন কোন্ মেয়ে এসে তাঁর জিনিসে ভাগ বসায়। তা হলে উপায় কি হবে! তাই প্রভাতপদ্ম যখন তাঁর পাশে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকাতেন, তখন বড় লঙ্কা ভাবতেন কি করে তাঁর মন পাবেন। তাঁকে সাজিয়ে গুজিয়ে, তাঁর সেবা করেই ছিল তাঁর তৃপ্তি। এ যেন বড় বোন স্নেহের ছোটভাইটির জন্য উদ্‌বিগ্ন। তাই কুয়ান অবাধ্য হলে তিনি তাকে কড়া শাসন করতেন। তখন যেন মনে হোত সৎ-মা সৎ-ছেলের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ছেন।

ছেলে বিয়োতে পারেন নি বলে বড় লঙ্কার ভারি দুঃখ। যতই তিনি বড়াই করুন, কিন্তু দুনিয়াকে তো বড় গলায় জানাতে পারেন না—ছেলে না বিইয়েছি তো কি আর হয়েছে! কত মন্দিরে গিয়ে হত্যে দিলেন, কত

ধূপধুনা আর ডালি দিলেন, কিন্তু তবু ছেলে হোল না। আর প্রভাতপদ্মেরও ঘরে রক্ষিতা নিয়ে আসা ঠেকাতে পারলেন না। তা প্রভাতপদ্মের তো আর কুমতলব ছিল না। পুত্রার্থেই ঘরে আর একটা বৌ আনবেন ঠিক করলেন। চূড়ান্ত হয়ে গেল; বড় লঙ্কা চোখের জল ফেললেন, তারপর শাসালেন আত্মহত্যা করবেন, আবার অনেক কাকুতি মিনতি করলেন। যত উপায় ছিল পরখ করে দেখলেন, কিন্তু পীচ-মঞ্জরীকে ঘরে আনা ঠেকাতে পারলেন না।

প্রভাতপদ্ম এখানে সাহস আর বুদ্ধির পরিচয়ই দিলেন। তিন দিনের ভিতরে সব ঠিক হয়ে গেল। তার পর বন্ধু-বান্ধবদের এক ভোজে ডেকে জানালেন, পুত্রার্থে তিনি আবার একটি ভার্যা গ্রহণ করেছেন। দু নম্বর বাসর ঘরের জন্য শহরের দক্ষিণপাড়ায় তিনি ক'টা ঘরও ভাড়া নিলেন।

বাসর ঘরে পীচ-মঞ্জরী আর প্রভাতপদ্ম ঘুমিয়ে পড়বার আগেই বড় লঙ্কা তাঁর পল্টন নিয়ে গিয়ে সেখানে হানা দিলেন। ঘরে আসবাবপত্র তেমন ছিল না, কিন্তু যা ছিল তাই টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেললেন। নিজের মান বজায় রাখবার জন্যেই এসব কাজ করলেন। তারপর একটা মোটর ভাড়া করে স্বামী আর নতুন বৌকে তাতে তুলে নিয়ে সটান চলে এলেন বাড়ীতে। পীচ-মঞ্জরীর অস্তিত্ব তাঁকে স্বীকার করে নিতে হোল, কিন্তু যাতে সে স্বামীর আস্কারা পেয়ে মাথায় না ওঠে, তাই চোখে চোখে রাখলেন। এর চেয়ে বেশী আর কি করবেন! তেমন সুবিধে থাকলে ওকে তিনি জ্যান্ত গুঁড়িয়ে ফেলতেন না!

পীচ-মঞ্জরী বরাতগুণে নিজের সীমানার পিলপে-গাড়ি করে নিলে। বড় লঙ্কা তাকে যখনই আক্রমণ করেন, সেও পাল্টা আঘাত করে। সুযোগ এলে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। কিন্তু গোপনে তারা একে অপরকে তারিফই করে।

প্রভাতপদ্ম রোজই ওয়েনদের বাড়ীতে হাজরে দিচ্ছেন, এই সুযোগ বড় লঙ্কা আর পীচ-মঞ্জরী শত্রু থেকে মিত্র হয়ে দাঁড়ালেন। বড় লঙ্কা ঠিক করলেন, তাঁর স্বামীকে তিনি একটা বেশ্যার সঙ্গে বয়ে যেতে দেবেন না। পীচ-মঞ্জরীও ছেলে বিয়োয় নি, আর তার বয়েসও বাড়ছে। প্রভাতপদ্ম যদি আর একটা মেয়ে মানুষ নিয়ে আসেন, তাহলে তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়েই

উঠবে। তাই দুই বৌয়ে মিতালী হোল। পীচ-মঞ্জরী কথা দিলে, উচ্চবাচ্য করবে না; বড় লঙ্কা হবেন তার পক্ষের কৌঁসিলী। সওয়াল জবাব—জেরা যা করার করবেন।

বড় লঙ্কা প্রথমেই জিতলেন। বল গিয়ে পড়লো সুট্ করে গোলের ভিতরে। বললেন, প্রভাতপদ্ম, আর ছ'নম্বর বাড়ীতে তুমি যেওনা! যদি যাও তো, আমি আর পীচ-মঞ্জরী দুজনে মিলে তোমার ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেব। তারপর খোঁড়া সোয়ামিকেই আমরা পুষব।

প্রভাতপদ্ম তর্ক করতে চাইলেন, বলতে গেলেন, তিনি ওখানে গান শুনতেই যান। অন্য উদ্দেশ্য তাঁর নেই।

কিন্তু বড় লঙ্কা তাঁকে মুখ খুলতেই দিলেন না। বললেন, এখন পা আছে, যাবে তো যাও! কিন্তু গেলে, পা নির্ঘাৎ ভেঙে দেব! যা বলেছি, তাই করব!

কথা বললেন নিচু গলায়, খাদে নেমে এল স্বর, কিন্তু মুখখানা যেন থম্ থম্ করছে। মনে হয় খুন করতেও তিনি পেছু-পা নন।

প্রভাতপদ্ম উপেক্ষা করতে চেষ্টা করলেন তাঁর কথা। কয়েকবার দু-পা, এক-পা করে এগিয়েও গেলেন। কিন্তু ঐ থমথমে মুখের কথা ভেবে পিছু হটে এলেন। সূর্যাস্তের বাড়ির চৌহদ্দী মাড়াবারও আর তাঁর সাহস নেই।

তা ছাড়া ফটকে শান্ত্রী মোতায়েন। বড় লঙ্কা আর পীচ-মঞ্জরী পালা করে পাহারা দিচ্ছে।

প্রভাতপদ্মের শান্ত্রীর চোখ এড়াবার উপায় নেই। শুধু খবর নিতে চান সূর্যাস্ত কোথায় যায়, কোন থিয়েটারে সে অভিনয় করে। তারপর না হয় টিকিট কিনে গিয়ে হাজার দর্শকের সঙ্গে বসে হাততালি দিয়ে আসবেন। আশা মানুষকে ছাড়ে না। তাই তিনি খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। আশা, কোন দিন হয় তো থিয়েটারের সাজঘরে হাজির হয়ে বাৎচিত করবেন, ওকে একা ভোজের নিমন্ত্রণ জানাবেন। তিনি থিয়েটারে গিয়ে হাজরে দিতে লাগলেন, মঞ্চের উপর দেখলেন সূর্যাস্তকে। কিন্তু তিনি তো একবার মঞ্চ থেকে ফিরেও তাকালেন না। তারপর একদিন সাহস করে তাঁর সাজঘর অবধি ও ধাওয়া করলেন, কিন্তু তখন তিনি চলে গেছেন।

কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই বড় লঙ্কার কাছে এই গোপন প্রচেষ্টা ধরা পড়ে গেল। এবার কুয়ান যেদিন থিয়েটারে গেলেন, তাঁর দুই বৌ তাঁকে এড়িয়ে থিয়েটারে এসে ঢুকলো। কুয়ান যখন সূর্যাস্তের তারিফে তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন, চীৎকারে প্রেক্ষাগৃহে ফাটিয়ে দিচ্ছেন, এমন সময় এক কাণ্ড হয়ে গেল। তাঁর দুই বৌ এসে তাঁর দু কান ধরে উবিয়ে নিয়ে গেল থিয়েটার থেকে। একবারও মাটিতে পা পড়তে দিলে না। তিনি এবার হলেন স্ত্রীদের হাতে বন্দী।

এর পর থেকে হাল না ছেড়ে দিলেও প্রভাতপদ্ম বাইরে স্ত্রীর হুকুম মেনেই চলেন। ছ'নম্বরের ফটকের দিকে তাকাতেও সাহস পান না।

জাপানীরা পিপিং দখল করার পর থেকে প্রভাতপদ্ম ওয়েনদের নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছেন। ওদের বাড়ীতে দামী আসবাবপত্র আছে, কিন্তু থিয়েটারগুলোর যে দরজা বন্ধ। ওরা হয়তো উপোস করেই দিন কাটাচ্ছে। তাঁর ভারি ইচ্ছে, ওদের কিছু চালডাল কি টাকাকড়ি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু নিজে শত গোপনে গেলেও ঝগড়া বাঁধবেই। যদি এই নিয়ে বৌ-এর সঙ্গে কথা বলতে যান, সে নিশ্চয়ই ভাববে, মতলব খারাপ। যতই ভাবতে লাগলেন, ততোই নিজের বরাতের কথা বার বার মনে পড়লো। পরিবারের কর্তা হয়েও তাঁর আজ একটুও ক্ষমতা নেই—মান-সম্ভ্রমও নেই।

নব জনসংঘ-এর দিকে তাঁর লক্ষ্য। খোঁজ খবর নিয়ে তিনি জানলেন, বড় যে মিছিলটা বার হবে সেটার যোগাড়-যন্তর করছে এই সংঘ। তিনি শুনেছিলেন, সবরকম স্তরের মানুষদেরই নাকি এই মিছিলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে মুচি, ছুতোর, কারিগর আছে, আছে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি। এদের নাম 'হুই'। যারা মিয়াও ফেঙসান তীর্থে যায়, অর্চনা করে, এরা তাদেরই গোষ্ঠি। তা ছাড়া যারা স্বর্গের পথ পরিষ্কার করে দেয়, যারা সিংহ নাচ নাচে, যারা তলোয়ার-নাচ নাচে—এদের সবাইকেও আসবার জন্য বলা হয়েছে।

আজ ক'বছর হোলো মানুষের চরম দারিদ্র্যে, ধর্মের কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে, আমোদে-প্রমোদের ধারার পরিবর্তনে এই প্রতিষ্ঠানগুলি মরতে বসেছে। যুদ্ধের চার-পাঁচ বছর আগে এই বিস্মৃত-প্রায় লোক-নৃত্যগুলি আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছে সেনাবাহিনী, আবার তাদের নতুন

করে জাগিয়ে তুলেছে। সেনাবাহিনী দেবতাদের তুষ্ট করবার জন্যে এগুলি জাগায় নি, নিজেদের সমর-নৈপুণ্য বাড়াবার এও একটা দিক। নব জনসংঘের পাণ্ডাদের এগুলির কথা প্রথমেই মনে পড়লো। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হরেক রকম লোক নিয়ে তৈরী—এরা বেশির ভাগই ব্যবসায়ী, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষও আছে। ওরা ভাবলে, এদের জড়ো করতে পারলে, জনগণকে পাওয়া যাবে নিজেদের তাঁবে। তাছাড়া পশ্চিমি ধরণে মোটর-দৌড় কি মুষ্টি-যুদ্ধও হবে না, এ হবে খাঁটি চীনা ব্যাপার। যারা চীনকে চীনা কায়দা-কানুন-মাফিক জয় করতে চান, তাঁদেরও এতে খুশি করাই হবে।

তাই বৌয়ের অনুমতি নিয়ে প্রভাতপদ্ম এবার ছ'নম্বর বাড়িতে এলেন। মেরাপ-বাঁধিয়ে লিউর সঙ্গেও দেখা করবার তাঁর ইচ্ছে। সে বড় সিংহের নাচ নাচে, আবার ছোট সিংহও সাজে। সিংহ নাচ হচ্ছে মেরাপ-বাঁধিয়ে লিউর নেশা। যখন সিংহ নাচের মিছিল কোনো সেতুর কাছে আসে, তখন হচ্ছে সিংহ নাচের আসল বিপদ। জল তুলতে হবে সিংহকে সেতুর রেলিঙের ওপর ওঠে, নিজেদের ভার সামলে, মাথাটা নীচে দিয়ে ওদের ঝুলে থাকতে হয়। শুধু মেরাপ-বাঁধিয়েরাই একাজ পারে। ওদের অনেক উঁচুতে উঠতে হয় বলেই সিংহ নাচে ওরা হয় সিংহ। আর আমাদের লিউ তো আবার ওদের মধ্যে সেরা নাচিয়ে।

প্রভাতপদ্ম লিউকে ডাকতেই গেলেন। ভাবলেন, নব জনসংঘকে তিনি এই 'খেল্'টা উপহার দেবেন। এমনি করেই তিনি কর্তাদেব সুনজরে পড়বেন। এই খেলার বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে এরই মধ্যে এক খবরের কাগজের সংবাদদাতার সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে। ছ'নম্বরের ফটকে এসে পৌঁছতেই তাঁর বুকখানা কেঁপে কেঁপে উঠলো। উঠানে পা দিয়েই মনে হোল, উড়ন্ত তুবড়ির মতো তিনি পূব দিকে ছুটে যান, গিয়ে একেবারে ওয়েনদের ওখানে উঠেন। কিন্তু তবু মনের ব্রেক্টা কষতেই হোল, পূর্বে না গিয়ে উত্তরে চলে এলেন। আস্তে আস্তে শুধালেন, লিউ বাড়ি আছ?

লিউ বিরাট লম্বা-চওড়া মানুষ নয়, কিন্তু তাকদ আছে বলেই তাকে মস্ত দেখায়। প্রায় চল্লিশ তার বয়েস, কিন্তু মুখে এখনো ভাঁজ পড়েনি। গায়ের রং তার একটু কালো, তাই দাঁত আর চোখ বড়ই সাদা দেখায়।

ওর ভরাপুরো মুখ আর ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলি দেখলেই মনে হয়, লিউ লোকটি যেমন তেজি, তেমনি জোয়ান। ডাক শুনে সে ঠিক চিতে বাঘের মতোই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যখন সে দেখলে লোকটা প্রভাতপদ্ম, অমনি তার মুখের চেহারা বদলে গেল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে সে বললে, ওঃ আপনি! তার ভাবভঙ্গিও যেন কেমন। সে যেন দেখাতে চায়, কুয়ানের যা বলবার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলুক, কামড়ার ভিতরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসার দরকার নেই। তার কামরাখানা ছোটই, কিন্তু প্রভাতপদ্ম না হয়ে আর কেউ হলে সে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েই বসাত—এক পেয়ালা চাও দিত।

প্রভাতপদ্ম কিন্তু তা বুঝতে পারলেন না, তিনি বরং ঘরে ঢোকবার চেষ্টাই করলেন। তাঁর চেয়ে যাঁরা উঁচুদরের মানুষ, লিউ তাঁদের দলে হলে তিনি চট্ করে বুঝে নিতেন। কিন্তু এখানে বুঝেও বুঝলেন না। বড় মানুষেরা বাতকর্ম করলেও বোঝা যায়, তাঁরা কি বলছেন। আর নীচু-তলার মানুষেব সোজা কথাও বাতকর্ম করে উড়িয়ে দেওয়া চলে।

লিউ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বললে, কুয়ান-মশাই, আপনার কি কোনো কাজ আছে নাকি? যদি থাকে তো একটা চা খানায় চলুন। আমার ঘর আবার লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।

সে ভাবলে কুয়ান এবার কথার মানেটা বুঝতে পারবেন।

কুয়ান যেন বুঝতেই পারছেন না। লিউকে একটু সরে যেতে দেখে তিনি আবার সিঁড়িতে পা বাড়িয়ে দিলেন।

লিউর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো, কুয়ান-মশায়, আমার কামরায় আপনাকে যেতে হবে না। যা বলার এখানেই বলুন।

অমন মারমুখো ভাব দেখে প্রভাতপদ্ম হেসে মধুমাখা স্বরে বললেন, লিউ, আমি তোমার সাহায্য চাইতেই এলাম।

বলুন, কি চান কুয়ান-মশায়?

প্রভাতপদ্ম চোখ টিপলেন, না, না! আগে আমার কাছে দিব্যি কাটতে হবে।

লিউ জবাব দিলে, আপনি কথাটা না বললে আমি তো আর অমনি অমনি ঘাড় নাড়তে পারি না।

কিন্তু—কথা যে ঢের। জায়গা-মতো—প্রভাতপদ্ম চারিদিক তাকালেন। না, বলবার উপযুক্ত জায়গা এটা নয়।

জায়গা-মতো আবার কি! এইখানেই বলে ফেলুন। আমাদের মতো মুটে-মজুররা যখন কাজ করে, মাত্র দু-একটা কথা খসাই। জায়গার বাছ-বিচার আমরা করি না।

কুয়ান আবার উঠানের চারিদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, লিউ, তুমি তো জানো—একটু থেমে আবার বললেন, পাওতিঙের খবর তো জানো—এক মস্ত মিছিল হচ্ছে।

লিউ হঠাৎ হেসে উঠলো, ওঃ আপনি সিংহ-নাচের জন্য এসেছেন!

আরে, অত জোরে নয়। কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে?

এর মধ্যে ওরাও যে এসেছিল?

কারা?

নব জনসংঘের মানুষেরা।

তাই নাকি!

আমি তাদের মুখের উপর বলে দিয়েছি, জাপানীদের হয়ে আমি নাচবো না। আমার ডেরা ছিল পাওতিঙে। আমার বাপ-ঠাকুর্দার গোর সেখানে। পাওতিঙ দখল হয়েছে, এ নিয়ে ফুর্তি করা আমার পোষাবে না।

প্রভাতপদ্ম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এবার হেসে বললেন, ওদের সাহায্য না কর, আমি তো পুরাণো বন্ধু, আমাকে একটু সাহায্য করতে পার না?

আমার বাবা যদি এসে বলতেন, তা হলেও জাপানীদের হয়ে নাচতাম না। এই বলে লিউ দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়লো।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল প্রভাতপদ্মের মুখের উপর।

উনিশ

না; জনসংঘের প্রতিপত্তি এখনো খুব বাড়েনি, তাই পিপিং-এর সব শ্রেণীর মানুষকে মিছিলে এনে জড়ো করতে পারল না। যারা এল তাদের মধ্যে প্রায় সবই ছাত্র।

তারা যা-ই পড়ুক, যতই ছেলেমানুষ হোক, যতই হোক বাধ্য, তবু একটা কথা জানা আছে, সে হচ্ছে জাতি। হ্যাঁ, তার সংজ্ঞা তাদের জানা। তাদের বাপদাদারা এটা জানতেন না। মাথা নীচু করে কাগজের খুদে নিশান উল্টো করে ধরে ওরা দুজন দুজন করে চললো মিছিলে। যেন শোভাযাত্রা নয়, শোকযাত্রায় চলেছে বাপ-মার। শহরের দিক থেকে ওরা চললো স্বর্গীয় শান্তির ফটকের দিকে।

রে স্যুয়ান ইস্কুল থেকে নোটিশ পেয়েছিল জমায়েতে যাবার, কিন্তু সেখানা সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তখন সে কাজে ইস্তফা দেওয়ার জন্যও তৈরী।

মিছিলের দিন ভোর হতে রে ফেঙ তাড়াতাড়ি উঠে বেশভূষা করে বেরিয়ে গেল। সে ইস্কুলে একটু আগেই যেতে চায়। পূবসূর্যকে একটু সাহায্য করাই হবে।

সাহস আছে তার। সান-য়াৎ-সেন নতুন চীনে যে উর্দি প্রচলন করে-ছিলেন, সেই উর্দি সে পরলো। জাপানীরা যেদিন পিপিঙে এসেছে, সে দিন থেকে সান-য়াৎ-সেন উর্দি আর জনগণের তিনটি সূত্র মানুষ লুকিয়ে ফেলেছে। রে ফেঙ হাওয়া কোনদিকে বয় তা জানে। সে ঘননীল উর্দিটা জাপানীরা আসতেই বাক্সের একেবারে তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। আজ তাকে মিছিল চালাতে হবে। নেতার কিন্তু লম্বা গাউন পরলে চলে না, তার চাই জমকালো কোট আর ট্রাউজার। তাই সে উর্দিটা বার করে ফেললে। জাপানীরা একথা নিশ্চয়ই বুঝবে যে, উর্দিটা পরলেও বিপ্লবের ধার সে ধারে না। জাপানীরা যদি ব্যাপারটা দেখেও না দেখে, তা হলে সে একটু আমল পাবে বই কি। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সে-ই প্রথম পরবে এই উর্দি, ডাঁট দেখাতে পারবে। সে একবার সান-য়াৎ-সেন উর্দি পরে একেবারে খুদে খাটালের

মাঝখানে গিয়ে হাজির হলো। হুকুমের বুলি বাজছে নেতার মুখে—য়্যাটেন-শন! মার্চ! রুক্ষ স্বর খ্যান খ্যান করে উঠছে।

ইস্কুলে এসে দেখলে পূবস্যূর্য লান তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি. একটি ছাত্রেরও দেখা নেই। শূন্য ইস্কুলবাড়ীতে রে-ফেঙ যেন অস্থির হয়ে উঠলো। কেমন ভয় করছে। চোখ বুজে সে ভাবতে বসলো; যখন স্বর্গীয় শান্তির দরোজার সামনে ছাত্রেরা গিয়ে জড়ো হবে. তখন যদি জাপানীরা মেসিনগান চালায়, কি হবে তাহলে? সে শিউরে উঠল। খাওয়া-দাওয়া নাচ-গানে সে জাপানী বনে গেছে, কিন্তু এখনও তাদের সম্পর্কে ভয়টা যায় নি।

ছেলেরা একে একে এসে গেল। এবার দূর হোল ভয়।

পূবস্যূর্য লানের কাছে সে ছুটলো। সে তখন সবে জেগেছে, এখনো আবেশ কাটেনি, বিছানা থেকে ওঠার ইচ্ছেও নেই। চোখ বুজে সে তার ভোরের পয়লা সিগারেটটায় সুখ টান দিছে। রে ফেঙ তাকে জিজ্ঞেস করলে, কি লান-মশাই উঠলেন?

এই সময়ে কেউ যদি এসে হানা দেয়, সে বিরক্তিই হয়। মৌতাত জমেছে সবে, এখন ওঠা-উঠির পালা কিসের! তাই রে ফেঙ-এর স্বর শুনতে পেয়েও জবাব দিলে না। রে ফেঙ আবার বললে, ছেলেরা যে তৈরী। উঠুন, তাড়াতাড়ি উঠুন!

পূবস্যূর্য খেঁকিয়ে উঠলো, তৈরী হয়ে থাকে তো চলে যাক, আমাকে জ্বালাতে এসেছ কেন?

হেডমাষ্টার এখনো আসেন নি। মাষ্টারদের মধ্যে তো একজন এসেছে। যাব কি করে বলুন?

বেশ তো না যাবেন তো বসে থাকুন! লান পোড়া সিগারেটের টুকরো মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার লেপ মুড়ি দিলে।

রে-ফেঙ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে লান আবার তার মাথাটা বার করলে লেপের ভিতর থেকে। লেপ থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তৈরীর পর থেকে আর ধোয়াই হয় নি। সে এবার লেপ সরিয়ে উঠে পড়লো। পোষাক আর মোজা পরবার দরকার নেই। পরেই ঘুমিয়েছিল। রাত আর দিনের পোষাকের মধ্যে তফাৎও সে রাখেনি। দিনে শুধু পোষাকের উপর পরে একটা ঢোলা জোব্বা, আর রাতে

চাপায় লেপ। দিনে লেপ চাপা দেওয়া চলে না। আর রাতে ঢোলা জোব্বা পরে সে শোয় না। কিন্তু ভিতরের পোষাক ঠিকই থাকে।

রে ফেঙ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার লোক সে নয়, তাই উঠে পড়েই হুকুম ঝাড়লে, যান ছেলেদের গিয়ে জমায়েৎ হতে বলুন!

রে ফেঙ জিজ্ঞেস করলে, সে কি, এত তাড়াতাড়ি রওনা হব?

কেন, তাতে হবেটা কি শুনি?

আমরা কি নাম ডাকব?

নিশ্চয়ই! যারা গর-হাজির হবে, তাদের শাস্তি দিতে হবে না?

ইস্কুলের ঝাণ্ডাটা কি সঙ্গে নেব?

আলবৎ!

কিন্তু হেডমাষ্টার মশাইয়ের জন্য একটু দেরী করলে হোত না?

কেন দেরী করব? পুবস্থর্যের চোখ কুঁচকে গেল। হেডমাষ্টার এলেও মিছিলের ভার আমার ওপরেই থাকবে। আমি নব-জনসংঘের সভ্য।

ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে পুবসূর্য উঠে পড়লো। এবার হাজারে খাতাগুলো বগলদাবা করে নিলে। রে ফেঙ নিলে ইস্কুলের ঝাণ্ডাটা। তারা এসে দাঁড়ালো ইস্কুলের মাঠে। ইস্কুলের দুটো বেয়ারা একগাদা রঙ-বেরঙের কাগজের নিশান নিয়ে এল।

রে ফেঙ একটু ঘাবড়েই গিছলো। ছেলেরা হয়তো তার সান-য়াৎ-সেন উর্দি দেখে হেসেই উঠবে। জোরে না হাস্থক, একটু কানাকানি তো করবেই। কিন্তু ছেলেরা দুজন দুজন করে দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে। উর্দি দেখার ওদের ইচ্ছে নেই। হাসির রব উঠছে না। মুখে তাদের টু শব্দটি নেই। রে ফেঙ ঝাণ্ডাটা এনে দেয়ালের পাশে রাখলো।

ছেলেরা এবার সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। তাদের মাথা এখনো নুয়ে আছে। মুখে শব্দটি নেই।

পুবস্থর্যের ঠোঁট কাঁপছে। তার মনে ভয়, ছেলেরা একটা হাঙ্গামাই বাধাবে। কিন্তু তাদের চুপচাপ দেখে ভরসাই হোল। অমনি হুকুম বেজে উঠলো।

হাজারে খাতা তার বগলে। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো, নাম ডাকার দরকার নেই। কারা আসেনি, আমি দেখে নিয়েছি। তাদের

ইস্কুল থেকে নাম কাটা যাবে। নাম কাটার পর আমি জাপানীদের তাদের নামধাম জানিয়ে দেব। আর জাপানীরাও তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে গারদে পুরবে। শত্রুকে তো গারদেই পুরতে হয়। শুনছ তোমরা? লান-এর চোখের কোণে হলদে পিচুটি লেগে আছে। সে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সেই পিচুটি বার করে জোব্বায় মুছে ফেললে।

ছেলেদের মুখে নেই টু শব্দটি।

লান এখন নির্ভয়। সে মুখ ফিরিয়ে বেয়ারাদের কাগজের নিশান বিলিয়ে দিতে বললে। ছেলেরা নিঃশব্দে হাত পেতে নিচ্ছে। এ তাদের বাধ্যতার নিদর্শন, প্রয়োজন। নিশান বিলি হয়ে গেলে রে ফেঙকে বললে, এবার মার্চ শুরু করুন!

রে ফেঙ ছুটে গিয়ে দেয়ালের কোণ থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে এসে উড়িয়ে দিলে।

ইস্কুলের ঝাণ্ডা ওড়ানো হয়েছে। ছেলেরা চোখ তুলে তাকালে। হুকুম না পেয়েও ওরা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ওরা যেন বলতে চায়, আমাদের মার্চ করতে বলে কি যথেষ্ট হয়নি, আবার ইস্কুলের ঝাণ্ডাকে অপমান করলে কেন? সারের প্রথমে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল, তারই হাতে রে ফেঙ ঝাণ্ডা তুলে দিতে গেল। ছেলেটির মুখে কথা নেই, ঘাড় নেড়েও সে সায় দিলেনা। কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ও-ঝাণ্ডা সে বইবে না। পনেরো বছরের ছেলে, গোলমাল মুখে ঘন ভ্রূ। আর তারই নিচে চোখে জল টলটল করছে। মুখখানা কেমন হয়ে গেছে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার সমস্ত শরীর যেন এক প্রতিরোধ প্রাকার। কেউ তাকে ঐ ঝাণ্ডা বয়াতে পারবেনা, তার জন্য বরং সে মরবে, তবু না।

রে ফেঙ মোটাসোটা ছেলেটার মনের জোর দেখে ঘাবড়ে গেল। এবার তার পেছনের ছেলেটির কাছে গিয়ে সে ঝাণ্ডা দিতে চাইল। এও নারাজ। হুবহু অমনি চোখ বন্ধে দাঁড়িয়ে আছে পিছনের ছেলেটা। আর ওরা দুজন কেন, সবাইই অমনি। যেন এক বৈদ্যুতিক প্রবাহে খবর চলে গেছে সারের শেষে, জানাজানি হয়ে গেছে। কেউ টু শব্দটি করছে না। সবারই পাথরের মতো মুখ, বোবা মুখ। ইস্কুলের ঝাণ্ডা বইতে আজ ওরা নারাজ।

পূর্বসূর্য ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। ছেলেদের দিয়ে বহানো যাবেনা ঝাণ্ডা। ওরা বেঁকে বসেছে। সে একজন বেয়ারাকে ডেকে বললে, এই, তুই ঝাণ্ডাটা নিয়ে চলতো! আমি তোকে দু'ডলার বকশিস দেব।

বেয়ারাটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঝাণ্ডা কাঁধে নিলে। সারের সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো। তারও মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

রে ফেঙের পালা এবার। মিছিল চালাতে হবে তাকে। সে বেশ কায়দা-দোরস্তভাবে একবার সামনে একবার পিছনে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল। তারপর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো সোজা হয়ে। পা তার জোড়া, এবার চেঁচিয়ে উঠলো, য়্যাটেনশন! বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে, চোখ বুজে সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, মার্চ! নিজের হুকুমটা কানে ভাল শোনালে। বেশ জোরদার, যুতসই হয়েছে! একেবারে জঙ্গী কায়দায়! কিন্তু কি বরাত, কেন যেন গলায়ই আটকে গেল স্বর। শব্দ বেরুল না। মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। সে জানে, ছেলেরা হেসে উঠবে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, ওরা চুপ করেই আছে।

যে বেয়ারা ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়েছিল, সে আর রে ফেঙকে মুখ খোলবার ফুরসৎ দিলে না। সে ডানদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে লাগলো।

ছেলেরা আস্তে আস্তে চলেছে পিছনে। স্কুলের ফটক পেরিয়ে পথে নেমে এল ওরা। যত যাচ্ছে, ততই মাথা নুয়ে পড়ছে। নিশান তুলে ধরেনি মাথার উপরে। শব্দ নেই তাদের মুখে, পথে আশেপাশের মানুষের দিকেও তাকাচ্ছেনা। আজ জাপানীদের সামনে, ওরা স্বীকার করে নিয়েছে অধীন দেশের মানুষ ওরা। মানুষ তো নয়, দাস, ক্রীতদাস।

পিপিং-এর আকাশ নির্মেঘ, সেই আকাশের তলায় ইস্কুলের ছেলে আর মেয়েরা চলেছে মিছিল করে, ওরা বরণ করে নেবে এই অমর্যাদা, এই অপমান। ইতিহাসে তার স্বাক্ষর পড়বে। ওরা জানে, শত্রুর সম্মানে ওদের এই শোভাযাত্রা। ওদের হাতের নিশানে লেখাঃ মহাজাপান দীর্ঘজীবী হোক!

এই বিরাট অপমানের বোঝা বয়ে যারা চলেছে, তাদের মধ্যে দশ বছরের খুদে ছেলেটাও জানে, সয়ে যেতে হবে মুখবুজে, টু শব্দটি সে করবে না। গাড়ী, ট্রাম, রিক্সা, বাড়ির ফটকে, দোকানের জানালায় উড়ছে

নিশান। কাগজের শেকলের মালায় চারদিক মালাময়। কিন্তু তবু তো উৎসবপুরী নয় পিপিং, সে নীরব। মনে হয় সে মরে গেছে।

রে ফেঙ ভেবেছিল, সময়টা ভাল কাটবে, উত্তেজনা আর উৎসাহের খোরাক মিলবে। পথ যে এমনি মরার মতো পড়ে থাকবে একথা সে ভাবেনি। এখন তো কেমন ঘাবড়েই গেল। সে তাড়াতাড়ি ছুটলো পূবস্থর্যের কাছে। সে উধাও। মিছিলে নেই, কোথাও নেই। রে ফেঙ ভয় পেল। স্থন্দর দিন, উজ্জ্বল রোদ, চারদিকে নিশানের ঘটা, তবু ভয় তো বাগ্ মানেনা।

পিপিং-এর ঐ আকাশ, এই মাটি আর পিপিং-এর মানুষ যেন ভয়ানক! ভয়ানক!

রে ফেঙ আর তার ছেলের দল স্বর্গীয় শান্তির দরোজায় প্রথম এসে পৌছলো। সে ভেবেছিল, অন্ততঃ এখানে জমবে মেলার ভিড়। ফেরি-ওয়ালারা দোকান-পাট সাজিয়ে বসবে—বিক্রি করবে মেঠাই আর ফল। মেয়ে-পুরুষ রঙ-বেরঙের পোষাক পরে ভিড় করবে—ঠেলাঠেলি আর চেঁচামেচি করে সারা হয়ে যাবে। আবার যাদুকরের ভানুমতির খেল্ আর নানা রঙ-তামাসাও থাকবে। হয়তো কালোয়াত আর ওস্তাদরা বসবে আসর জমিয়ে।

কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছে তা তো উল্‌টো। স্বর্গীয় শান্তির দরোজার লাল দেয়াল, সামনের মারবেল পাথরের সেতু, পিছনের সেডার গাছ সবকিছু মিলে আগের মতোই আছে। মারবেল পাথরের সেতুর সামনে বাঁধা হয়েছে যেমন-তেমন করে এক মেরাপ। এই মেরাপের ভিতরেই বসবে সভা। মেরাপের চারদিকে ছোট-বড় নিশান উড়ছে, কিন্তু তবু যেন তেমন জাঁক-জমক নেই। ঐ যে দরোজার মিনার, ঐ যে মার্বেল পাথরের সেতু আর সিঁড়ি—ওরা চিরদিন থাকবে। কিন্তু এই মেরাপ একটা দমকা হাওয়ায় কবে উড়ে যাবে—ওর অস্তিত্বও থাকবে না। মেরাপের ভিতরে ফাঁকা। সেখানে কাক-পাখীও নেই। রে ফেঙ এবার শূন্য মাচাটার দিকে তাকালো, আর একবার চোখ ফিরে এল মার্বেল মিনারে। মিনার তীব্র আলোর বন্যায় ঝক্‌ঝক্ করছে—আবার যেন তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে। কে বলতে পারে ওখানে পাতা নেই জাপানীদের মেসিন-গান? আরো লোক

আসুক, চত্বর ভরে যাক, তবে তো সে সাহস পায়। ক্রমে পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ থেকে এল ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল। বাজনা বাজছেনা। কাতারে কাতারে ওরা আসছে, নিঃশব্দে জমা হয়েছে।

আরো, আরো এল। এখন বহু মানুষ, তবু মিনারের সামনের চত্বর এখনো ভরে যায় নি। যত লোক আসছে লাল দেয়াল আরো যেন লাল হয়ে উঠছে, মিনার যেন আরো মাথা তুলছে। মানুষ আর তাদের ঝাণ্ডা যেন পাখী আর তার পালক। স্বর্গীয় শান্তির দরোজা আরো বিরাট হয়ে উঠছে। পুলিশ আর গোয়েন্দারাও এসে জুটেছে, কিন্তু জঙ্গী ভাবখানা তাদের নেই। ছাত্রদের পাশে তারা মুখ নিচু করেই দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলার সাহস কারো নেই। মিনারের মহিমা তাদের মূক করে দিয়েছে, লজ্জা দিচ্ছে। আহা, কত সুন্দর এই নগরীর প্রাচীর আর মিনার! আর কত নীচ তার মানুষের দল!

পূবসূর্যের পকেটে এখনো লাল ফিতেটা রয়েছে। সে যে এই মিছিলের একজন নেতা, ওটাই তার নিদর্শন। কিন্তু কামিজের উপর সেটি পিন দিয়ে আটকে রাখবার মুরোদ তার নেই। তাছাড়া সে ছেলেদের থেকে প্রায় সিকি মাইল তফাতেই আছে। মাঝে মাঝে শুধু পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে তাকাচ্ছে শূন্য মাচাটার দিকে। সংঘের হোমরা-চোমরাদের প্রতীক্ষা করছে অধীর হয়ে, আর প্রতীক্ষা করছে জাপানী কর্তাদের। স্বর্গীয় শান্তির দরোজার মহিমা, আর ছাত্র-ছাত্রীদের নীরবতা তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এত লোক যখন চুপ করে থাকে, তখন একটা গোল বাঁধবেই। ছেলে-মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। পা তাদের অবশ, তবু নড়ছে চড়ছে না। মাচা এখনো শূন্য। জোড়া জোড়া চোখ নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে মেরাপের দিকে। সেখানে উড়ছে জাপানী পতাকা। আরো এক পতাকা আছে, পাঁচ রঙ্গা পতাকা। এ পতাকা তারা চেনেনা। চীনা লোকায়ত্ত রাষ্ট্রের এই পতাকা ছিল একদিন, তাদের জন্মাবার আগেই সে পতাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারা জানেনা ঐ পাঁচ রঙের মানে কি? ওকি পরাধীন দেশের নিশান? কে জানে! মাষ্টারদের জিজ্ঞেস করবারও সাহস নেই। মাষ্টাররা মুখ নিচু করে আছেন, চোখ তাঁদের সজল। ছেলে-মেয়েরাই বা কি করবে? তারাও মাথা হেঁট করে তাদের নিশান

ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেললে। নিশানে কি যেন লেখা ছিল—চীন আর জাপানীরা ভাই ভাই।

সভার শুরুটা বেশ নাটকীয়। মাচার উপরে লাউড-স্পীকারটা হঠাৎ এক শোকগাথা গেয়ে উঠলো। এটি জাপানী গান, জাপানী স্বর। এবার বন্দুকধারী জাপানী সৈন্যেরা ঘিরে ফেললে মাচা। ফাঁকা মাচা লোকে লোকারণ্য। কারো কারো গায়ে চীনা জোব্বা কারো বা জাপানী উর্দি। লাল ফিতেওয়ালা লোকগুলো যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। এরা লান-এরই স্বগোত্র, নব-জনসংঘের নেতা।

এই বিরাট সভায়, গান শিশুর চিৎকারের মতোই ডুবে গেল। লাউড-স্পীকার বুঝি গান ছড়িয়ে দিতে অক্ষম। মনে হয় কে যেন দূরে মন্ত্র পড়ছে, নয়তো কাঁদছে। স্বর্গীয় শান্তির দরোজার সামনে সৈন্যদের দেখাচ্ছে কালো কালো খুনে পেরেকের মতো। জামার উপরের ঢিলে জোব্বা আর উর্দি পরা মানুষগুলো যেন পুতুল নাচের পুতুল।

ওই পুতুলের মধ্যেই একজন ঢোলা জোব্বা দুলিয়ে লাউড স্পীকারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। স্বর উঠছে—লাল দেয়ালে গিয়ে আছড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিরাট বিস্তৃতিতে। এখন তারা আর কথা নয়, অস্ফুট ধ্বনি মাত্র। ছাত্রেরা মাথা হেঁট করে আছে এখনো, তাদের কানে পৌছাচ্ছেনা স্বর। আর তারা শুনতেও চায়না। যারা ঐ ঢিলে জোব্বা পরে জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের তারা বিশ্বাসঘাতক বলেই জানে।

এবার ঢিলে জোব্বা-পরা লোকটা বসে পড়লো। উর্দি-পরা এক জাপানী উঠে দাঁড়ালো। পূবস্থর্য আর তার বন্ধুরা এরই মধ্যে জায়গামত গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের তারাই এনে জড়ো করবে। তারা এবার হাততালি দিলে। হাততালি পড়ছে, মনে হয় যেন পাখী পাখা ঝাপটাচ্ছে গোবি মরুভূমিতে। ছেলেদের হাততালি দেবারই এ সংকেত—নির্দেশ। কিন্তু ছাত্রেরা মাথা হেঁট করে রইল। নড়লো চড়লো না।

একে একে জাপানী কাঠের পুতুলগুলি কথা কইতে লাগলো, তাদের গুনগুনানি দরোজার কাছে এসে পৌছচ্ছে। তারা ভাবছে, কি দরকার এত হাঙামা পোহাবার! মেসিন-গান দিয়ে ভিড় পাতলা করে দিলেই তো হয়।

আবার এও মনে হোল, ওরা যেন বোকা বনে গেছে। মিনারের উপরে, মার্বেল সেতুর নীচে লুকিয়ে আছে ফৌজ, তাদের কাছে কলের কামান। কিন্তু ছাত্রেরা তা তো জানে না। তারা চুপচাপ। এই নীরবতা আর উদাসীনতাও বুঝি এক জবর হাতিয়ার।

মাচায় যারা লাল ফিতে বুকে এঁটে ঘুরছিল, তারা এবার জিগির তুললো। মুখ হাঁ হয়ে গেছে, হাত উপরে তোলা, কিন্তু গলার স্বর তাদের বড় খাটো, বড় অস্পষ্ট। ছাত্রেরা এখনো নীরব। পাল্টা জিগির দিচ্ছে না।

এবার পুতুলগুলো মাচা থেকে একে একে নেমে মিলিয়ে গেল। যাদের উর্দিতে লাল ফিতে আঁটা তারা হিরোহিতো মেঠাইয়ের ঝুড়ি নিয়ে ঘুরছে। প্রতি ছাত্রছাত্রীকে একটি করে মেঠাই তারা বিলি করে গেল। ছাত্র-ছাত্রীরা মেঠাই হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এখন আর ছাত্র-ছাত্রীরা নেই। শুধু হিরোহিতো মেঠাইয়ের ছড়াছড়ি আর মাটিতে পড়ে আছে কাগজের ছোট খুদে ঝাণ্ডা।

বিশ

পূবস্যূর্য লানেব সম্মানে এক বিরাট ভোজ হয়ে গেল। সে হোল প্রভাত পদ্মেব মিতা, মিতা বলে মিতা, একেবারে প্রাণের প্রাণ, হরিহর আত্মা। পিপিং-এ পূবস্যূর্য যখন আসে, তখন সে ভাবতো পূব বাজারে গিয়ে মাংসের পুরি আর খুদের জাউ খাওয়াটাই এক মস্ত বিলাসিতা। কয়েক বছর পরে সে যখন একটু পাকাপোক্ত হোল, তখন বুঝলো চিয়েন মেন ইস্টিশানের পেল রেস্তোরাঁয় বিদেশী খাবার আর তুং সিং লুর চীনা খাবারটাই হচ্ছে সেরা খাবার। কিন্তু আজ ভোজ খেয়ে সে ধারণা তার পালটে গেল। সে ঠাহর পেলে, রেস্তোরাঁর খাবার হাজার ভাল হলেও অভিজাত জীবন ধারার সঙ্গে খাপ খায় না। অভিজাত জীবনে সে অচল। কুয়ানের টেবিলে শাকসবজীও বেশ পাকা হাতের রান্না। এমন কি চায়ের, পেয়ালা-পীরিচের রঙও যেন আলাদা। আর মদের পেয়ালা থেকে যে খোসবাই ছাড়ে, তার তো জুড়ি মেলা ভরা। এক জহুরীই এ সব চিনতে পারে, তারিফ করতে পারে।

মদ আর খাবার খেয়ে তৃপ্ত হয়ে পূবস্থর্যের মনে হোল, গায়ে যেন হাওয়া দিয়ে গেল। পীচ-মঞ্জরী দুলিয়ে দিয়ে যে ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বয়ে যায়, এ ও যেন তেমনি। কুয়ানের চোখ, নাক, মুখ, ভ্রূ, গলা থেকে হাওয়া বইছে। মুখে এসে লাগছে। ঠাণ্ডা হাওয়া নয় উষ্ণ। পূবস্থর্যের বুকখানায় একটু দোলা দিয়ে গেল। নিজেকে সে চিরদিন নির্যাতিত, নিপীড়িত বলেই ভেবেছে, তার পাণ্ডুলিপি এসেছে বার বার ফিরে। কিন্তু আজ যেই সে কুয়ানের বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকলো, অমনি কুয়ান তাকে কবি বলে ডেকে উঠলেন। আর কয়েকপাত্র টানবার পর কুয়ান তাকে আবৃত্তি করতে বললেন তার রচনা। ছোট পদ্য, বেশি সময় লাগলো না। সে আবৃত্তি শেষ করতেই কুয়ান হাততালি দিয়ে উঠলেন। আবার মুখেও তারিফ করলেন, চমৎকার, খুবই সুন্দর! কবি লান হাসলো, হাসতে হাসতে তার চোখ বসে গেল গর্তে, বহুক্ষণ আর চোখ সেই গর্ত থেকে বেরিয়ে এল না।

কুয়ান সোহাগ করে ডাকলেন বড় মেয়েকে, ওরে কাওদী, নতুন কবিতা শুনতে তোর না ভাল লাগে? বেশ তো পূবস্থর্যের কাছে শুনে নে না? পূবস্থর্যকে তিনি বললেন, বন্ধু আপনি কি কাউকে শিষ্যা করতে রাজি আছেন?

পূবস্থর্য জবাব দিলে না। দিনরাত সে মেয়ের ভাবনা ভাবে, কিন্তু তাদের সামনে এলে তার মুখ দিয়ে বুলি সরে না?

কাওদী মুখ ঘুরিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইল। এই নোংরা রোগা লোক-টাকে তার ভাল লাগে নি। ও আবার কবি নাকি!

কুয়ান বুঝলেন, মেয়ের লোকটাকে ভাল লাগে নি, তাই তিনি আবার অতিথির শূন্য পেয়ালায় মদ ঢেলে দিলেন।

রে ফেঙ আর তার মোটাসোটা বউটির এখনো মেজাজ শরিফ, ভালই লাগছে। কিন্তু আবার একটু ভয়ও করছে। পূবস্থর্য লান তাদের নিজেদের আবিষ্কার, কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে কুয়ান-মশাই তাকে চুরি করে নিয়ে নিলেন। অতিথিরই যত মান, যত কদর, তারা যেন আড়ালে পড়ে গেছে। কিন্তু রে ফেঙের বৌয়ের নিজেরও মন পড়ে আছে পূবস্থর্যের দিকে। তার অমন মোটাসোটা গতর দেখেও পূবস্থর্য তার দিকে ঘন ঘন চোরা চাউনি হানছে। কুয়ান বাড়িরই দু-দুটো ছুঁড়িকে সে হার মানিয়ে দিয়েছে।

এ তার গর্ব। কিন্তু পূবসূর্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কাজের কথাই ভাবে। তার ছিপছিপে সুন্দরপানা ছুঁড়িদের চেয়ে মোটাসোটা একটু বেশি বয়েসি মেয়েমানুষকেই ভাল লাগে।

মেদী রসিকা। এই কিম্ভূত জীবদের নিয়ে সে একটু ঠাট্টা-মস্করা করতে ভালবাসে। সে পূবসূর্যকে হেসে হেসে বললে, আচ্ছা বলুনতো সূয্যি-মশাই, কি করে মানুষ লেখক হয়? তারপর জবাবের অপেক্ষা না করে বললে, ভাল প্রবন্ধ লিখতে হলে কি দাঁত মাজতে বা মুখ ধুতে হয় না?

পূর্বসূর্যের মুখখানা কালো হয়ে উঠলো।

কাওদী আর পীচ-মঞ্জরী হাসছে।

কুয়ান গম্ভীরভাবে সরাবের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে পূবসূর্যকে বললেন, মেদী ছেলেমানুষ, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। আসুন, ওর কাছে গিয়ে বসি। দেখি, ও আর কি বলে!

খাওয়া শেষ হতে সবাই পীচ-মঞ্জরীকে ধরে বসলো, গান গাইতে হবে। পীচ-মঞ্জরী নিজের আগের পরিচয় দিতে চায় না নতুন বন্ধুদের কাছে। সে জানালে, তার কাসি হয়েছে, স্বর বসে গেছে। তবু ভদ্রতা রাখার জন্যে সে প্রস্তাব করলে, মাজং খেলা হোক। পূবসূর্য যদিও কঞ্জুস, কিন্তু এখন সে মাতাল, একরকম বেহেড হয়ে পড়েছে। আর চারপাশে এতগুলো মেয়ে দেখে সাহসও যে না বেড়েছে তা নয়। তাই সে বললে, হা খেলব বটে! তবে ষোলো বাজির বেশি নয়। রে ফেঙ আর তার বৌয়ের খেলার ইচ্ছা নাই। তারা কুয়ানদের খেলার কায়দা-কানুন জানে।

বড়লঙ্কা, পীচমঞ্জরী, মেদী আর পূবসূর্য খেলতে বসে গেল।

কুয়ানেরও একটু নেশা লেগেছে। তিনি ক'টা পিপিং-এর পীয়ারের খোসা ছাড়িয়ে রে ফেঙের দিকে একটা বাড়িয়ে দিলেন। রে ফেঙ একটা নিলে। এবার কুয়ান উঠে পড়ে বাইরে এলেন। রে ফেঙ তাঁর পিছনে।

উঠোনে এসে কুয়ান আদর করে বললেন, রে ফেঙ, সত্যি কথা বলতো ভাই, আরে আমাদের মধ্যে অতো আদব-কায়দা নাই বা থাকলো— অতিথিকে আদর-আপ্যায়নে কি কোনো ঘাঁটতি হয়েছে?

রে ফেঙ পীয়ারের বিচি ফেলতে ফেলতে বললে, না, না। মিছে বলব না, একেবারে সব নিখুঁত হয়েছে।

কুয়ান হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো, কিন্তু এখনো বরাত তো ভাল হোল না।

রে ফেঙ চুপচাপ শুনে গেল। সে এবার ফিরে চললো। অমন মন-মরা হতে তার ভাল লাগে না। তাঁর কাছে মহান দুঃখের চেয়ে নিলাজ সুখ ঢের ভালো।

ঘরে লান তেমন খেলায় সুবিধে করতে পারছে না। পাশার দান ফেলছে আর গালাগাল দিচ্ছে। খালি গজর গজর করছে, কে বড় ধীরে খেলে, আলোটা বড় কম-জোরী। এমন কি চায়েও সে খুঁত ধরে বসলো, তেমন নাকি গরম নয়।

রে ফেঙ ভাবলে গতিক সুবিধের নয়, সে আস্তে বৌয়ের হাত ধবে টেনে দিলে। বিদায় নেবার ওদের মুরোদ নেই, চোরেব মত চুপি চুপি বেরিয়ে এল। কুয়ান তাঁদের সঙ্গে ফটক অবধি এলেন।

পরদিন রে ফেঙ ভাবলে, স্কুলে গিয়ে ঠাট্টা করেই পূবসূর্যকে কাওদীর কথা বলবে, যদি পূবসূর্যের তেমন ভাল লেগে থাকে তো সে ঘটকালিও করতে পারে। এমনি করে এক তীরে সে দুই পাখী মারবে, কুয়ান আর লান দুজনকেই হাতের কুঠোয় পুরবে।

কিন্তু পূবসূর্যকে দেখে, তার সে আশা আর রইল না। তার মুখ গোমরা, মনে হয় যেন এখুনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পূবসূর্য প্রথমেই বললে, কুয়ানদের মদে, খাবারে, চায়ে কত খরচা হয়েছিল বল তো?

রে ফেঙ বুঝলে, ব্যাপারটা ঘোরালো। কিন্তু সে যেন কিছুই বোঝেনি এমনিভাবে জবাব দিলে, তা বিশ ডলারের উপরে তো হবেই!

ওরা তো আমার কাছ থেকে আশীখানা ডলার হাতিয়ে নিয়েছে। ওতে চারবার ভোজ খাওয়া যায়। তোমার সঙ্গে কত বখরা ছিল?

আমার বখরা কি বলছেন? রে ফেঙের কু'তকুতে চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো।

নিশ্চয়ই! তা না হলে, আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই লোকটার, হঠাৎ নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলে কেন?

রে ফেঙ এই নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করতে পারলে না। শুধু নিষ্ঠুর নয়, নোংরা কথা। তার কপালের শিরা ফুলে ফুলে উঠল। আপনি ঠাট্টা করছেন?

ঠাট্টা আমি করিনা, আমার টাকা গেছে, আবার ঠাট্টা!

আরে মাজং খেলায় হার-জিত আছেই। যদি হারবার এত ভয় ছিল, খেলতে বসে গেলেন?

শোন আমার কথা শোন! লান-এর হলদে দাঁতগুলো সবই বেরিয়ে পড়লো। যেন কুস্তা লড়ায়ের জন্য তৈরী হচ্ছে। আমি এখানকার পাকা-পোক্ত সহকারী শিক্ষক। আর ক'দিন পরেই হেডমাস্টার হব। আমার হাতের মুঠোয় থাকবে তুমি। তুমি যদি আমার আশীটা ডলার শোধ করে না দাও, আমি ঠিক তোমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়ব!

রে ফেঙ হাসলো। সে পিপিং-এর মানুষ। পিপিং-এর মেয়েমানুষরাও লান-এর মতো নয়, তারা কোনো ব্যাপারের একটা দিকই শুধু দেখে না। সে বললে "মিঃ লান, আপনি ফুর্তি করছেন, টাকা গেছে! কিন্তু আমাকে কি বলে সেই সেই টাকা দিতে বলছেন? এ তো মজা মন্দ নয়। তা এমন দাঁও-এর ফন্দি-ফিকিরে আমাকেও একটু তালিম দিন না। আমিও না হয় আপনার দলেই ভিড়ে যাব।

রে ফেঙ-এর কথাগুলো সত্যি তারিফ করবার মতো! কিন্তু হাতে তার টাকাকড়ি নেই। তিনমাস ধরে মাইনে পাচ্ছে না। আবার সে এও জানে পূবসূর্য টাকা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। এই কথা ভেবে সে আবার হাসলো। বললে, বেশ তো ঘাট মানছি মশায়, আমার কুয়ানদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া অন্যায়ই হয়েছে। কিন্তু আমার মতলব তো খারাপ ছিল না। কাওদীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ভেবেছিলাম। কে জানত, আপনার লোকসানের বরাত আছে।

দেখ, মেলা বকো না! পূবসূর্যের গদ্য তার কবিতার তুলনায় অনেক স্পষ্ট, অনেক সুবোধ্য।

পূবসূর্য সম্বন্ধে একটা গল্প মনে পড়লো রে ফেঙের। শোনা যায়, এক বান্ধবীর জন্যে একবার নাকি ক'খানা চিরুণী আর রুমাল সে কিনে ফেলেছিল। তারপর যেদিন বন্ধুত্ব ভেঙে গেল, সে ঐগুলোর ফর্দ করে তার কাছে পাঠিয়ে দিল। তার দাবী, তার জিনিষ তাকে ফেরত দিতে হবে। এতদিন বিশ্বাস হয়নি, এবার রে ফেঙের বিশ্বাস হোলো। গল্পটা তা'হলে সত্যি! আবার খানিকটা সে পস্তালে। তার হাতে টাকা নেই, এদিকে পূবসূর্য তো নাছোড়।

পূবসূর্যের মুখের মাংস বিষাক্ত সরীসৃপের মতো নড়ছে, সে বললে, শোন, যদি আমার টাকা ফেরৎ না দাও, আমি তোমার নামে গিয়ে খবর দিয়ে আসবো। আমাকে যে কথা বলেছ, সেই কথা গিয়েই দপ্তরে বলব যে, তোমার ছোট ভাই পিপিং থেকে পালিয়ে গেরিলা দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে।

রে ফেঙের মুখ ম্লান হয়ে গেল। অনুতাপ হচ্ছে, কেন সে বলতে গেল ঘরের কথা লান-এর কাছে। সে তো অন্তরঙ্গ হবার জন্যে বলেছিল—কিন্তু এখন তো বিপদই হোলো। জাপানী পুলিশ এসে তাকে ছেঁকে ধরবে, তারপর বৈদ্যুতিক চেয়ার আর চাবুক। হঠাৎ ঘামে জবজবে হয়ে উঠলো শরীর।

কি হে, মুখে যে রা নেই? টাকা দেবে না, খবর দেব?

রে ফেঙ জানে, লানকে আশীটা ডলার গুণে দিলেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে না। যখন ইচ্ছে হবে, লান গিয়ে খবরটা দিয়ে আসবে।

কি হে, কি বল? পূবসূর্য রে ফেঙের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো।

রে ফেঙ যেন ফাঁদে-পড়া কুত্তা। কোনো উপায় নেই, শুধু দাঁত দেখাতেই পারে। সে ঘুষি পাকিয়ে দাঁড়ালো, তারপর সেই ঘুষি শূন্যে তুলে ছুঁড়ে মারলো। তার হাত তার বাগে নয়। কোথায় পড়লো ঘুষি তাই সে জানে না। হঠাৎ চেয়ে দেখে, পূবসূর্য মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। সে ভাবেনি, এতেই পূবসূর্য ঘায়েল হবে। সে ভাল করে তাকালো। পূবসূর্যের চোখ বোজা, নড়ছে না। আবার ফিরে তাকাবে, বা বুকে হাত দিয়ে দেখবে, সে সাহস তার নেই। তাই সে চোঁচা দৌড় মারলে সেখানে থেকে।

অতো জোরে সে আগে কখনো ছোটেনি। নিজের বাড়ির ফটকে গিয়ে যখন সে পৌছলো, তখন তার দম একেবারে ফুরিয়ে গেছে। ফটকে ঠেসা দিয়ে সে চোখ বুজে খানিকটা জিরিয়ে নিলে। বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে জামার অস্তিনে ঘাম মুছে এবার সে এল উঠোনে। তারপর সোজা গেল বড় ভাইয়ের ঘরে।

বড় ভাই!

রে স্যুয়ান শুয়ে ছিল। আজ পাঁচ বছরের ভিতরে একটিবারও এমনি করে ডাকেনি সে। এতে আছে ভ্রাতৃত্বের উষ্ণ পরশ। রে স্যুয়ান তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললে,

কি হয়েছে রে মেজ?

কোনোরকমে সে ঢোঁক গিলে ফিসফিস করে বললো, আমি খুন করে এসেছি।

রে স্যুয়ান আস্তে বললে, কি হয়েছে? বসে ধীরে সুস্থে বল! সে এক পেয়ালা জল গড়িয়ে দিলে মেজ ভাইকে।

মেজ ভাই এক চুমুকে জল শেষ করে দিলে। রে স্যুয়ানের ধীর, শান্তভাব আর জলের শীতলতা জুড়িয়ে দিলে তার স্নায়ু। সে বসে পড়ে বললে, পূর্বসূর্যের সঙ্গে ঝগড়ার কথা। বিবরণ শেষ হয়ে গেলে সে একটা সিগারেট বার করে ধরালে। হাত তার কাঁপছে।

রে স্যুয়ান বললে, হয়তো মরেনি, মূর্ছা গেছে। অত সহজে কেউ মরে না।

মেজ ভাই এক ঝলক ধোঁয়া বার করে দিলে, তা আমি জানি না।

বেশ তো, দেখা যাক না! ফোন করে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। যে কেউ ধরুক, সে-ই বলতে পারবে, লোকটা আছে না মরেছে।

যদি ও না মরে থাকে তো ওর সঙ্গেই হয়তো কথা কইতে হবে।

যদি না মরে থাকে, যে ফোন ধরবে, সে নিশ্চয়ই বলবে, একটু ধরে রাখুন, ডেকে দিচ্ছি। তুমি তখনি রিসিভারটা রেখে দেবে।

হঠাৎ মেজর ঠোঁট চিরে হাসি বেরুল, ঠিক বলেছ!

বড় ভাই জিজ্ঞেস করলে, তুমি যাবে, না আমি?

চল ত্ু'জনেই যাই। মেজো বড়কে ছাড়তে চায় না। আর তা ছাড়া নিজের বৌকেও সে কিছু জানতে দিতে নারাজ। এবার সে স্পষ্ট বুঝলে, বড় ভাইয়ের কাছে সব কথা বলা যায়, কিন্তু বৌয়ের কাছে মাঝে মাঝে মুখ বন্ধ করাও দরকার।

দু'জনেই ওরা গেল ফোন করতে। ফোন করে জানা গেল, লান-মশাই কিছুক্ষণ হোল বাইরে গেছেন।

মেজো এবার বড়কে বললে, ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হবে না। তাই না বড় ভাই ?

দেখা যাক্।

না, না, তা হবে না, আর যা-ই হোক না কেন, আমাকে এখন অন্য কাজ খুঁজে নিতে হবে। আর স্কুলে ফিরে যেতে পারব না। লান যদি আমাকে না দেখে, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা ভুলে যাবে।

তাই-ই হবে। রে স্নুয়ান মেজ ভাইয়ের ভীরুতা দেখে অবাক হয়ে গেল।

ওরা হেঁটেই বাড়ী ফিরে চললো। সাত নম্বর বাড়ীর সামনে এসে মেজ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছে।

তিনজন লোক কুয়ানদের বাড়ী থেকে তাদের বাড়ীর দিকে চলেছে। একজনের গায়ে আবার উর্দি।

রে ফেঙ পিছন ফিরে ছুটতে গেল, কিন্তু বড় ভাই তাকে থামিয়ে দিলে। ও তো সার্জেণ্ট পাই, আদমশুমারির ব্যাপারে বোধহয় এসেছে।

মেজোর তবু ভয়। সে বললে, দেখ বড় ভাই, আমি তবু একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। হয়তো ঐ সাদাসিধে পোষাক-পরা লোকদুটো গোয়েন্দাই হবে।

রে স্নুয়ানকে কিছু বলার স্নুযোগ না দিয়ে সে খুদে খাটালের মোড়ের দিকে ছুটে চলে গেল।

রে স্নুয়ান একাই বাড়ী ফিরলো। ফটকে এসে দেখলে পুলিশরা কড়া নাড়ছে। সে হেসে বললে, কি ব্যাপার সার্জেণ্ট পাই ?

সার্জেণ্ট পাই ধীরে ধীরে বললে, কিছুনা, আদমশুমারির ব্যাপার। এই মহল্লার কাউকে ভয় পাইয়ে দিতে সে চায় না।

রে স্নুয়ান সাদাসিধে পোষাক-পরা লোক দুটির দিকে তাকালো। ওরা গোয়েন্দাই হবে।

সার্জেণ্ট পাই লোক দুটোকে বললে, এই বাড়ীখানাই এ-গলির সবচেয়ে পুরানো। বলতে বলতে সে লম্বা খাতাটা খুলে বললে, সেজ ভাই তো মারা গেছে জানি, তাছাড়া বাড়ীতে নতুন কেউ আমদানী হয়নি তো ?

রে স্নুয়ান সার্জেণ্ট পাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কৃতজ্ঞতা দেখাবার স্নুযোগ তো নেই, সে তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, না, আমদানী হয়নি।

আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব কি কেউ এখানে আছেন? ঠিক দপ্তরের কায়দা-মাফিক সে প্রশ্ন করলে।

না, রে-স্থয়ান আবার জবাব দিলে।

সার্জেণ্ট পাই তাকালো সাদাসিধে পোষাক-পরা লোক দুটির দিকে, আপনারা কি বলেন? ভিতরে যাব?

এই সময়ে বেরিয়ে এলেন বুড়ো দাদুটি।

রে স্থয়ান ঘাবড়ে গেল, হয়তো দাদু সেজ ভাইয়ের কথা ফাঁস করে দেবেন। কিন্তু বরাত ভালো, লোক দুটো বুড়োর সাদা চুল আর দাড়ি-গোঁফ দেখে একটু স্বস্তি পেল। তারা দোটানায় পড়ে গেল—বাড়ীর ভিতর ঢুকবে কি ঢুকবে না। সার্জেণ্ট পাই সুযোগ পেয়ে তাদের তাড়াতাড়ি ঠেলে নিয়ে গেল ছ'নম্বর বাড়ীর সামনে।

রে স্থয়ান আর তার দাদু ফটকের দরজা ঠেলে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় গোয়েন্দাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে কড়াভাবে বললে,

শোন, আদমশুমারির হিসেব মতো আমরা পাশ দেব, আর, না জানিয়ে আমরা এসে হানা দিয়ে তল্লাসী চালাব। যখন তখন আসবো—রাতদুপুরেও হামলা চলবে। যদি খাতার লেখার সঙ্গে হিসেব না মেলে, তাহলে কড়া শাস্তিই হবে। মনে থাকে যেন।

রে স্থয়ান যেন আগুন গিলছে, তেমনি করেই অতিকষ্টে মুখ বুজে রইল।

বুড়োর জীবনের আদর্শ হচ্ছে লজ্জা, বিনয়ী হয়ে থাকা। অতি বিনয়ে তিনি গোয়েন্দাটির কথা শুনে গেলেন, তারপর হেসে বললেন, হাঁ, হাঁ, আপনাদের কাজে তো ধকল কম নয়। আসুন না, এক পেয়ালা চা খেয়ে যাবেন?

গোয়েন্দাটি কিছু না বলে গট্‌মট্‌ করে ফিরে গেল। বুড়ো দাদু তার দিকে তাকিয়ে এখনো হাসছেন, তাঁর বিনয়ের যেন সীমা নেই। রে স্থয়ান দাদুকে প্রাণ ধরে মন্দ বলতে পারলো না। আপেলের খোসবাই ছাড়ে, দেখতেও চমৎকার, কিন্তু যখন পচে যায় তখন একটা জালি শসার চেয়ে তার দাম কমে যায়। চীনও যেন তেমনি এক পাকা আপেল। দীর্ঘ এক সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে সে চলেছে, কিন্তু তার ভিতরটায় শুরু

হয়েছে পচন। আর সে পচন আরো দগদগে হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, পঁচাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ, গোয়েন্দারের দিকে তাকিয়ে হাসেন, তাদের সেলামও ঠোকেন।

বুড়ো দাদু ফটকের দরজা বন্ধ করে রে স্থয়ানকে শুধালেন, সার্জেণ্ট পাই কি বললেন? সেজর কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন নাকি?

সেজ ভাই মরে গেছে বলেই লেখা হোলো, রে স্থয়ান চাপা গলায় উত্তর দিলে।

একুশ

শীত দিনকে দিন বাড়ছে। চি-রা যে কি জুন মাসের দু-এক গাড়ি কয়লার গুঁড়ো সওদা করে রাখেন। তখন দিনকাল থাকে ভাল; বৃষ্টিও হয় না। তারপর ঠেলাগাড়িতে করে মাটি এনে উঠানে ঢিবি করা হয়। দুটো কুলি সেই মাটি আর কয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে ওঁদের জন্যে কয়লার গুল তৈরী করে। শীতে এগুলোর দরকার হয়। এবছর, সহরের ফটক কখনো বন্ধ কখনো খোলা থাকতো, তাই কয়লা আনবার স্থবেধি হয়নি, তাছাড়া যখন লড়াই চলছিল, তখন কেউ ভাবেইনি যে, এসবেরও দরকার পড়বে। কিন্তু বুড়ো দাদু যখন রাতের পর রাত চোখের পাতা এক করতে পারেননি, তখন গুলের কথাও ভেবেছেন বইকি।

কয়লার দাম ফি-রোজই চড়তি। উত্তুরে হাওয়াও ঘন ঘন বইছে। তাংসান থেকে কয়লা আমদানী জাপানীরা বন্ধ করে দিয়েছে। পুব পাহাড় অঞ্চলের কয়লার খনিতে কাজ বন্ধ। সেখানে জাপানী আর গেরিলাদের নিত্যি লড়াই চলছে।

চি-দের বাড়ীতে শুধু বুড়ো দাদু আর তিয়েন ইয়ুর ঘর ছাড়া আর কোথাও ফাঙ্ (ইঁট দিয়ে বাঁধানো খাট) নেই। অন্য সব কামরায় ঐ ইঁটের খাটগুলো তুলে ফেলে সেখানে হাল-ফ্যাসানের খাট পাতা হয়েছে। কিন্তু বুড়ো দাদু ফাঙ্-এর ভক্ত। ফাঙ্ ঘরে রাখা মানে, তিনি পুরানোকে বাতিল করে নতুনের পিছনে ধাওয়া করেন না। এই ইঁটের বিছানা বহু পুরানো

জিনিস, এর ভাল দিকও যথেষ্টই আছে। বুড়ো দাদুর ঘরখানা দক্ষিণ-দুয়ারী, আলোও বেশ আসে, দেয়াল বেশ পুরু, কনকনে হাওয়াও তেমন পায় না। কিন্তু শীতকালে শেষ রাতে তাঁর মনে হয়, তার কাঁধ আর কপাল যেন হিম হয়ে আসছে। বুড়ো বেড়ালের মত পুরু লেপের ভিতরে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকেন; তবু শীত তাঁর যায় না। শুধু ইটের খাটের মাঝখানে একখানা গনগনে আগুনের তাওয়া রেখেই তিনি সারারাত আরামে ঘুমুতে পারেন।

তিয়েন ইয়ুর গিন্নির কিন্তু এই তপ্ত ইটের পাঁজার উপর ঘুমুতে ভাল লাগে না। কিন্তু তবু তিনি এই ইটের পাঁজা এখনো ঘরে রেখেছেন। বাচ্চা নাতি-নাতনিরা তাঁর সঙ্গে শোয়। ইটের খাট বেশ চওড়া হয়, ছেলে-পুলেরা শত গড়ালেও মেঝেয় পড়ে যায় না। আর রাতে তাদের তদারক করবারও স্থবিধে হয়। তাঁর কামরাখানা দক্ষিণের বাড়ীতে, উত্তরদুয়ারী কামরা। সব ঘরগুলির চেয়ে এইখানাই বেশি ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে। শীত যখন খুব বেশি পড়ে, তখন বোতলের জলও জমে গিয়ে বোতল ফেটে যায়। তাই তিনি বাধ্য হয়ে তাওয়া বসিয়ে কখনো-সখনো বিছানা গরম করে নেন।

টাকা থাকলে রে স্থয়ান চড়া দাম দিয়েও কয়লা কিনে শীতকালের জন্য ঘর ভর্তি করে রাখতো। কিন্তু ক'মাস ধরে সে আর রে ফেঙ্ মাইনেই পায়নি, আর তার বাবার আয়ও হয়েছে অতি কম।

রে স্থয়ান ভবিষ্যৎ যেন দিব্যচোখে দেখতে পেল। আজ কয়লা নেই। কাল যে চালে টান পড়বে না তাই বা কে বলতে পারে! আগে সে জানতো, বিজিত দেশের শোচনীয় পরিণাম আনে তলোয়ার আর গুলী। কিন্তু আজ সে বুঝতে পারছে, মৃত্যু তো আকস্মিক আঘাত নয়। গোটা পরিবারটা শীতে আর উপোসে মারা যেতে পারে। পিপিং ছেড়ে না যাবার পক্ষে যত যুক্তি দেখিয়েছিল, আজ তা একে একে সে বাতিল করে দিল।

ভীষণ মুষড়েই সে পড়েছে। য়ুন মেইর সঙ্গে সে এ নিয়ে আলোচনাও করলো। আগে কখনো পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে সে কারো সঙ্গে আলাপ করেনি, কিন্তু এখন বৌয়ের কাছে সে পিপিং ছাড়ার যুক্তি দেখালে, জানালে এ তার কর্তব্য।

য়ুন মেই তেমন রাজি নয়। এরই জন্য যে স্বামী শহর ছেড়ে চলে যাবে তার তা সয় না। সে বললে, আরে কয়লা সময়মতো মিলবে। ও নিয়ে ভেবে কি হবে? আর যদি উপোস করার কথা বল, উপোস করানো চাট্টিখানি কথা নয়। তুমি চলে গেলে মেজো সংসার চালাতে পারবে না। আমার ইচ্ছে থাকলেও আমি তো আর রোজগার করতে পারবো না। কিন্তু তুমি অতো ভেব না বাবু! অমনি আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু করলে? দিন কেটে যাবেই। শুধু শুধু ভেবে লাভটা কি?

য়ুন মেই-র কথায় কল্পনার বিলাস নেই, নেই আদর্শের কথা, কিন্তু প্রতি কথাটা ওজন করে সে বলেছে। রে স্যুয়ানকে তর্কের কোনো অবকাশ দেয়নি। যা-ই হোক্ না কেন, গোটা পরিবারকে সে আর পিপিং-এর বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই গোটা পরিবারের সবাইকে নিয়ে এখানেই তাকে পড়ে থাকতে হবে। এ তো দুই আর দুইয়ে চারের মতো সত্যি কথা।

রে স্যুয়ানের শুধু মনে আশা, জাতীয় বাহিনী আবার পিপিং জয় করবে।

কিন্তু তাইওয়ান যে গেল, শেনসি প্রদেশের রাজধানী তাইওয়ান!

আবার আকাশে উড়লো ফানুস :—তাইওয়ান পতনের উৎসব।

ছেলেমেয়েরা কাতারে কাতারে চললো মিছিলে।

রে স্যুয়ান চাকরীতে ইস্তাফা দেবে ভেবেছিল, কিন্তু যেদিন থেকে রে ফেঙও ইস্কুলে গেল না, সেদিন থেকে সে আগের মতো ইস্কুলে যেতে লাগলো। বাড়িতে দু দুটি ভাই নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে, আর বুড়োরা গতর নেড়ে রোজগার করবে, এ তার সয় না।

ক'দিন ধরেই রে ফেঙ ভ্রূ কুঁচকে আছে। মোটাসোটা বৌটিও আজ তিন-চার দিন ধরে তার সঙ্গে কথা বলে না। রে ফেঙ তার বৌকে বুঝিয়েছিল সে ইস্কুলের চেয়ে বেশ বড়-একটা চাকরীই জুটিয়েছে, মাইনেও মোটা। বৌ বিশ্বাসও করেছিল। কিন্তু কুয়ানদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে সে আর কথা কয়নি।

কুয়ানদের বাড়িতে তারা পুবস্থর্যের ব্যাপারটা বলতেই গিয়েছিল। রে ফেঙের একটা চাকুরী যাতে কুয়ান একটু তদ্বির করে জুটিয়ে দিতে পারেন—

সে উদ্দেশ্যও যে না ছিল তা নয়। চাকুরীই তো এখন দরকার। রে ফেঙের একটা চাকুরী জুটলে, ওরা কুয়ানদের বাড়ি এসে ভাড়াটে হতে পারবে। তাহলে আর সেজ ভাইয়ের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয় না। রে ফেঙ ভেবেছিল, কুয়ানরা স্বামী-স্ত্রী তাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। তাছাড়া, কুয়ানেরা অতো টাকা জিতেছেন বলেই তো পূবসূর্যের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধলো। এদিক থেকে একটা বাধ্য-বাধ্যকতাও তো আছে। কুয়ান ভদ্রভাবেই তাদের আদর করে বসালেন, কিন্তু কথাটা উঠতেই, বড় লঙ্কার উপর সেটা চাপিয়ে দিয়ে নিজে সরে গেলেন। বড় লঙ্কার আজ সাজের ঘটা কত! লাল রেশমের প্যাড দেওয়া কামিজ তাঁর গায়ে, মুখে পুরু করে মাখা লিপস্টিক। চুলে কেয়ারী। ডুম্বার লেজের মতোই দেখাচ্ছে কেয়ারীটি। আগের থেকেও ব্যবহারটা আরো দরাজ। মুখের ব্রণ থেকেও যেন খুশির ভাব উপছে পড়ছে।

সেজ ওয়াঙ যখন কুয়ানদের বাড়িতে চড়াও হয়ে কাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন, সেই সময়ে যে অতিথিটি হাজির ছিলেন, তিনি মুরুব্বীর জোরে এবার সফল হয়েছেন। শহরের গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তা হয়েছেন। এ খবর শীগ্‌গীরই কাগজে বেরুবে।

তাঁর নাম বাঁজা পাহাড় আর পদবী লি। গণ্ডায় গণ্ডায় তাঁর বৌ, আর তার মধ্যে বেশিই বেশ্যা। এত বড় কাজটা পেয়ে তাঁর চেতনা হোলো, এবার বেশ্যার পাল তাড়িয়ে দিয়ে ভাল পরিবারের একটি ভাল মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবেন। তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে এই বাউণ্ডুলেমি আর বেশ্যা পোষা মানায় না। আর মেয়েটি একটু শিক্ষিতাও হওয়া চাই। মেদীর দিকে তাঁর চোখ পড়লো। কিন্তু বড় লঙ্কা সস্তায় মেদীকে বিকিয়ে দেবার পাত্র নন। বরং কাওদীকে তিনি দিতে পারেন, কিন্তু মেদীকে নয়। আর তা ঠারে-ঠোরে জানিয়েও দিলেন। বাঁজা পাহাড় তাতেও রাজি। কাওদী সুন্দরী না হতে পারে, কিন্তু যুবতী—ইস্কুলেও পড়াশুনা করে। যখন দরকার হবে, তখন না হয় আবার দু'একটা বেশ্যা এনে পুষবেন। কাওদী হবে তাদের কর্ত্রী। হাঙ্গামা তো কিছু নেই।

কিন্তু বড় লঙ্কা মাগ্‌না মেয়ে বেচতে রাজি নন্। তাই বাঁজা পাহাড়কে কথা দিতে হোল, বেশ্যাদের তদারকির জন্যে যে দপ্তর্ আছে, তার কর্ত্রীর

কাজটা বড় লঙ্কাকে দিতে চেষ্টা করবেন। নানকিং-এ রাজধানী চলে যাবার পর দপ্তরটা চালু ছিল না, এখন জাপানী ফৌজের তোয়াজের জন্য দপ্তর আবার চালু করা হয়েছে। রোগগুলি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তারও ভার এই দপ্তরেরই উপর। বাঁজা পাহাড় দেখলেন, বড় লঙ্কার ক্ষমতা আছে, তাঁর হাতে এ দপ্তরের আয় বাড়বে। তাছাড়া একটু কড়া শাসন চালালে, এ দপ্তর থেকে বেশ দু-পয়সা আসবে। এমন একটি দপ্তরের ভার যদি হবু-শাশুড়ীর উপর দেওয়া যায়, তাহলে মাঝে মাঝে কাওদীর উপর জোর-জুলুম চালাতে পারবেন—আর মাঝে মাঝে 'বেশ দু-পয়সার' ভাগও পাবেন। যখনি বড় লঙ্কা তাঁকে টাকা নজরানা দেবেন, দু-তিন দিন তিনি কাওদীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন—আবার যে-কে সেই। এমন করে বড় লঙ্কার ঘুসের টাকাটার বেশির ভাগই তাঁর পকেটে আসবে। এমনি মতলব ভেঁজে তিনি বড় লঙ্কার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। হালে যতটুকু খবর জানা গেছে, তাতে কাজটা নাকি একরকম গেঁথেই ফেলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বড় লঙ্কাও ভোল পালটেছেন। ওঠা, বসা, শোওয়া, পাইখানায় যাওয়া, সব সময়েই 'ডাইরেক্টর' কথাটা তার মুখে। এ যেন এক তাল মিছরির ডেলা মুখে পোরাই আছে, সব সময়েই চুক্‌চুক্ করে চুষছেন। যখনি কথাটা আওড়াচ্ছেন, মুখখানা লালায় ভরে যাচ্ছে। খুশিতে উপছে পড়ছেন, গর্ব হচ্ছে। তাঁর ভারি আফশোস, তিনি এক লাফে ছাদে উঠে চেঁচিয়ে বলতে পারছেন না—আমি একটা গোটা দপ্তরের ডিরেক্টার—কর্তা। এখন স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তার ধরনও বদলে গেছে। মুখ থেকে কথাই খসাচ্ছেন না, ধারও ধারছেন না তাঁর। বড় মেয়েটার বিয়ে নিয়েই তাঁর ভাবনা। গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তার দিকে মেয়ের মন টানবার জন্যে ফিকির-ফন্দি আঁটছেন। পীচ-মঞ্জরীর সঙ্গে যুদ্ধং দেহি ভাব আর নেই। এত বড় যিনি, তিনি কি আর তুচ্ছ একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই করতে পারেন? না, না, ওসব তার মানায় না!

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছেন আপন মনে, যখন তখন আমি গিয়ে বেশ্যাগুলোর উপর চড়াও হব। ওরা ভয় পেয়েই টাকা ছাড়বে। বলতে বলতে এমন করে মাথা নাড়ছেন, চুলের কাঁটাগুলি খুলে খুলে পড়ছে। এই সময়ে গিয়ে রে ফেঙ আর তার বৌ হাজির। ঘরের কথা

বলতেই তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, বাড়িতে শীগ্‌গিরই কাজ আছে, ঘরটা আমাদের নিজেদেরই লাগবে। আর বাপু, আমার তো মনে হয় লান লোকটা অতো খারাপ নয়। আপনি আমাদের জন্যে তার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন শুনে দুঃখই হোল, কিন্তু আপনার বিপদের ঝুঁকি আমরা কেন নেব? কি নেবে নাকি? প্রভাতপদ্মের দিকে তিনি তাকালেন।

প্রভাতপদ্ম ঘাড় নাড়লেন।

রে ফেঙ আর তার বৌ উঠে পড়লো। মার-খাওয়া কুকুরের মতো তারা লেজ গুটিয়ে ফিরে এল।

সবচেয়ে এইটেই খারাপ লাগলো যে, পূবসূর্য কুয়ানদের বাড়িতে রোজই আসছে যাচ্ছে, খাতিরও তার বেশ। বড় লঙ্কা চল্লিশটা ডলার পূবসূর্যকে ফেরত দিয়ে বললেন, দেখুন যখনি মাজং খেলি, আমরা লাভের অর্ধেকটা যার হার আছে তাকে ফেরৎ দিই। সেদিন অতো তাড়াতাড়িতে আপনার টাকাটা আর ফেরত দেওয়া হয়নি। আমি দুঃখিত।

পূবসূর্য গলে গেল। সে দুই বোনের জন্যে আধ পাউণ্ডটাক বাদাম নিয়ে এল।

বড় লঙ্কা হেসে বললেন, আপনার পছন্দ আছে বলতে হবে। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে ছেলে-ছোকরাদের টাকার ব্যাপারে হুঁশিয়ার হতে হবে। তাকে বিয়ে-থার জন্যে জমাতে হবে। উপহার সামান্য হোক না কেন, যে উপহার দিচ্ছে তাকেই তো আমরা দেখব। আপনি যদি ওদের দু-পয়সার বাদাম এনেও দিতেন, তাতেও আপনার মনের পরিচয় মিলতো। আর যদি এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে বাজে জিনিস কিনে এনে দিতেন, আপনি কি দরের লোক তা টের পেতাম। বাজে টাকা খরচা আমার মোটেই সয় না।

পূবসূর্য শুনে হলদে দাঁত বার করে হাসলো। কাওদী আর মেদী দু-একটা বাদাম ঠোঙা থেকে নিয়ে মুখে পুরলো। পূবসূর্য ভাবলে দুই ছুঁড়ির মন সে চুরি করে নিয়েছে।

এ খবর পীচ-মঞ্জরীর মারফৎ শুনলো রে ফেঙের বৌ। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে সে ফিসফিস করে বলে গেল বাড়ির কাণ্ডকারখানার কথা। রে ফেঙের মোটা বৌ তো শুনে রেগে মূর্চ্ছা যায় আর কি।

সে কথাটি না বলে দু-একটা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে মার কাছে চলে গেল।

বাইশ

তাই ওয়ানের পতনের মিছিল বেরুল। এবার পূবস্থর্য বেশ খুসি। পাওতিং পতনের উৎসব থেকে এবার লোকও বেশি হয়েছে, অনুষ্ঠান-স্থচীও এবার অনেক ভালো। কিন্তু একেবারে বাজি মাৎ করতে সে পারেনি। জাপানীদের তেমন মন পায়নি। মধ্য পার্কের অপেরা দেখে তারা খুশি নয়। পূবস্থর্য আর তার সঙ্গীরা তৈরি করেছে অনুষ্ঠানস্থচী, কিন্তু তারা অপেরা সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। ওরা মাত্র পিকিং-এর ক'দিনের বাসিন্দে। শুধু জানে, পিকিং-এর অপেরা ভাল; কিন্তু কেন ভাল তা জানে না। ওরা জোর করে বড় বড় পেশাদার আর সখের অভিনেতাদের টেনে বার করলো, কিন্তু এবার পড়লো মুশকিলে। কোন্ অপেরা যে ভাল, কে বাছাই করবে? আর সবচেয়ে ভুল করে বসলো বাছাইয়ে। জাপানীরা, যৌন ব্যাপার আছে এমন পালা দেখতে চায়, কিন্তু ওরা তা দেখাতে পারলেন না। তিরিশ বছর হোলো যৌন পালাগুলো নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এই দল তাদের নামও জানেনা, কোন্ অভিনেতা যে তাতে ভাল অভিনয় করবেন, তাও না।

পূবস্থর্য ভাবলে, প্রভাতপদ্ম দলে থাকলে এমনটি হোতনা। তাই প্রভাতপদ্মের বাড়িতে আবার আসা-যাওয়া শুরু করলে। তাকে নব জনসংঘে ঢুকিয়ে নেবার তার ইচ্ছে নেই। কি জানি, প্রভাতপদ্ম হয়তা তাকে ডিঙিয়েই যাবেন। তাই সে কথায় কথায় অনেক কিছু বার করে নিতে চাইলে।

সে এসে দেখলে একপাল ছেলে-মেয়ে ফটকের কাছে জটলা করছে। কতগুলি ভিক্ষুক দেয়ালে সাঁটছে লাল ইশেতেহার। সাঁটছে আর চেঁচাচ্ছে: ভাল খবর নিয়ে এলাম। আপনার আরো পয় হোক।

বড় লন্ঠার দপ্তরের ডিরেক্টার হবার খবর বেরিয়ে গেছে। বৌকে খুশি করবার জন্ম প্রভাতপদ্ম পুরানো কায়দা-মাফিক হু'খানা ইশতেহার সেঁটে দিয়েছেন। তাতে লেখা—শুভসংবাদ। আর ন'কর্তা লিকে দিয়ে হুটো ভিখারী জোগাড় করে আনিয়েছেন। ওরা পুরানো কায়দায় চেঁচাচ্ছে,

আর খবরটা জানিয়ে দিচ্ছে। প্রভাতপদ্ম যখন উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরোন, তখন এই প্রথা বজায় ছিল। ভিখারীরা সেদিনও এসে সুসংবাদ ঘোষণা করেছিল। গণতন্ত্র কায়েম হবার পর থেকে এই প্রথাটা আস্তে আস্তে উঠে যায়। তাকে আবার আজ বাঁচিয়ে তুললেন প্রভাতপদ্ম।

ভিখারীরা তিন-তিনবার বখশিস চাইলে, তিন বারই প্রভাতপদ্ম বখশিস করলেন। প্রতিবারেই কম করে দিলেন, যাতে আরো চায়, আরো চেঁচায়। পূবসূর্য যখন এল, তখন ভিখারীরা চারবারের বার বখশিস চাইছে। কুয়ানের হাতে তখনো বিশ সেণ্ট আছে। কিন্তু তখনো তিনি ফটক খুলে বেরিয়ে আসেন নি। তিনি চান, ওরা আর কিছুকাল চেঁচাক। তাঁর এক আশা, খুদে খাটালের সবই জানুক, ফটকের সামনে এসে ভিড় করুক। কিন্তু সে গুড়ে বালি, শুধু ছেলেপুলের দলই এসে জুটছে। ওদের মধ্যে সব চেয়ে বড় চেঙ চ্যাঙ সুন।

তাঁর সুসংবাদের ইশ্‌তেহারগুলো বেশ ভাল করেই লেখানো। বড় লঙ্কা যদিও বেশ্যা দপ্তরের ডিরেক্টার হয়েছেন, সে কথাগুলি ইশ্‌তেহারে চেপে গেছেন কুয়ান। প্রাচীনকালের ভাষায় বেশ্যাকে যে কি বলে তা তার জানা নেই। তাই অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে। শেষে এল অনুপ্রেরণা; তিনি বেশ ধরে ধরে লিখলেন: মহিমাবরা শ্রীমতী কুয়ানের প্রাসাদ—যিনি উপযুক্ত মহিলাদের দপ্তরের কর্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

পূবসূর্য ইশ্‌তেহারের দিতে তাকালো। 'উপযুক্ত মহিলা' কথাটার মানেটা যে কি সে বুঝলোনা। ঠিক সেই সময়ে দুহাত নাড়তে নাড়তে ফটকের আগল ঠেলে কুয়ান বেরিয়ে এলেন। মুরগীর ছানাগুলিকে তাড়িয়ে দেবেন এমনি তাঁর ভাবখানা। মুখ থেকে কথারও তুবড়ি ছুটছে, যাও যাও, চলে যাও! তোমাদের চিৎকারে তো কান ঝালাপালা হয়ে গেল! এবার বিশ সেণ্ট ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর এক পয়সাও দেবনা, যাও তো! কথা শেষ করে তিনি জানিয়ে দিলেন, এই-ই শেষবার। ওরা বিশ সেণ্ট কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

প্রভাতপদ্মের যেন এবার পূবসূর্যের উপর নজর পড়লো। তাড়াতাড়ি বললেন, আরে আপনি যে! আসুন, আসুন!

উঠোনে এসে গেলেন। কাগজের জানালায় জোর হাওয়া বয়ে গেলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ উঠছে। প্রভাতপদ্ম তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, মহিলা কাসছেন। উনি এখন ডিরেক্টার হয়েছেন। ওঁর কাসি এখন বোমা-কেও হার মানায়।

বৈঠকখানায় জাঁকিয়ে বসেছেন বড় লঙ্কা। কাসছেন, হাসছেন, বাণী দিচ্ছেন। তাঁর কথা, হাসি আর কাসির দমকে কড়িবড়গাও বুঝি কেঁপে কেঁপে উঠছে। এমন কি নিশ্বাসও যেন লাউড-স্পীকারের চোঙ থেকে বেরিয়ে আসছে। পূবসূর্যকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন না, শুধু কায়দা করে একটু মাথা নোয়ালেন, তারপর পাউডার-মাখা হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। এমনই তাঁর ভাবখানা, মেয়েরাও যেন আর 'মা' বলে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না, কুয়ানেরও যেন 'ওগো' বলতে গলায় আটকে যাচ্ছে। ডিরেক্টার বলেই তাঁরা ডাকছেন। পূবসূর্য বসে পড়লো। বড় লঙ্কা গলার স্বর বদলে ফেলেছেন। আলস্যে স্বর যেন আর বেরোয়ই না, কিন্তু তবু হুকুমের আমেজ আছে। স্বর ভারি, দানা আছে। তিনি এবার মাপা-জোপা স্বরে বললেন, আসুন, চা ঢেলে দিই! পূবসূর্য এরকম মেয়ে-মানুষ কখনো দেখেনি। আগের বড় লঙ্কা আর নেই। দু'দিন আগের মানুষের ভোল পালটে গেছে। এখন তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশেছে দপ্তরের কর্তৃত্ব। দুয়ে মিলে একাকার হয়ে গেছে।

প্রভাতপদ্ম পূবসূর্যকে বাঁচিয়ে দিলেন। বড় লঙ্কাকে বললেন, শ্রীমতী ডিরেক্টারের ইনি সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বড় লঙ্কা যেন রেগেছেন, অথচ আসলে রাগেননি, যেন হাসছেন, অথচ আসলে হাসছেন না, এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন—শ্রীমতী ডিরেক্টার আবার কি? শুধু ডিরেক্টার।

প্রভাতপদ্ম হেসে বেশ মিষ্টিস্বরে বেশ মিহি করে বললেন, ডিরেক্টার, পূবসূর্য এসেছেন অভিনন্দন জানাতে।

পূবসূর্যের মুখখানা কুঁচকে গেছে, সে দাঁড়িয়ে পড়লো। এখনো মুখে রা নেই। হাঁ হয়ে গেছে মুখ, হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

না, না, অভিনন্দনের আমি যোগ্য নই। বড় লঙ্কা তবু উঠছেন না। রাজমাতার মতো তিনি তক্তে বসে আছেন, মন্ত্রীদের সম্ভাষণ গ্রহণ করছেন।

এমন সময়ে উঠোনে কর্কশ স্বর বেজে উঠলো, অভিনন্দন, অভিনন্দন জানাচ্ছি!

রে ফেঙ! প্রভাতপদ্ম চাপা গলায় বললেন।

ওকে ডেকে নিয়ে এস! বড় লঙ্কা রে ফেঙকে দেখতে পারেন না, তাই বলে অভিনন্দনটা মারা যাবে, তাও চাননা। অভিনন্দন স্বীকার না করলে খারাপও তো হতে পারে।

প্রভাতপদ্ম দরজার কাছে গেলেন তাকে নিয়ে আসতে। আসুন, আসুন, আমরা আপনাকে কি বিপদেই না ফেলেছি! এসেছেন, এ আমাদের কত ভাগ্য!

রে ফেঙ তার সেরা পোষাক পরে এসেছে, তার উপরে চাপিয়েছে খাটো কালো একটি কোট। যেন কোন উৎসবে চলেছে এমনি তার পোষাক। সামনের সিঁড়িতে উঠে সে থমকে দাঁড়াল। আগে নিজের স্ত্রীকে যেতে দিলে। এটা বিদেশী রীতি—সে সিনেমায় দেখেছে। মোটাসোটা স্ত্রীটিও আজ খুব সেজেছে। মুখে গর্বের ঝলমলানি, তাতে আরো চাকার মতো দেখাচ্ছে মুখখানা। মাথা উঁচু করে, পাছা দুলিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। হাতে তার একটা উপহারের মোড়ক।

বড় লঙ্কা উপহারের লাল আর সবজে রঙের মোড়কটা দেখে অজান্তে উঠে দাঁড়ালেন।

ব্যবহারে পূবসূর্যের চেয়ে রে ফেঙ দশগুণ সরেস। সে পিপিং-এর মানুষ, আদব-কায়দায় দোরস্ত।

অভিনন্দন জানিয়ে সে নুয়ে পড়ে অভিবাদন করলে, তারপর স্ত্রীর হাত থেকে মোড়কটি নিয়ে টেবিলের উপর রাখলে। মোড়কটা তেমন কিছু নয় কিন্তু সারা ঘরে যেন উৎসবের রোশনাই ছড়িয়ে দিলে।

সব চুকে বুকে গেলে এবার সে পূবসূর্যকে বললে, পূবসূর্য, আপনিও এসেছেন! এ ক'দিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে ইস্কুলেই যেতে পারিনি। তারপর আছেন কেমন?

পূবসূর্যের মুখ বিকৃতি শুরু হয়েছে, চোখের মণি দুটো ঘুরছে, মনে মনে সে হাসলে, দাঁড়াওনা শীগ্‌গীরই তোমাকে জেলে পুরছি! আমার কাছে ওসব জারিজুরি খাটবে না!

এরই মধ্যে রে স্থুয়ানের বৌ বড় লঙ্কার পাশে বসে পড়ে জানালে, রে ফেঙ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ব্যবস্থাপনার দিকটার কর্তা হয়েছে। সে সত্যিই আর বড় লঙ্কাকে অভিনন্দন জানাতে আসেনি, সে এসেছে শোধ তুলতে। তার স্বামীও এখন কেউ-কেটাদের মধ্যে একজন, একটা গোটা দপ্তরের কর্তা।

কি? খবরটা শুনে কুয়ানরা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন। বড় লঙ্কার মনে বড় বাজলো, স্বামী ডিরেক্টরের মান রাখলেন না। একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে তাঁর মান খোয়ালেন! আরো যাতে মান না যায়, তাই বললেন, আমাকে আগে বলতে দাও!

প্রভাতপদ্ম কয়েক পা পেছু হটে গিয়ে হেসে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! ডিরেক্টারের কাছে মাপ চাইছি।

বড় লঙ্কা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের গোদা হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। অনেকগুলি সোনার আঙটি ঝলমল করে উঠলো হাতে। কি? বিভাগের কর্তা চি, আপনি আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন? এসে ঘরে ঢুকে একটা কথাও তো বলছেন না। আপনি নিজের কথা তো চেপেই রেখেছিলেন! তিনি রে ফেঙের হাত চেপে ধরলেন। আঙটি কেটে বসছে রে ফেঙের হাতে। এবার তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে হাঁক দিলেন, ওরে কে আছিস, মদ নিয়ে আয়! ইংরেজ রাজবাড়ির ব্রাণ্ডি আনবি কিন্তু। তারপর সবাইকে বললেন, বিভাগের অধ্যক্ষ আর তাঁর স্ত্রীর সম্মানে পান করব।

রে ফেঙ তাড়াতাড়ি বললে, না, আগে আমরা অভিনন্দন জানাব দপ্তরের ডিরেক্টার আর তাঁর মহামান্য স্বামীকে।

প্রভাতপদ্ম মিষ্টি হেসে বললেন, আমরা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাব।

পুবসূর্য দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানি কেমন কালচে মেরে গেছে। হিংসে হচ্ছে তার। ভাবি তার দুঃখ, ক'দিন আগে কেন সে রে ফেঙকে জেলে পাঠায়নি। এখন কোনো উপায়ই নেই। ওর সঙ্গেই আবার ভাব করতে হবে। রে ফেঙকে ঘৃণা করলেও বিভাগের কর্তাকে তো ঘৃণা করা যায় না।

মদ এল, বিদেশী কেতায় গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি হোল।

রে ফেঙ কি করে এতবড় চাকরীটা পেল তারই গল্প করলে। আমার গিন্নিকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। ওর মেজোকাকা শিক্ষা-বিভাগের নতুন কর্তার ধর্মভাই। ওর মেজো কাকার পরামর্শেই তিনি এই কাজটি নেন। নইলে পেতেন না। উনিও এক সময়ে শিক্ষা-দপ্তরের বড় কর্তা ছিলেন। আমার গিন্নি আবার ওখানে খুব আসেন যান। উনিই খবরটা পেয়ে ধরলেন কাকাকে।

পূবস্থর্য উসখুস করছে। সে উঠতে চায়। ঘরের আবহাওয়া এমন যে তার আর সইছে না। বড় লঙ্কা তবু তাকে উঠতে দেবেন না। বললেন, যাবেন? আপনি যেন কেমন মানুষ! আজকের দিনে একটু আমোদ-প্রমোদ হবে না? যদি একান্তই যেতে চান ধরে রাখতে তো পারব না। তবে সবার আগে আমার কথাটা একটু শুনে যান। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে একখানা হাত বুকের উপর, আর একখানা টেবিলের উপর রেখে বললেন, পূবস্থর্য, আপনি নব জনসংঘের সভ্য। রে ফেঙ, আপনি শিক্ষাদপ্তরের মানুষ। আর আমি? আমাকেও সরকার অবহেলা করেন নি। আমি এখন ছোট-খাটো এক দপ্তরের ডিরেক্টার। আর প্রভাতপদ্ম? উনিও শীগ্গিরই একটা কাজ পাবেন। এই রাজ্য অদল-বদলের দিনে আমাদের শুরু তো ভালই হয়েছে। কিন্তু আমাদের একত্র হতে হবে, নতুন পৃথিবীকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে হবে—নিজেদের পরিবারের সবাইকে কাজ জুটিয়ে দিতে হবে। আমরা চাই টাকা, চাই ক্ষমতা। জাপানীরাই প্রথম সুযোগ নেবে। কিন্তু দ্বিতীয় দফা সুযোগ আমাদেরই নিতে হবে। তাই আজ আমাদের এক হয়ে ক্ষমতা স্থষ্টির দিন এসেছে, যাতে সবাই, এমন কি জাপানীরাও আমাদের কথা শোনেন, আমাদের সুযোগ-সুবিধা দেন।

এক নিশ্বাসে তোঁতা পাখীর মতো বড় লঙ্কা বলে গেলেন। কথাগুলো তাঁর বহুবার মহলা দেওয়া, ভুলচুক হবার জোটি নেই।

রে ফেঙ ঘাড় কাত করে শুনছিল তাঁর কথা। বড় লঙ্কার কথার সঙ্গে সঙ্গে তারও ঠোঁট নড়ছিল।

প্রভাতপদ্মও এতক্ষণ বসেছিলেন, এবার তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে হাততালি দিলেন।

এবার বিভাগীয় অধ্যক্ষের গৃহিণীর কাছ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই।

রে ফেঙের বৌ উঠে দাঁড়াল। প্রভাতপদ্ম আরো জোরে হাততালি দিতে লাগলেন। কিন্তু বক্তৃতা দেবার জন্যে সে ওঠেনি। সে রে ফেঙকে বললে, চল গো বাড়ি যাই! কত কাজ পড়ে আছে!

বড় লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ঠিক, ঠিক! আর একদিন উৎসব হবে। আজ তো আমরা সবাই ব্যস্ত।

বিভাগীয় অধ্যক্ষ আর তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের ফটক অবধি এগিয়ে দিতে এলেন ডিরেক্টার আর কুয়ান স্বয়ং। বাইরে তাঁরা চলে গেছেন, এমন সময় বড় লক্ষ্মীর কি মনে পড়লো। তিনি হেঁকে বললেন, অধ্যক্ষ চি, আপনারা যদি এ বাড়িতে আসতে চান তো, আসুন! আমরা খুশিই হব।

অধ্যক্ষের মোটাসোটা স্ত্রীটির জবাব তৈরীই ছিল। সে বললে, না, আর দরকার নেই। আমরা মেজ কাকার ওখানেই উঠছি। বাড়িটা ভাল, তাছাড়া দপ্তরেরও কাছে। তাছাড়া—সে বলতে চাইল, এখানে দাদু, শ্বশুর-শাশুড়ী সব পাড়াগেঁয়ে, অধ্যক্ষের বাপ-দাদা হবার পক্ষে তারা বেমানান, কিন্তু রে ফেঙের দিকে তাকিয়ে চুপ করেই গেল। স্বামী তার অধ্যক্ষ, তার তো মান রাখতে হবে। ওকথা জিভ নেড়ে অমনি বললেই হয় না!

রে স্যুয়ান খবরটা শুনে আরাম পেল। রে ফেঙ যা-ই-ই করুক, সে চলে তো যাচ্ছে। যদি আবার না ফিরে না আসে তো ভালই হয়।

কিন্তু রে স্যুয়ানের মত আবার বদলে গেল। মেজ আর তার বৌকে এভাবে যেতে দেওয়া চলে না। সে বড় ভাই। অন্ততঃ কিছু বলতেও তো হয়। বলতে হবে, জাপানের তাঁবেদার কোনো ভাই রে স্যুয়ানের নেই—থাকতে পারে না। সেজো পিপিং ছেড়ে চলে গেছে দেশের ডাকে। আর মেজ যদি বাড়িতে বসে জাপানের তাঁবেদারগিরি করে, তাহলে তার মান বাঁচবে কি করে?

মেজোর জন্যে সে উঠোনে বসে রইল। ডালিম আর করবীর টবগুলি শীতের জন্য পুবের ঘরে রাখা হয়েছে। উঠোন ফাঁকা। দক্ষিণের দেয়ালের ধারের চারা গাছগুলি মরে গেছে। আর সব বছর হলে এতদিনে উনুনের ছাই এনে মরা গাছের উপর ঢেলে দেওয়া হোত, টব উপুড় করে ঢেকে দেওয়া হোত তাদের উপরে। কিন্তু এবছরে বুড়ো দাদুর কোনো দিকে নজর নেই।

শুধু মাঝে মাঝে বাড়ির লোকদের শান্ত করবার জন্য বলেন, বিপদ শীগগীরই কেটে যাবে। কিন্তু নিজে আবার সেকথা বিশ্বাসও করেন না। ফুল গাছ-গুলো যে ঢেকে রাখেননি সেই তার প্রমাণ। খেজুর গাছ দুটোরও এখন পাতা নেই। একজোড়া টুনটুননী পাখী তারই তলায় বসে আছে। বাড়ির আশেপাশে শুকনো ঘাসের গোছা দুলছে হাওয়ায়।

রে স্থয়ান রে ফেঙকে ফটকের ভিতর দিয়ে আসতে দেখে তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সে তখুনি জিজ্ঞেস করলে, মেজো, তুমি কি এই চাকরী নিচ্ছ নাকি?

মেজো কোটের কলার টেনে শান্তভাবে বললে, নিশ্চয়ই! একটা বিভাগের কর্তার চাকুরী তো আর পথেঘাটে ছড়াছড়ি যায় না।

এতে যে তুমি বিশ্বাসঘাতক হবে তা কি জানো? রে স্থয়ানের দৃষ্টি যেন তাকে বিঁধছে।

রে ফেঙ কথাটা আওড়ালে, বিশ্বাসঘাতক! এটা তো সে ভাবে নি। আস্তে আস্তে সে বললে, বিভাগের অধ্যক্ষ আর বিশ্বাসঘাতক দুটো কথা একেবারে আলাদা।

শান্তির সময় তাই-ই বটে, রে স্থয়ান বলে উঠলো, আজকাল ভেবে-চিন্তে কাজ করা উচিত। পিপিং এখন জাপানীদের দখলে।

মেজো পাল্টা আক্রমণ চালালে, তাই যদি বল, বাবা কি তাঁর দোকানে জাপানী মাল বেচছেন না, আর তুমিও তো ইস্কুলে পড়াচ্ছ?

রে স্থয়ান হেসে বললে, এগুলো কিন্তু এক নয়। গোটা পরিবারের খোরপোষের কথা ভেবে একটা মানুষ যদি শহর ছেড়ে দেশের কাজে না যেতে পারে, সে কি বিশ্বাসঘাতক হোলো? সে তো আর জাপানী তাঁবেদারি করতে যাচ্ছে না। দেখ, পিপিং-এ কত মানুষ। এঁরা সবাই কি আর শহর ছেড়ে যেতে পেরেছেন? যারা যায় নি, তাদের রোজগার করতে হবেই। তাছাড়া উপায় কি! কিন্তু যারা ইচ্ছে করে জাপানীদের রাতদিন সেলাম বাজাতে যায়, তাদের আমি কি বলবো? পূর্বসূর্য, প্রভাতপদ্ম আর তুমি তো সেই দলেরই মানুষ। তোমাদের বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কি বলা যায়? তুমি ইচ্ছে করলে শহর ছেড়ে যেতে পারতে, আর তাই ছিল উচিত—কিন্তু তুমি নারাজ। বেশ তো নারাজ আছ ভাল কথা। নিজের কাজ ধীরে সুস্থে

করে যাও। তখন শুধু যেতে পারনি বলেই মন খারাপ হবে—কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তো কেউ বলবে না। কিন্তু তুমি ওদের হয়ে কাজ করতে চাইছ। ওদের হয়ে শাসন করতে যাওয়া মানে তো নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া। আজ বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে খুশি আছ। কাল গোটা বিভাগের সর্বময় কর্তা হতেও তোমার বাধবে না। নিজের মনে মনে ভেব দেখ, খতিয়ে দেখ, তুমি দেশদ্রোহী না দেশভক্ত, তারপরে নিজের কাজ নিজে করে যাও। ছোট কি বড় চাকরী পেলে সেইটেই বড় কথা নয়, বড় কথা, নিজের মন জানা। মেজো, শোন, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাও। খাঁটি মানুষ হও! আমি যেতে পারছিনা! দাদু, বাবা, মা, এঁদের ছেড়ে আমার যাবার উপায়ই নেই। কিন্তু তবু জাপানীদের কাছ থেকে ভিক্ষে মেগে খাব না। ইস্কুলে যদি পড়ানো সম্ভব হয়, পড়িয়ে যাব। যদি সম্ভব না হয়, অন্য কাজ খুঁজে নেব।

কথাগুলো বলে রে স্যুয়ান আরাম পেল। যেন মাছের কাঁটা গলায় বিঁধেছিল, বেরিয়ে গেছে। শুধু মেজোকেই সে পরামর্শ দেয় নি, নিজের অবস্থাটাও বুঝতে পারছে। হাঁ সে একটা আপস করে নিয়েছে—কিন্তু সে আপস আত্মসমর্পণ নয়। আপস আর আত্মসমর্পণের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদ—সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু আজ সেই চুলচেরা বিচার করতে পেরে সে খুশি হোল। বলার ভঙ্গিতে সে খুশি হয় নি, নিজের আত্মবিশ্বাস তাকে খুশি করে তুলেছে। তার মন তো এই-ই চায়। সে এতদিন বুঝতে পারেনি।

রে ফেং উঠে পড়ে কোটের ভাঁজটি ঠিক করে নিলে। একটু হাসতেও চেষ্টা করছে, কিন্তু হাসি পাচ্ছেনা। কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। এবার সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বড়ভাই কি বললে সে বোঝেনি। তাই সে বেরিয়ে এল। বড়ভাই তার মতো চলছে, ছোট ভাই কেন নিজের পথ বেছে নেবেনা! কেউ কাউকে বাধা না দিলেই হোলো।

তেইশ

সাত সূর্য একটা ছোট্ট দোকানে বসে সেখানকার কর্মচারীদের চুল ছাঁটছিল। পথে কাগজের হকারেরা বেচছে খবরের কাগজের অতিরিক্ত সংখ্যা। আজ তিনমাস ধরে এই অতিরিক্ত সংখ্যাগুলি যেন শোকের বিজ্ঞপ্তি হয়েই দেখা দিচ্ছে। যখনি খবরের কাগজের হকাররা চেঁচায়, মনে হয় তাদের স্বরও যেন মিইয়ে গেছে। শত্রুর বিজয় ঘোষণা করতে তাদের ঘৃণাই হয়। একটা হকার তার মাথাটা খোলা দরজা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বললে, ম্যানেজার-মশাই, নেবেন নাকি একখানা?

ক্ষুর চালাতে চালাতে সাতসূর্য জিজ্ঞেস করলে, আজ আবার খবর আছে নাকি?

হকারটি নাক রগড়ে বললে, সাংহাই—

সাংহাইয়ের আবার কি হোল?

ওখান থেকে পিছু হটেছে।

সাতসূর্যের হাত থেকে ক্ষুরখানা খসে পড়ে গেল। কর্মচারীটির কাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে একেবারে মেঝেয় পড়ে গেল।

এই সাতসূর্যি, এটা খেলা নয়! কর্মচারিটি গাল দিয়ে উঠলো।

সাংহাইও গেল! সাতসূর্য আস্তে আস্তে তুলে নিলে ক্ষুরখানা।

কর্মচারিটির রাগ উপে গেছে। সাংহাইয়ের পতনের মানে কি সে জানে।

সাতসূর্য হকারকে একটা পয়সা দিলে। হকারটি একখানা ছোট কাগজ দিয়ে চলে গেল নিঃশব্দে।

সাতসূর্য আর কর্মচারিটি মিলে পড়তে লাগলো।

সাংহাই—রাজকীয় বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয়।

কর্মচারিটি কাগজখানা নিয়ে তালগোল পাকিয়ে মেঝেয় ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে। সাতসূর্য আবার কামাতে শুরু করেছে। তার কম-জোরি চোখের শক্তি যেন আরো কম দেখছে।

খুদে স্থইর তরমুজের মতো মুখখানা যেন আরো ফুলে-ফেঁপে উঠল। চেঙ চ্যাঙ স্থন নাকী স্থরে ভীষণ তর্ক জুড়ে দিয়েছে। চ্যাঙ স্থনের বক্তব্য, সাংহাইতে চীনা বাহিনী হারতে পারে কিন্তু নানকিং ঠিক রক্ষা পাবে।

খুদে স্থই-এরও তাই মত, কামনাও তাই—কিন্তু সাংহাই থেকে পশ্চাৎ-অপসারণের প্রচণ্ড আঘাত তার বুকে বেজেছে। আর অমন আশাবাদ চলে না। ১৯৩৪ সালের কথা তো মনে আছে। ১২ই জানুয়ারীর সেই সন্ধি তো সেবার সাংহাইয়ের পরাজয়ের পরই হয়।

চ্যাঙ স্থন নিচু-ক্লাসের একখানা পাঠ্য বই দেখিয়ে বললে, এই যে নানকিং-এর মানচিত্রখানা দেখনা বাপু! খুদে স্থইর দিকে তাকিয়ে বললে—এই যে ফুলঝরার বাগিচা—এই যে ইয়াংসী! এইখানটা থেকে যদি বাধা দিতে পারি, তাহলে জাপানীদের কাক-পাখীটিও আর পালাতে পারবে না!

তাছাড়া নানকাউ আর নীয়াঙসেকুয়ান-এর দুটি গিরিপথও ওদের পক্ষে দখল করা অসম্ভব।

চ্যাঙ স্থন খুদে স্থইকো কথাটা শেষ করতে দিলেনা। সে বললে, নানকিং নানকিং, নিয়াংসেকুয়ান নিয়াংসেকুয়ান। তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, চোখে জল। আবার দিদিমা শুনবেন সে ভয়ও তার আছে, কিন্তু তবুও গলা তার ধাপে ধাপে চড়ছে।

চ্যাঙ স্থন! দিদিমার স্বর শোনা গেল।

দিদিমা এর পরে কি বলবেন তা তার মুখস্থ। তাঁকে আর কথা বলার স্থযোগ না দিয়ে সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকলো। আর এক সময়ে খুদে স্থই-এর সঙ্গে না হয় তর্ক করা যাবে।

ছ'নম্বরে মেরাপ-বাঁধিয়ে লিউ তো জন তিং-এর সঙ্গে একরকম হাতা-হাতিই বাধিয়ে দিলে। এমনি তারা দেখা হলে একটু মাথা নোয়ায়, কথা খুব কমই বলে। জন তিং-এর গুমোর, সে ইংরেজ রাজবাড়ির মানুষ, যীশুর সে ভক্ত। তাই লিউকে সে গ্রাহ্যই করেনা।

আর লিউ জানে, বেটা ইংরেজ রাজবাড়ির চাকর, আধা ক্রেস্তান—তাই সে হেনস্তাই করে। জন তিং সেদিন সবে ইংরেজ রাজবাড়ি থেকে কিছুটা মাখন সরিয়ে নিয়ে এসেছে। সে কুয়ানদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল। কুয়ানদের বাড়ির সামনে ইশতেহারও সে দেখলো। লিউকে উঠোনে দেখে জন তিং একটু দায়সারাগোছের নমস্কার করলো।

লিউ আজ এই নকল সাহেবের কাছ থেকে খবর জানতে চায়। তাই তার গুমোরটুকু দেখেও দেখলো না। রাজবাড়ির খবর হবে আসল খবর এই তার ধারণা। তাই সে গায়ে পড়ে আলাপ করতে গেল। হেসে বললে, এই ফিরলেন নাকি মশায়? তারপর খবরটা কি?

কিসের খবর?

সাংহাই গো সাংহাই, লিউ পথ আগলে দাঁড়ালো। সাংহাই সম্বন্ধে খবর সত্যই সে জানতে চায়।

ওঃ সাংহাইয়ের খবর? জন একটু হাসলো। সে তো ফতে হয়ে গেছে!

লিউ আবার শুধালে, নানকিং-এর খবর কি?

জন তিং ভ্রূ কুঁচকে বললে, নানকিং-এর খবর? নানকিং নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? সত্য কথা। সে রাজবাড়ির মানুষ। নানকিং-এর সে কি ধার ধারে!

লিউ রাগে জ্বলে উঠে বেফাঁস বলে ফেললে, নানকিং কি আপনার রাজধানী নয়? আপনি কি চীনা নও গো?

জনের মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল। সে বুঝলো, লিউ তাকে কথায় কথায় জানিয়ে দিচ্ছে, সে ইংরেজের তাঁবেদার কুত্তা ছাড়া কিছুই নয়। সে তাতে ভয় পায় না, কিন্তু মেরাপ মিস্ত্রী সে, ওকথা বলে কোন সাহসে? তাই সে খেঁকিয়ে উঠলে, ওঃ আমি চীনা নই, আর তুমি ভারি চীনা! তা বেশতো, একটা জাপানীকে কাটতেও তো দেখলাম না!

লিউয়ের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। জায়গা-মতো ঘা মেরেছে জন তিং। দেশকে ভালবাসে, কিন্তু জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়তে তো সে যায়নি। আর তো উত্তর নেই।

জন তিং তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। সে জানে, তর্কে তারই জিত হয়েছে।

ছোট ওয়েন নিজের ঘরের সিঁড়িতে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখে একটা সিগারেট, ছাই ধানের শীসের মতো বেরিয়ে আছে। স্ত্রীর জন্য একটা নতুন স্বরের কথাই ভাবছেন। জন তিং আর লিউর ঝগড়ার দিকে তিনি কান দেননি। সাংহাইয়ে কে হারলো বা জিতলো সে খবরেরও তেমনি তিনি ধার ধারেন না। নতুন গৎ নিয়েই তাঁর ভাবনা। এই নতুন গৎটা পিপিং-এর থিয়েটারে থিয়েটারে সারা ফেলে দেবে—সূর্যাস্তের মহিমার আরো নামডাক হবে। মুখে তাঁর হাসি ফুটে উঠলো। চীন বা জাপান তাঁর মন থেকে মুছে গেছে। তিনি জানেন, এই পৃথিবী শুনবে আশ্চর্য এক গান, তার সঙ্গে সঙ্গত করবে তাঁর বীণা।

সূর্যাস্তের সর্দি লেগেছে, এখনো তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। জন তিং আর লিউ চলে গেল। ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন ছোট ওয়েন। হঠাৎ তাঁর এল অনুপ্রেরণা। ঘরে গিয়ে বীণা নিয়ে বসলেন।

সূর্যাস্তের শরীর ভাল নয়, তবু তিনি নতুন গৎটা সম্পর্কে উদগ্রীব। বললেন, কি হোল?

আমাকে এখন বাধা দিও না, আস্‌ছে, স্বরটা যেন কাছে আস্‌ছে। এখনো ধরা দেয় নি; দেবে দেবে করছে।

জন তিং মাখন নিয়ে কুয়ানদের অভিনন্দন জানাতে এল।

বড় লঙ্কা একটু ভেবে নিলেন। এখন তিনি একটা দপ্তরের ডিরেক্টর। এখন কি একটা খানসামার সঙ্গে দহরম-মহরম চলে? কিন্তু মাখন দেখে আর লোভ সামলাতে পারলেন না, জন তিঙের হাতখানা অজান্তেই চেপে ধরলেন। ইংরেজ বাড়ির মাখন পেলে তাঁর জ্ঞান থাকে না। বিদেশী ভাষা তিনি জানেন না, বিদেশী রাজনীতিরও ধার ধারেন না; তবু সুবিধা পেলেই বিদেশী মাখনের গুণগান করে বসেন। যেমন তিনি প্রায়ই বলেন, আহা, ছুঁড়িটার মুখখানা যেন একেবারে বিদেশী মাখনের তাল! এমনি তুলনা

দিয়ে একটু গর্বই হয়। মনে মনে হয়তো ভাবেন, বিদেশী মাখনের উপমা দেওয়াও যা আর বিদেশী ভাষা বলাও তাই।

জন তিং ইংরেজ দূতাবাসের খানসামা, আদবকায়দায় সে একেবারে পাকা-পোক্ত। আজ-ও প্রতি কথাটার সঙ্গে সে লেজুড় জুড়ে দিলে—ডিরেক্টর! বড় লঙ্কার তো খুশি আর ধরে না।

প্রভাতপদ্ম দেখলেন, জনকে আগের মতোই খাতির করছেন বড় লঙ্কা। তিনিও তাই তাকে বিদেশী মানী অতিথির অতিরিক্ত সম্মানই দেখালেন। জন তিং যেন জাতিসংঘ থেকে নতুন আমদানী প্রতিনিধি, এমনি ভাব দেখিয়েই প্রভাতপদ্ম জিজ্ঞেস করলেন, সাংহাই সম্পর্কে ইংরেজদের মতামত কি?

চীন জিততে পারবে না, জন সোজা বলে বসলো—যেন সে মহামান্য ইংরেজ লাট। তেমনি নিস্পৃহ, উদ্ধত তার বক্তব্য।

সত্যি আমরা জিততে পারবনা? প্রভাতপদ্মের চোখ খুশিতে বুজে এল।

জন তিং গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লো।

প্রভাতপদ্ম বড় লঙ্কার চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারলেন। যেন তাঁকে বলতে চান, যা করবো, সাহস করেই করে যাবো। জাপানীরা তো শীগ্‌গীরই আর পিপিং ছাড়ছেনা।

পীচ-মঞ্জরী সবই শুনলো। সে আস্তে আস্তে বললে, বদমায়েসের ধাড়ি! আমাকে ও কিনেছে, আর নিজের মেয়েকে ও বিক্রি করতে চাইছে। একি খেলা বাপু!

কাওদী কাঁদলো, আমি ঐ লোকটার কাছে গিয়ে বসব না!

লোকটি বাঁজা পাহাড়। বড় লঙ্কা পেয়েছেন ডিরেক্টারি, বাঁজা পাহাড় এবার কাওদীকে দাবী জানিয়েছে।

কেঁদে কি হবে। কাওদী, আয় একটি মতলব ঠাওরাই!

কাওদী বললে, আমার বাপু কিছুই মাথায় আসছে না। ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম, যদি আমরা সাংহাইয়ের যুদ্ধে জিতি, ঐ বাঁজা পাহাড়টার মতো লোকগুলো তিএয়েনসিনে ছুটে পালাবে। আমি তাই ও নিয়ে মাথা ঘামাইনি। এখন তো সাংহাইও গেল—নানকিংও আর রক্ষা

পাবে না—আর বলতে পারল না কাওদী। পীচ-মঞ্জরী বুঝলো, সে কি বলতে চায়।

কুয়ানদের বাড়িতে পীচ-মঞ্জরীই যা একটু দেশের কথা ভাবে। সে নিজে মাঞ্চুরিয়ার মানুষ, সেখানে সে ফিরে যেতে চায়। সে দেখলে, আর তার দেশে ফিরে যাবার উপায় নেই; নিরাশ হয়েই পড়লো, আপন মনেই হেসে বললে, জাতির এতবড় দুর্ঘটনা, এও যেন তোর জন্যেই তৈরী হয়েছিল খুদে মেয়ে! এখন কাওদীর কথা শুনে, সে বুঝতে পারলে, জাতির সঙ্গে প্রতি মানুষের ব্যক্তিগত ঘটনা আজ জড়িয়ে গেছে। হাঁ, কাওদীর বিয়েও আজ এই জাতীয় দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সে তাড়াতাড়ি বললে, কাওদী, চল্ আমরা পালিয়ে যাই।

পালিয়ে যাব? আগে যখন কাওদী মা বা ছোট বোনের সঙ্গে ঝগড়া করতো, তখন নিজেকে মস্ত সাহসী বলেই মনে হোত, কিন্তু এখন দেখলে সাহস তার এককোঁটাও নেই।

পীচ-মঞ্জুরী বুঝলো, কাওদীর একা পালিয়ে যাবার সাহস নেই। সে তাই হাসলে। চল্, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

তুমি কেন যাবে?

থাকবই বা কেন বলতো? পীচ-মঞ্জরী হাসলো। সে বলতে চায়, মেয়েমানুষটা তোমার মা হোক, আর যাই হোক, ওকে আর আমার সহ্য হয় না! এতদিন তবু সয়েছিলাম, কিন্তু ঐ ডিরেক্টারকে আমার আর সইবে না!

কথা ঠোঁটে এসে গেল, কিন্তু সে থামিয়ে দিলে।

চব্বিশ

খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। ধূসর মেঘে সূর্যের আলো ঢেকে গেছে। বৃষ্টি ঝরছে, মাটিতে পড়তে না পড়তেই তুষার হয়ে যাচ্ছে।

আবার বিরাট ফানুস উঠে এল আকাশে—উদ্ধত তার গতি। নানকিং পতনের উৎসব সে ঘোষণা করলে। পিপিং-এর মানুষ তাদের নিজেদের শহর হারিয়েছে, এবার হারালো তাদের রাজধানী।

রে ফেঙ আর তার মোটাসোটা স্ত্রীটি আবার কুয়ানদের বাড়ি এল। প্রভাতপদ্ম আর বড় লঙ্কা সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করলেন।

বড় লঙ্কা এরই মধ্যে দপ্তরের ভার নিয়েছেন। কাজের ছক করাও হয়ে গেছে!

প্রথমেই গুণ্ডা-বদমায়েসদের সঙ্গে তাঁর ভাব জমাবার ইচ্ছে। বেশ্যা-গুলোর সঙ্গে ওদের যোগসাজস আছে।

দু নম্বর—বাঁজা পাহাড় আর পূবসূর্য দুজনকেই হাতে রাখতে হবে। পূবসূর্য আজকাল সময় পেলেই কুয়ানদের বাড়িতে ছুটে ছুটে আসে। বিয়ের কথা মুখ ফুটে সোজাসুজি বলে না, কিন্তু যখনি আসে, ছুঁড়ি দুটোর জন্যে বাদাম ভাজা বা চিনির রসে জারানো ফল নিয়ে আসে। বড লঙ্কা টের পেয়েছেন, এ হচ্ছে তার পিরীতের খেসারৎ। ওর মতো কঞ্জুসও দু-চার পয়সা খরচ করে ফেলছে। কিন্তু তিনি পূবসূর্য আর বাঁজা পাহাড় দুজনকেই সমঝিয়ে দিয়েছেন, মেদীর দিকে হাত বাড়াতে পার বাপু, কিন্তু তাকে ছোঁয়া চলবে না। মনে মনে তিনি জানেন, আর কিছু না হোক, মেদীকে টোপ করে তিনি নিদেনপক্ষে একজন জাপানী সেনাপতিকে গেঁথে তুলবেনই। কাওদী মেয়েটা তেমন বাধ্য নয়। মার এক ঢিলে দুই পাখী মারার বুদ্ধিটা হয়তো তার মন মতো হবে না। তাই শর্ত-মতো কাওদীকে তিনি বাঁজা পাহাড়ের হাতে দিতেই রাজি, কিন্তু তার আগে বাঁজা পাহাড়কে দিয়ে আরো কাজ করিয়ে নিতে চান। একবার বিয়ে করে ফেলতে পারলে, বুড়ি শাশাড়ীর আর কে তোয়াক্কা রাখবে! বাঁজা পাহাড় একটু সবুর করুক না, কাওদী এর মধ্যে যদি পূবসূর্যের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে, তাহলে

প্রভাতপদ্ম নব জনসংঘের সভ্য হতে পারেন। কিন্তু কাওদী-ছুঁড়িটাকে নিয়ে এক দায়ই হয়েছে। দুজনের উপরই সে সমান চটা। কারো দিকে ফিরেও তাকায় না।

তিন নম্বর তার নিজের কাজ। দুটি পথ তিনি বেছে নিয়েছেন। এক হচ্ছে, ভাল করে বেশ্যাদের পরীক্ষা করা, আর এক হচ্ছে তারই সুযোগে কিছু আয় করা। বেশ্যাদের পরীক্ষা করাতে হবে, নাজেহাল করে ছাড়তে হবে নানা উপায়ে, যারা তা হতে চায় না, তারা নিশ্চয়ই ঘুস দেবে। তিনি হবেন তাদের ধর্ম-মা। মা-মেয়ের সম্পর্ক হলে তখন অন্তরঙ্গতাও বাড়বে। আর সম্পর্ক রাখবার জন্যে তারা দক্ষিণাও দেবে মোটা হাতে। তাছাড়া বছরের চারটে পাল-পার্বণে কিছু ভেটও পাওয়া যাবে।

চার নম্বর ছক হোল গোপন সড়কের ব্যবস্থা। বড় লঙ্কা জানেন, লড়াই আর আকাল মিলে অনেক গোপন-বেশ্যার সৃষ্টি করেছে। উপরে উপরে এই জাতের বেশ্যারা যাতে সমূলে ধ্বংস হয়, তাঁকে তারই কড়া ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কাজে হবে অন্যরকম। তিনি এদের গোপনে উস্কানি দেবেন, ভেট পাঠাতে বলবেন। ঘুসকিরা নিজেদের রুজি-রোজগারের তাগিদেই দপ্তরের উপরওয়ালীকে ঘাঁটাতে যাবে না। তারা তাঁকে টাকা দিতে বাধ্য হবে।

এই ছকগুলি কাটতে কাটতে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। খালি নিজের বুক চাপড়াচ্ছেন। তিন-পাইট বিদেশী থার্মস বোতলে মুরগীর সুরুয়া ভর্তিই আছে। বেশি খাটা-খাটনীতে শরীর না ভেঙ্গে যায় তাই এই ব্যবস্থা। কাজও জোর চালিয়েছেন। তাঁর ভয়, হয়তো লড়াইটা হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে। তাই এখন যা পাওয়া যায়, হাতিয়ে নেওয়া ভাল। যদি বেশ কিছু টাকা বেঁধে ফেলতে পারেন, তাহলে লড়াই শেষ হয়ে গেলেও কিছু আসে যাবে না।

নানকিং-এর পতনের পর বড় লঙ্কা কাজে একটু ঢিলে দিলেন। আর সে হন্তদন্ত ভাব নেই। শান্তভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন। একটু বা আয়েস লেগেছে। এখন তো ভয় নেই। এই ডিরেক্টারির মই বেয়ে তিনি ধাপে ধাপে একেবারে উঁচুতে উঠে আসবেন। পিপিং-এর সেরা মহিলা হওয়া তাঁর চাই। নিজের গাড়ী থাকবে, বিদেশী দূতাবাস আর পিপিং গ্রাণ্ড

হোটেল করে বেড়াবেন। হাতে পরবেন বড় বড় হীরে-বসানো আঙটি, আর এমন পোষাক-আষাক করবেন যাতে গোটা এশিয়ার ফ্যাসানই বদলে যায়।

রে ফেঙ আর তার বৌকে আদর করে বসিয়ে বললেন, আমরা হচ্ছি পাথর, সেই পাথর এতদিনে মাটিতে এসে পৌছলো। এখন আরামেই কাজ করা যাবে। ছ'মাসে কি এক বছরে আর নানকিং কেড়ে নেওয়া যাবে না। তাই পিপিং-এ আমরা আরামেই থাকতে পারি। আপনারা ছেলেমানুষ, আপনাদের বলি—পৃথিবীটা শুধু আমোদ-প্রমোদের জায়গা নয়। কোনো কিছুর জন্যে হাত-পা ছেড়ে বসে থাকবেন না। তাহলে দেখবেন, খাবার আগেই দাঁত পড়ে যাবে, ভাল সাজ-পোষাক করবার আগেই কুঁজিয়ে যাবেন। এবার রে ফেঙের বৌকে বললেন, চি-গিন্নী, আসুন আপনি আর আমি এক সঙ্গে কাজ করি। আমি যদি সেরা মহিলা হই, আপনি হবেন দু'নম্বর মহিলা। ধরুন, আমি যদি আজ পেঁচার মতো চুল কোঁকড়াই, আপনিও তখুনি তা করবেন। তারপর দুজনে বেড়াতে যাব উত্তর সাগর বা মধ্য পার্কে। পরদিনই সারা পিপিং-এর মেয়েরা অমনি করে চুল কোঁকড়াবে। সবাই ফ্যাসানটা নিয়ে নিলেই আমরা আবাব সেটা পাল্‌টে দেব। আমরা ওদের পেছু পেছু ছোটাব, কিন্তু কখনো নাগাল পেতে দেব না। এমনি করেই ওদের আমরা পায়ের তলায় রাখবো।

এইবার রে ফেঙ বাধা দিলেন, ডিরেক্টর কুয়ান, বাধা দিচ্ছি বলে মাপ করবেন। আজ দু'দিন হোল আমার স্ত্রীর একটা যুতসই নাম খুঁজছি, যাতে কার্ডের উপর ওর নামটা ছাপানো যায়। আমি এখন একটা বিভাগের বড় কর্তা, আমার স্ত্রীকে সামাজিক মেলামেশা করতেই হবে, তাই কার্ডের তো খুবই দরকার। একটা বাত্‌লে দিন না। সুন্দরী চি, না চন্দ্রমল্লী চি—কোনটা রাখি?

বড় লঙ্কা না ভেবেই বললেন, চন্দ্রমল্লীই রাখুন। জাপানীরা ঐ ফুলটা পছন্দ করে। যাতেই জাপানী খোসবাই ছাড়বে, তাই-ই হবে হালফ্যাসান।

নানকিং পতনের খবর যেদিন এল, সেদিন চিয়েন বিছানা ছেড়ে উঠবেন ঠিক করলেন। দু-এক পা হাঁটতে চেষ্টা করলেন। শরীরের ঘা গুলি শুকিয়ে

এসেছে, মুখখানায় একটু মাংস লেগেছে। কিছুদিন ধরে দাড়ি কামানো হয় নি, তাই কালো নরম দাড়িও গজিয়েছে, এতে আরো কবি-কবি দেখাচ্ছে পা নিয়েই তাঁর ভাবনা। গাঁটে গাঁটে এখনো ফোলা, ব্যথাও আছে। কিন্তু আজ মনটা ভালো, গাঁটের ফুলো কমেছে। তাই তিনি উঠে পড়ে একটু চলাফেরা করবেন ঠিক করলেন। এতদিন তো ভয় ছিল, তিনি পঙ্গু হয়ে গেছেন, আর চলা-ফেরা করতেই পারবেন না। ছেলের বৌকে তিনি কিছু জানালেন না, সে হয়তো বাগড়াই দেবে। তিনি উঠে বসে খাট থেকে পা দুখানা ঝুলিয়ে দিলেন।

ন'গিন্নির জুতোর চপ্ চপ্ শব্দ বেজে উঠলো, তিনি ডাকলেন, ন'গিন্নি এসেছেন নাকি!

উঠোন থেকেই জবাব দিলেন ন'গিন্নি, হ্যাঁ, এলু, আপনাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না, বুড়ো মিন্সেটার সঙ্গে আবার কোঁদল করে এসেছি।

আরে দুজনেই তো সত্তর পেরিয়ে গেছেন—কি নিয়ে এত কোঁদল করেন? চিয়েনের মনটা ভাল, তাই বেশ সহজভাবেই বললেন।

উঠোন থেকেই ন'গিন্নি বলে গেলেন, দেখুন তো বুড়ো সবে বাইরে থেকে এল, কেমন যেন মুখখানা—এসেই কি বললে। দাঁড়ান গো কথাটা ভাবি! হ্যাঁ, কি বললে জানেন, নানকিং শত্তুররা দখল করে নিয়েছে! এমনই মিন্সের রাগ, খেল না—মুখ বুজে পড়ে রইল। তা নানকিং দখল হয়েছে তার আমি কি জানি বাপু? আমি কি তাকে বাঁচাব নাকি? আমার উপরেই যত তম্বি!

চিয়েন শুনলেন খবরটা। তাঁর পা দুখানা মেঝেয় বাড়িয়ে দিলেন। নানকিং-এর পতন হয়েছে, এবার দাঁড়াতে তো হবেই। কিন্তু পা দুখানা মেঝেয় পড়তে না পড়তে কাওলিয়াঙের চারার মতো বেঁকে গেল, তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। ঠাণ্ডা মেঝেয় বহুক্ষণ পড়ে রইলেন, তাঁর পায়ে আর জোর নেই, অবসন্ন পা। অনুভূতিও নেই। আস্তে আস্তে ব্যথা চাগিয়ে উঠলো, এবার প্রচণ্ড ব্যথা। শরীর যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে। তিনি মুখ বুজে রইলেন, গোঙাবেন না এই তাঁর সংকল্প। কিন্তু ব্যথা তো প্রচণ্ড, সয়াবীনের মতো বড় বড় ফোঁটায় কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। কাউকে

ডাকতেও চান না। কষ্ট করে উঠে বসলেন। পায়ে হাত বুলোচ্ছেন। পা কি এতদিন বিছানায় পড়ে থেকে অবসন্ন হয়ে গেছে, না, জাপানীরা এমন করে ভেঙে দিয়েছে যে, আর তিনি হাঁটতে পারবেন না? তিনি জানতে চান একি হোল? তাঁর পা তো চাই, ঐ পায়ে ভর দিয়ে তিনি ছুটে যাবেন, আমরণ লড়াই করবেন জাপানীদের বিরুদ্ধে। খাটের কোণ চেপে ধরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাঁটুতে যেন শয়ে শয়ে সূক্ষ্ম ছুঁচ বিঁধছে। ঘাম ঝরছে গা দিয়ে। কিন্তু তবু তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে এল, তিনি আবার বিছানার উপর পড়ে গেলেন। বহুক্ষণ এইভাবে পড়ে রইলেন, তারপর বিছানায় ভাল করে গা এলিয়ে দিলেন।

এখনো পায়ে ব্যথা আছে, তবু ভাবছেন, এমনি করে চেষ্টা করে-করে তিনি শেষে হাঁটতে পারবেন। চোখ বুজে পড়ে রইলেন। দুটো জিনিস মনে আসছে, যাচ্ছে—নানকিং-এর পতন হয়েছে, আর তাঁর পায়ে অসহ্য ব্যথা।

পায়ের ব্যথা আস্তে আস্তে কমে গেল। যদি হাঁটতে পারতেন, অনেক কিছুই করা যেত; নানকিং-এর পতন, তাঁর ছেলেদের আর স্ত্রীর মৃত্যু সব একাকার হয়ে গেছে। এইসব মিলিয়েই একটা কিছু করা যেত।

গোড়া থেকেই ভাবতে শুরু করলেন। এখন কি করবেন, তাইতো ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু ভিড় করে এল অতীতের মিছিল।

গ্রেফ্তারের দিনের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। চোখ বুজেও সার্জেণ্ট পাইকে দেখা যাচ্ছে। আর, প্রভাতপদ্ম, জাপানী পুলিশ, তাঁর স্ত্রী, বড় ছেলে সবাই আছে। ঠিক তেমনি আছে। যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই আছে। দাক্ষিণের দেয়ালের কাছে দুটো ফুলন্ত গাছের কথাও মনে পড়লো। তারপর পুলিশের সঙ্গে তিনি গেলেন পশ্চিমের তোরণের কাছে এক ছোট্ট গলিতে। গলিটার নাম তাঁর জানা উচিত ছিল, কিন্তু মনে করতে পারছেন না। গলির ভিতরে গিয়ে আর একটা কানাগলি—সেখানে এক বাড়ির ফটক। সেই ফটক খুলে ওরা ওঁকে ভিতরে নিয়ে গেল। উঠোনটা খুব ছোট নয়, আর আর বাড়িখানাও ব্যারাক বলেই মনে হয়। দক্ষিণের ঘরগুলো ছিল আস্তাবল এখন বসবাসের কামরা হয়েছে। উঠোন কুচ-কাওয়াজের জমির মতো মসৃন।

উঠোনে ঢুকতেই ঐ আস্তাবল ঘরগুলি থেকে চীৎকার শুনতে পেলেন। ঘামে শরীর জবজবে হয়ে ছিল, কিন্তু চীৎকার শুনে আবার শিউরিয়ে উঠলেন, একটু বা থেমেও পড়লেন। কসাইখানায় যখন গরু আর ভেড়ার পালকে ঢোকায়, তখন বুঝি তারা এমনি থমকে দাঁড়ায়, বিপদের গন্ধ পায়। পুলিশগুলো তাঁকে ঠেলে দিলে। তিনি আবার মাথা তুলে চলতে লাগলেন, মৃত্যুর চেয়ে বেশি তো কিছু হবে না। মনে মনে আওড়ালেন, মরার বাড়া তো কিছু নেই!

পুবের ঘরে তাঁকে নিয়ে গেল ওরা। একটা জাপানী সিপাই শরীর-তল্লাসি করলে। পরনে তাঁর শুধু কোট আর ট্রাউজার, আর একপাটি জুতো পায়ে। আর তো কিছু নেই। তল্লাসির পরে তাঁকে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একজন জাপানী বসে আছে, সে চীনা ভাষায় তাঁর নাম-ধাম পদবী, বয়সে, পেশা সব জিজ্ঞেস করলে। সব একখানা কার্ডে লেখা। যখন তিনি জবাব দিলেন, তাঁর কোন পেশা নেই, জাপানীটা পেন্সিল কামড়াতে কামড়াতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। রোগা লোকটা, মুখখানা ফ্যাকাসে। চিয়েন ভাবলেন, এমন রোগা লোক নিষ্ঠুর হতে পারে না; তাই তিনি নির্ভয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। লোকটি পেন্সিলটা মুখ থেকে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোমার বিরুদ্ধে কি নালিস? সাফ জবাব চাই?

চিয়েন নিজের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানেন না, তাই মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। মিতা যেন মিতার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন। হঠাৎ রোগা লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁর গালে এক চড় কসিয়ে দিলে। চিয়েনের একটা দাঁত খসে পড়লো। রোগা লোকটার মুখখানা যেন বরফের মতো। সে বার বার বলছে, তোমার বিরুদ্ধে কি নালিস বল!

চিয়েনের ব্যথা রাগে উবে গেল। তিনি শান্ত স্বরেই বললেন, জানি না।

আবার চড় পড়লো। তিনি জোর গলায় বলতে চাইলেন, লোকটার চড় মারবার অধিকার আছে কি না, কিন্তু তখনি মনে পড়লো, ও জাপানী। জাপানীদের যদি ন্যায়ের প্রতি সম্মান থাকতো, তারা চীনে হানা দিত না। পোষাকে রক্তের দাগ দেখে তিনি চোখ বুজে আপন মনে বললেন,

মার, মার! আমার মুখ তোমরা থেঁতলে দিতে পার, কিন্তু মন তো পারবে না!

আবার জাপানীটা জিজ্ঞেস করছে, তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হাত তৈরি হয়ে আছে, যদি 'না' জবাব পায়, যদি শুধু ঘাড় নাড়ে বন্দী, তাহলে সে আরো জোরে হানবে আঘাত।

চিয়েন বুঝতে পারলেন তার মতলব, তিনি পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। মুখ বুজেই সইবেন, খুলবেন না মুখ।

মারের জন্য তিনি তৈরি। ছেলেবেলা থেকেই জানেন, মারটা যুক্তি-হীনতা ছাড়া কিছুই নয়।

স্বপ্নেও ভাবেননি যে, তাঁর উপর সরকারি নির্যাতন চলবে। এখন তো তাই হোল। ব্যথায় শরীর ভরে গেছে, কিন্তু ব্যথা নিয়ে এসেছে গর্ব—এক মহিমা। মহিমার জন্ম বুঝি বেদনায়।

আবার আঘাত। চিয়েন নীরব, শুধু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আস্তে আস্তে ঘাড়ের জোর কমে এল, কমে এল পায়ের জোর। তিনি একটু নড়ছেন। আঘাতে একবার ডানে আর একবার বাঁয়ে হেলে পড়ছেন। এ যেন ছেলেদের খেলনা। এ খেলনা পড়ে যায় না, শুধু এদিক-ওদিকে একটু হেলে পড়ে মাত্র। জাপানীটা হো হো করে হাসছে। মানুষকে আঘাত করা শুধু ওর কর্তব্য নয়, ওর ধর্ম আর শিক্ষার অভিব্যক্তি।

চিয়েনের মনে পড়লো, তাঁকে এবার তোলা হোল ট্রাকে। মুখ ফুলে গেছে, চোখ চাইতে পারছেন না। ট্রাক ছুটে চলেছে দেহটা নড়ছে। এ যেন ট্রাক নয়, ঝড়ে-পড়া জাহাজ। ঠাণ্ডা হাওয়ায় জেগে উঠলেন। চোখ চেয়ে দেখলেন আলোগুলি পিছনে ছুটে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে। আবার চোখ বুজলেন। ট্রাক থামলো। কোথায় এসেছেন জানেন না, জানার ইচ্ছেও নেই। শুধু মনে পড়ছে, অনেকতলা এক বাড়ি। কোনো কলেজই হবে। তিনি আস্তে আস্তে চলেছেন, পায়ে তাঁর বেড়ি। শত্রুরা কেন ভয় পায় যে, তিনি ছুটে পালাবেন? তিনি তো বোঝেন না এর মর্ম। আরো কি তারা নির্যাতন করতে চায়? হ্যাঁ হ্যাঁ শত্রুই! শত্রুর যদি মানবতাবোধ থাকতো, তাহলে কি তারা লড়াই করতো? আস্তে হাঁটছেন বলে ওরা তাঁকে আবার

মারলো। তিনি বিভ্রান্ত। পায়ের ঐ বেড়ির ব্যথা, না, পিঠে মারের ব্যথা বেশি? একটা অন্ধকার ঘরে ওরা তাঁকে ফেলে দিলে। একটা লোকের উপর হুমড়ি খেয়েই পড়লেন। লোকটা তাঁকে গাল দিলে। চিয়েন চুপ করে রইলেন। একপাশে গড়িয়ে পড়লো তাঁর দেহ। ঠাণ্ডা মেঝে, খড়ের গাদাও বিছানো নেই। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন কিছুই হোল না। শুধু দুজন লোক বাড়লো ঘরে। ঘরে কারা আছে দেখার তাঁর ইচ্ছে নেই। মুখ তাঁর ফুলে উঠেছে; দাঁত মাজতে পান নি। মুখ ধোয়া হয় নি। সমস্ত শরীরটাও ব্যথা করচে। ব্যথা আর অশুচিতা মিশে গেছে। তখন দশটা হবে, কাঠের বাক্সে করে কে একজন ভাত আর জল দিয়ে গেল! জল খেলেন, ভাত ছুঁলেনও না। চোখ বুজে, পা ছড়িয়ে শুয়ে রইলেন দেয়ালের দিকে মুখ করে। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন।

তিন দিনের দিনটাও এমনি করে কেটে গেল। তিনি চটে গেলেন। বুঝতে পারলেন, যে মানুষ দেশ হারিয়েছে, সে তার ইচ্ছা-মৃত্যুর অধিকারও হারিয়েছে। চোখ খুলে এবার চারিদিকে তাকালেন। ঘরটা ছোট, আসবাব পত্র নেই। একটা দেয়ালে একটা ছোট্ট জানালা। লোহার গারদ-ঘর। ঘরের মাঝ-খানে একজন প্রৌঢ় শুয়ে আছে। হয়তো ওরই উপর তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। লোকটির মুখখানায় রক্ত শুকিয়ে আছে। সে কুঁকরে শুয়ে আছে, চোখ তার বোজা। চিয়েনের উল্টো দিকে বসে আছে এক জোড়া তরুণ তরুণী। ঘেঁসাঘেঁসি করেই তারা বসে আছে। ছেলেটি তেমন সুশ্রী নয়, কিন্তু মেয়েটি ভারি সুন্দরী। ছেলেটি ছাদের দিকে তাকিয়েই আছে, নড়ছে-চড়ছে না। মেয়েটি তার হাত ধরে বসে আছে। তার চোখ দুটিও ভারি সুন্দর, কিন্তু সে আয়ত চোখ ভয়ার্ত। ওদের দিকে তাকিয়ে চিয়েনের মরার ইচ্ছে চলে গেল। তিনি দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি করেছ?

ছেলেটি চমকে উঠে ছাদ থেকে চোখ নামালে, মেয়েটি ভয়ার্ত চোখ মেলে চারিদিকে তাকালে।

আমরা?—ছেলেটি মেয়েটির হাত চাপড়ে দিচ্ছে। মেয়েটি ছেলেটির আরো কাছে ঘেঁসে বসেছে।

যে লোকটি শুয়ে ছিল বললে, তুমিও তো শাস্তির অপেক্ষায় বসে আছ। কথা কোয়ো না! সে নড়ে উঠলো, হাতের কথা ভুলে গিছলো। এবার হাতে চোট লাগতেই উঃ উঃ করে উঠলো। সে বললে, ওরা আমাকে তিন ঘণ্টা কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রেখেছিল। আমার কব্জি ভেঙে গেছে! উঁ-হুঁ-হুঁ!

মেয়েটি ছেলেটির কোলে মুখ ঢাকলো। ছেলেটি ঠোঁট চেপে রইলো।

বাইরে ভারি জুতোর শব্দ উঠছে। প্রৌঢ়ের চোখে পুঞ্জীভূত ঘৃণা। সে চেঁচিয়ে উঠলো, চিয়েন তার মুখ চেপে ধরলেন। মুখ নড়ছে, চিয়েনের হাতের উপর পড়ছে উষ্ণ নিশ্বাস। সে হাত সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, হ্যাঁ, আমি চেঁচাব। ওদের ডাকবো!

চিয়েন শক্ত করে মুখ চেপে ধরলেন। ঘর নিঝুম। এখনো জুতোর শব্দ উঠছে বাইরে।

আস্তে আস্তে তিনি শুধালেন, প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? প্রৌঢ় জানে না, কি সে অভিযোগ। শুধু সে নাকি একজন ফেরারী আসামীর মতো দেখতে। জাপানীরা তাকে পায়নি, তাই ওকে ধরে এনেছে। তিন ঘণ্টা কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রেখেছিল, কব্জি দিয়েছে ভেঙে।

ছেলে আর মেয়েটিও জানে না কি তাদের দোষ। ট্রামে যাচ্ছিল, জাপানীরা সেখান থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। ওরা সহপাঠী, প্রেমিক-প্রেমিকাও। ওদের এখনো জেরা করা হয়নি, তাই মনে ভারি ভয়। ওরা জানে, জেরা মানেই নির্যাতন।

সন্ধ্যের দিকে এল এক জাপানী সিপাই। সে ঘরে ঢুকেই টর্চ ফেললে, মেয়েটিকে টেনে-হিঁচড়ে তুললে। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলো। ছেলেটি উঠে এক ঘুসিতে জাপানী সিপাইটাকে পেড়ে ফেললে। সিপাইটা উঠে পড়ে আবার মেয়েটিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চললো। সে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। এবার এসে জুটলো আর একটা সিপাই। ওরা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল।

ছেলেটি পিছনে ছুটেছিল। তার মুখের উপর দরজা গেল বন্ধ হয়ে।

দূরে বহুদূরে মেয়েটি চেঁচাচ্ছে। তার চীৎকার তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো কামড়খানাকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে দিচ্ছে। ঐ শব্দ থেকে যেন কিসের এক আলো ঠিকরে পড়ছে।

মেয়েটির চিৎকার থেমে গেছে। ছেলেটি নিঃশব্দে কাঁদছে।

চিয়েন উঠে ছেলেটির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চান, তার হাত ধরবেন সান্ত্বনা দেবেন, কিন্তু পা যে অবসন্ন। দাঁড়াতেই পারছেন না। ছেলেটিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কি বললেন, কিন্তু জিভেও যেন অবসাদ জমে উঠেছে। অন্ধকারের দিকে চেয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হোল, না, না, মরবো না, মরবো না! বেঁচে থাকব, এখান থেকে পালিয়ে যাব! আমাদের ওরা যেমন করে হত্যা করছে, অমনি করে ওদেরও হত্যা করবো! প্রতিশোধ নেবার জন্যেই বেঁচে থাকতে হবে!

রাত ফরসা হয়ে এল, জানালা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। চিয়েন সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন। শীত করছে। এবার দরজা খুলে গেল। মেয়েটিকে ওরা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল।

জানালার আলো এখন গোলাপী; আলো যেন চোরের মতো এল ধীর পায়ে—আলো কাঁপছে।

কোমর-অবধি মেয়েটির কাপড় নেই। একটা ছোট্ট কাঁচুলি শুধু বুকের আধখানা ঢেকে আছে। নড়ছে-চড়ছে না। উরুর ওপরে থানা থানা রক্ত জমে আছে।

ছেলেটি নিজের কোট নিয়ে ওর উপরে চাপা দিয়ে কেঁদে উঠলো, আমার নীলকান্তমণি, ও আমার নীলকান্তমণি! সে কথা বলছে না। ছেলেটি ওর হাতখানা তুলে নিলে। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত। কানেব কাছে মুখ নিয়ে বললে, মণি, মণি! তবুও নীরব নিষ্কম্প সে।

ছেলেটি আর ডাকলে না। কোমরবন্ধে হাত রেখে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য উঠেছে। লোহার গরাদে পড়েছে আলো, ঝকঝক করছে। গরাদের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে লাফিয়ে জানালার কাঠটা ধরে ফেললো। ঐ গরাদে মাথা ঠুকে সে মরবে। কিন্তু মাথা যে ওখানে পৌছোয় না। আস্তে আস্তে সে মেঝেয় বসে পড়লো নিরাশ হয়ে। আবার তাকালো মেয়েটির দিকে। চোখ দিয়ে অঝোরে ঝরছে জল।

লাফিয়ে উঠে আবার দেয়ালের দিকে ছুটলো। মরবে, দেয়ালে সে মাথা খুঁড়ে মরবে!

চিয়েন চেঁচিয়ে উঠলেন, কি করছ?

থমকে দাঁড়াল ছেলেটি।

ও মরেছে বলে কি তোমাকেও মরতে হবে? কে প্রতিশোধ নেবে ওর এই-মৃত্যুর? মেরুদণ্ড সিধে করে দাঁড়াও, ভাব প্রতিশোধের কথা।

কোমরবন্ধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটি। মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে। এবার কাছে গিয়ে মেয়েটির দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে কতো কথা কইলো। তারপর তাকে এক কোণে সরিয়ে রেখে চিয়েনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। চিয়েনের প্রস্তাব সে শিরোধার্য্য করে নিয়েছে।

আবার দরজা খুলে গেল। একজন সিপাই আর ডাক্তার এল। মৃত-দেহের দিকে তাকালো ডাক্তার, তারপর একখানা ফর্ম বার করে ছেলেটিকে সই করতে বললে। চীনা ভাষায় বললে, সংক্রামক রোগে মারা গেছে ছুঁড়িটা। নাও, সই করে দাও! ছেলেটিকে একটা পার্কার কলম এগিয়ে দিলে। ছেলেটি ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল, ও কলম সে হাতে ছোঁবে না। চিয়েন একটু কাসলেন। ছেলেটি এবার সই করে দিলে।

ডাক্তার ফর্মখানা সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে এবার প্রৌঢ়টির দিকে এগিয়ে গেল। তার গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে, কিন্তু এখনো চোখ খোলেনি। শান্তশিষ্ট মানুষটি, শেষ নিঃশ্বাস যখন পড়বে তখনও সে গোঙাবে না। সে মৃতপ্রায়। কিন্তু তবু অবিচার আর অপমান সয়ে যাচ্ছে, কিছু সে মুখ ফুটে বলতে চায় না। চীনের এইতো খাঁটি মানুষ। ডাক্তার চোখ পিট্ পিট্ করে সিপাইকে বললে, এরও রোগ খারাপ, একে ঘর থেকে তফাৎ রাখো। সিপাইটা প্রৌঢ়কে ঘর থেকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার এবার দু'হাত রগড়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর নুয়ে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে তালা বন্ধ হয়ে গেল।

ছেলেটি থর্থর্ করে কাঁপছে, আর বুঝি দাঁড়াতে পারবে না। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

হাঁ, হাঁ, এসব সংক্রামক রোগ বইকি, চিয়েন আস্তে আস্তে বললেন। জাপানীরা তো ব্যাধির বীজাণু। যদি সংক্রামিত না হয়ে থাক, তার থেকে মুক্ত হবার পথ খোঁজ। যারা অপদার্থ, তারাই তো আত্মহত্যা করতে চায়।

আবার দরজা খুলে গেছে, আর একটা জাপান। সিপাই মেয়েটির কাপড়-চোপড়ের বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে দিয়ে ভাঙা ভাঙা চীনা ভাষায় বললে, যাও। ও-ও সাথে যাবে!

ছেলেটি বাণ্ডিলটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নেকড়ে যেন রক্তের ঘ্রাণে চঞ্চল। চিয়েন আবার খুক্ করে কাসলেন, অস্ফুটস্বরে বললেন, চলে যাও!

ছেলেটি মেয়েটির মৃতদেহ পোষাক পরিয়ে দিয়ে কোলে তুলে নিলে।

জাপানী সিপাইটা আবার বললে, মৎ বোলো! শির লেব, লেব!

ছেলেটি মৃতদেহ কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ালো চিয়েনের পাশে। কি যেন সে বলতে চায়। তারপর কিছু না বলেই সে ধীরে ধীরে চলে গেল।

পঁচিশ

শুধু রইলেন চিয়েন। হঠাৎ তাঁর মনে হোল, ঘরখানা যেন অনেক বড়। প্রথমে আসবাবহীন মনে হয়েছিল, এখন ফাঁকা ঠেকছে। ভয়ানক ফাঁকা। চোখ বুজলেন চিয়েন। এখনো তাঁর মনে হচ্ছে, প্রৌঢ়টি মেঝেয় শুয়ে আছে। কোণে বসে আছে ছেলেমেয়ে দুটি। ওরা যখন ছিল, তখন এত নিঃসঙ্গ মনে হয়নি। ওদের কথাই ভাবলেন। কিরকম ওদের চেহারা, কি ওদের নিয়তি! আর ছেলেটির ভবিষ্যৎই বা কি? ও কি করবে?

ছেলেটি কি করবে তিনি জানেন না, কিন্তু তিনি তাকে সেরা পরামর্শই দিয়েছেন। ছেলেটি যদি তা নেয়, তাহলে তাঁর মেজ ছেলের মতোই সে

শত্রু ধ্বংস করবে। আবার চোখ খুললেন। এ তো জেলখানার অন্ধ কুঠরীই নয়, এ যে প্রতিরোধ-সংগ্রামের জন্মভূমি।

মনে শান্তি পেলেন। কবিতা ভুলে গেছেন, ছবি আঁকা ভুলে গেছেন, সুরা আর ফুল, নিজের দেহসৌষ্ঠব—সব ভুলে গেছেন। এখন তো এই অন্ধ কুঠরীকে সুন্দর বলেই মনে হচ্ছে। এ তাঁর নিজের জেলখানা, আবার বহু মানুষেরও। জাতি আর ব্যক্তির ভাগ্যের এক যোগসূত্র। পায়ের বেড়ির দিকে তাকালেন, মুখের ক্ষততে হাত বুলিয়ে দিলেন। হাসছেন। ওরা যে খাবার এনে দেবে, তাই-ই খাবেন। ওতে যতখানি শক্তি বজায় থাকে, তাই-ই জমিয়ে রাখবেন প্রতিরোধ-সংগ্রামের জন্য।

পাঁচ-ছদিন এমনি করে কেটে গেল, ডাক এখনো পড়েনি। প্রথমে অসহিষ্ণুই হয়ে উঠেছিলেন, এবার বুঝলেন বিচার হোক আর না হোক, তিনি এখন শত্রুর হাতে। দরজার ফাঁক দিয়ে কে যেন এক আঁটি খড় গলিয়ে দিয়ে গেল। তিনি খড় বিছিয়ে নিলেন। হাতে কাজ নেই, তাই দু-একগাছা খড় তুলে আঙুলে জড়াতে লাগলেন। খড়ের মধ্যে একটা ছোট পোকা। সযত্নে তিনি পোকাটাকে মেঝেয় ছেড়ে দিলেন। নতুন মিতা পেয়েছেন। পোকাটা পড়ে আছে কুঁকরে। চিয়েন দেখছেন। এবার বলে উঠলেন, দেখ্‌তো, তুই ভেবেছিলি, খড়ের আশ্রয় বুঝি নিরাপদ, কিন্তু আমার হাতে তো পড়লি! আমিও তো এক সময়ে তোর মতো নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে গিছলাম, কিন্তু আজ তো আমার সম্বলমাত্র একগাছা খড়। না, না, চটিস না, আমার জীবনের মতো তোর জীবনও দামী। যদি আমরা বাঁচি, আমাদের জীবনের আরো দাম বাড়বে। তোকে বিরক্ত করে দুঃখই পাচ্ছি। কিন্তু খড়ের গাদা যে নিরাপদ একথা তোকে কে বলেছিল বল্‌তো?

যেদিন পোকাটাকে পেলেন সেদিন রাতেই তাঁর ডাক পড়ল। দোতলার উপরে একটা মস্ত ঘরে বিচারালয়। দেখে ইস্কুলের ক্লাসঘর বলেই মনে হয়। ঘরে ম্লান আলো। কিন্তু তিনি ঢুকতেই উল্‌টো দিক থেকে চোখ-ধাঁধানো আলো এসে পড়লো, তিনি চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। এবার টেবিলের সামনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোল। তিনি আবার চোখ চেয়ে দেখলেন। তিনখানা সবজে মুখ সুমুখে। ছ'টা চোখ তাকিয়ে আছে—যেন

তিনটি বেড়াল জ্বল্‌জ্বল্‌ চোখে তাকাচ্ছে একটা ইঁদুরের দিকে। হঠাৎ তিনখানা মুখ থেকে বেরিয়ে এল সাদা দাঁত। রঙচঙ মাখা মুখ।

চিয়েন দেখলেন, কিন্তু নড়লেন না। এই ছেলেমানষি তিনি পছন্দ করেন না। জাপানীরা এমনি অভিনয় করতে ভালবাসে। কিন্তু তবু হাসি পেল না। সয়তানের মতোই ওরা এমনি করে আমোদ পায়।

অভিনয় শেষ হলো, মাঝখানের সবজেমুখো শয়তানটা পাশের দুটোকে মাথা নেড়ে কি ইসারা করলে। হয়তো বলছে, লোকটার কড়া জান। এবার ভাঙা ভাঙা চীন ভাষায় জেরা শুরু হোল, তুমি কে?

চিয়েন না ভেবেই উত্তর দিতে গেলেন, আমি একজন চীনা, কি ভেবে আবার চুপ করে গেলেন। শরীরটাকে বাঁচাতে হবে। মুহূর্তের আমোদের জন্য শরীরের ক্ষতি করলে চলবে না। জুতসই জবাবও খুঁজে পাচ্ছেন না।

শয়তানটা অবার জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে? নিজেই কথাটার ব্যাখ্যা করলে, তুমি কি কমিউনিস্ট?

চিয়েন মাথা নাড়লেন। তিনি বলতে চান, যারা জাপানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় সবাই তারা কমিউনিস্ট নয়। কিন্তু আবার সংযত করে রাখলেন নিজেকে।

বাঁ দিকের সবজে মুখখানা এবার কথা বললে, অষ্টম মাসের পয়লা তারিখে কোথায় ছিলে?

বাড়িতে।

বাড়িতে কি করছিলে?

চিয়েন একটু ভেবে বললেন, মনে নেই।

বাঁ দিকের সবজে রঙ মাখানো মুখখানা সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলে। সে যেন বলতে চায়, লোকটার জান কি কড়া!

ডান দিকের মুখখানা এবার সাপের মতো গলা বাড়িয়ে ফোঁস করে উঠলো, আচ্ছা, আচ্ছা পিটি দেব! সমঝা? মাথা সরিয়ে নিয়ে হাত তুলছে।

চিয়েনের পেছনে যেন হাওয়ার গোঙানি। চামড়ার চাবুক গনগনে লাল লোহার মতো পিঠে পড়ছে। তিনি টলতে টলতে টেবিলের সামনে

চলে এলেন, মাথাটা ঠুকে গেল। আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, মার, মার—আমার তো কিছু বলবার নেই!

দাঁতে দাঁতে চেপে হাসছে সবজে রংমাখা তিনখানা মুখ। চাবুকের শব্দ আর বুড়োর গর্জনে ওদের আমোদ লাগছে।

চাবুকও যেন যন্ত্রের মতো চলছে। কলের মতোই উঠছে পড়ছে অবিরাম। এবার গর্জন গোঙানিতে পরিণত। চোখের মণি ঠেলে বেরিয়ে আসছে। আর ক'বার আঘাতের পরেই মূর্চ্ছা গেলেন।

যখন চেতনা ফিরে এল, আবার সেই ছোট্ট ঘরে নিজেকে ফিরে পেলেন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু এক ফোঁটাও খাবার জল নেই। এক কোণে গিয়ে বসলেন, যাতে দেয়ালে পিঠ না ঘসে যায়। বার বার মূর্চ্ছা গেলেন। ফি-বারেই মনে হোল, একটা ফুটন্ত হাঁড়ির বাষ্পের মতোই জীবন যেন ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মানুষকে নির্যাতন করাও যেন জাপানীদের কাছে এক কলাবিদ্যা। ওরা তাঁকে এক সুন্দর বিকেলে দ্বিতীয়বার নিয়ে এল বিচার কামরায়। এবার শুধু একজন হাকিম। সাধারণ ভদ্র পোষাক তার পরনে। ছোট্ট ঘর। হাল্কা সবুজ রং দেয়ালে। জানালাগুলো খোলা। সূর্যাস্তের সোনালী রঙ এসে পড়েছে জানালায় বসানো একটা জিরেনিয়ামের টবের উপর। জাপানীটা ছোট্ট একটা টেবিলের ধারে বসে আছে। টেবিল ঘন সবুজ মখমলের আস্তরণে ঢাকা। একটা পুরানো দিনের নক্সাওয়ালা ফুলদানি টেবিলে। ফুলও তাতে আছে। ফুলদানের পাশে দুটো সরাবের পেয়ালা আর ফিকে হলদে এক বোতল মদ।

চিয়েন যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন লোকটি বসে চীনা কবিতার বই পড়ছিল। চিয়েন কাছে আসতেই সে যেন চমকে গিয়ে বইখানা টেবিলের উপরে রেখে উঠে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি অতিথিকে বসতেও বললে। চীনা ভাষাটা তার বেশ সড়গড়, একটু বা পণ্ডিতি ঢঙের।

চিয়েন বসলেন। লোকটা এবার দুটি পেয়ালায় মদ ঢেলে একটি এগিয়ে দিয়ে বললে, আসুন!

তিনি হেলান দিয়ে পেয়ালাটা নিঃশেষ করে নামিয়ে রাখলেন। লোকটাও শেষ করলে। আবার দু পেয়ালা মদ সে ঢেলে নিলে। দ্বিতীয় পাত্রের পর সে হেসে বললে, ভুল, বড় ভুল হয়ে গেছে মিঃ চিয়েন! আশাকরি, আপনি ব্যাপারটা সেভাবে নেননি।

বৃদ্ধ চিয়েন দু পেয়ালা শেষ করবার পর একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। কথা বলবার তাঁর ইচ্ছে ছিলনা, তবু সরাবের নেশায় কথা বেরিয়ে এল, ভুল, কি ভুল হোল ?

জাপানীটি সোজাসুজি উত্তর দিলে না, মুখে তার ধূর্তের হাসি ফুটে উঠলো। সে আবার মদ ঢেলে নিয়ে এগিয়ে দিল। বুড়ো খাচ্ছেন, সে তাকিয়ে দেখছে। এবার সে বললে, আপনি কবিতা লেখেন ?

বৃদ্ধ চোখ বুজলেন।

আধুনিক না পুরানো ধরনের কবিতা ?

আধুনিক কবিতা লিখতে আমি জানিনা।

ভাল, ভাল! আমরা জাপানীরা পুরানো দিনের কবিতাই পছন্দ করি।

চিয়েন কি যেন ভেবে বললেন, চীনারাই আপনাদের পুরানো রীতিতে কবিতা লিখতে শিখিয়েছে। এখনো আধুনিক কবিতা আপনারা আয়ত্ত করতে পারেন নি।

লোকটি মৃদু হাসলো। তারপর অট্টহাসি। পেয়ালা তুলে নিয়ে বললে, আসুন একসঙ্গে পেয়ালা শেষ করে জাপান আর চীনের মিলনকে সার্থক করে তুলি। আমাদের সংস্কৃতি এক, ঐতিহ্য এক—আমরা তো একই জাতি। আমাদের গৌরব আর লজ্জাও এক। চার সমুদ্রের দুনিয়ায় আমরা সবাই ভাই ভাই। কিন্তু জাপানী আর চীনারা তো একই মায়ের সন্তান।

চিয়েন পাল্টা পেয়ালা তুলে নিলেন না, শুধু বললেন, ভাই! আপনারা আমাদের হত্যা করতে এসেছেন, আপনারা শত্রু ভাই! আপনি কি ঠাট্টা করছেন ?

ভুল, ভুল, লোকটি হাসলো, কিন্তু এ হাসি শুষ্ক। হাঁ, হাঁ, অনেকে এসে নানা গোলমাল শুরু করেছে। কিন্তু আমি এদের সঙ্গে একমত নই।

তারা তাহলে কে ?

তারা? জাপানীটি চোখ ঘুরিয়ে বললে। আমি আপনার বন্ধু। আমার পরামর্শ শুনলে এ বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। দেখুন, আপনি একজন পুরানো ধরনের মানুষ। একটু মদ খান, একটু বা কবিতা লেখেন। আপনার মতো লোককেই আমার পছন্দ। ওরা যদিও হাঙামা বাঁধাচ্ছে, তবু চোখ একেবারে বুজে নেই। যাকে তাকে আক্রমণ করে বসছে না। আপনাদের তরুণদের ওরা দেখতে পারে না। ওরা আধুনিক কবিতা পড়ে, আর লেখে। ওরা আসলে চীনাই নয়। আমেরিকা আর ইংলণ্ডের চালে পড়ে ওরা জাপানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আমি তো এই নির্যাতন থামাতে পারি না, আবার আপনাদের তরুণদেরও প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছিনা। তাই ঠিক করেছি, আপনাদের মতো মানুষদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করব। যদি আপনি আর আমি পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি, তাহলে আমরাই জাপান আর চীনের ভিতরে মিলন ঘটাতে পারবো। পরস্পরকে আমরা বুঝতে শিখবো, পরস্পরকে সাহায্যও করব। আপনি কি তাই চান? তাহলে আমাকে বলুন! আমি এ জন্যে সবকিছু করতে রাজি। আপনাকে খালাস করে দেবার ক্ষমতাও আমার আছে।

চিয়েন বহুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কি বললেন? জাপানীটি আবার পেড়াপীড়ি শুরু করলো। না, না, আপনাকে এখনি জবাব দিতে বলছি না।। খাঁটি চীনারা একটু ধীরে কাজ করেন। বেশ তো, আপনি ভেবেই দেখুন!

ভাববার আমার দরকার নেই। উপোস করা তো সহজ; কিন্তু নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা যদি হারিয়ে যায়, সে তো এক মহা সর্বনাশ।

আমার কথা ভাবুন তো! আপনাকে যদি বিনা শর্তে ছেড়ে দিই, আমি উপরওয়ালাকে কি বোঝাব?

সে আপনার সমস্যা। জীবন আমার প্রিয়, কিন্তু আমার চরিত্রের দৃঢ়তা তো প্রিয়তর।

চরিত্রের দৃঢ়তা! কিন্তু আমরা তো কখনো চীন দখল করতে চাইনি।

তাহলে লড়াই বাঁধলো কেন ?

সেও এক না বোঝার ভুল।

ভুল ? বেশ তো, শেষ অবধি এই ভুলই বজায় থাক। ইতিহাসের যদি সবখানিই মিথ্যে না হয়, একদিন আমরা জানতে পারব, এ ভুল কি।

বেশ তো ! জাপানীটি আস্তে আস্তে নিজের চিবুক চাপড়ে বললে, বেশ ! তার বাঁ চোখ কুঁচকে গেছে, ডান চোখ শুধু খোলা। তুমি না বলেছ, উপোস করা সোজা। বেশ তো, আমি উপোস করিয়েই তোমাকে রাখবো। তিনদিন তুমি কিছু খেতে পাবে না !

চিয়েন উঠে দাঁড়ালেন। মাথা ঘুরছে। টেবিলটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরলেন।

জাপানীটি হাত বাড়িয়ে বললে, এস, হাতে হাত দাও !

চিয়েনের মুখ ভাবলেশহীন। আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রক্ষী আবার তাঁকে থামালো। লোকটি বলে উঠলো, ভেবে আমাকে জানিয়ে বুড়ো। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই !

ছোট্ট কুঠরীতে ফিরে এসে চিয়েন মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে রইলেন। জাপানীরা নির্যাতন করতে জানে। আঘাতে আঘাতে দেহকে আগে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে, তার পরে শুরু হয় মনের নির্যাতন। চিয়েনের কেন যেন মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

সন্ধ্যায় এল আরো তিনজন বন্দী। তিরিশ থেকে চল্লিশের ভিতরে তাদের বয়েস। ওরা ভীত। ওদের মুখ দেখে মনে হয় ওরা নির্দোষী। যারা সত্যিই অপরাধী, তারা তো বিচারের রায়ের জন্য শান্ত ভাবেই প্রতীক্ষা করে বসে থাকে। তিনি তাদের কোনো প্রশ্ন করলেন না, শুধু বললেন, ওরা যতই অত্যাচার করবে, কথাটি কইবে না। ভয় পেওনা। দেশ এখন শত্রুর হাতে। আমাদের তো সইতেই হবে। মুখটি বুজে সয়ে যাবে। যদি সয়ে থাকতে পার, প্রতিশোধের পালা ঠিকই আসবে একদিন।

তিন দিন ধরে উপোস করে রইলেন চিয়েন। পালা করে বন্দী তিনজনের উপরও চললো নির্যাতন। ক্ষুধা, ব্যথা, দগদগে মাংস আর রক্ত তিনি চোখের

সামনে দেখলেন ; কখনো বা চোখ বুজে এল। তিনি মুখ বুজেই রইলেন। তখনো তিনি জানেন না তাঁর দোষ কি, জাপানীরা তাঁকে নুইয়ে ফেলতে কেন চায়। এমনি বিভ্রান্ত হয়ে কেটে গেল দিনের পর দিন। তিন দিনের উপবাসে মন স্বচ্ছ হয়ে এল, তিনি পেলেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর। জাপানীরা যদি বলে, তিনি অপরাধী, অপরাধ তাঁকে মেনে নিতে হবে। মুখে না মানলেও মানবে তাঁর রক্তমাংসের দেহ। জাপানীরা যে তাঁকে দলে টানতে চাইছে এ তো তাঁর অপরাধ নয়। কিন্তু অপরাধ হবে যদি তাদের দলে তিনি ভিড়ে যান। প্রাণ যায় সেওভি আচ্ছা, তবু চরিত্রের দৃঢ়তা তিনি বজায় রাখবেন। সব সমস্যা যেন এবার সোজা হয়ে এল। একটা নীতিকথা মনে মনে তৈরী করে ফেললেন। যদি বাঘের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করে কোনো লাভ নেই। শুধু ভাবতে হবে, লড়ব কি লড়ব না। তখন ভাবলে চলবে না, কেন বাঘ কামড়াতে চায়, কামড়ানোটা তার উচিত কি অনুচিত। শুধু ভাবতে হবে পশুটাকে কি করে আঘাত করা যায়।

সারা দেহে ক্ষত, গ্লানি, তবু মন তো সাফ। দেহ যেন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, বিরাট এক টুকরো স্ফটিকের মতো যেন মন।

জাপানীরা কিন্তু স্ফটিক-স্বচ্ছ মনের ধার ধারলো না, অত্যাচার চলতে লাগলো। তিনি যদি হীরেও হতেন, তাহলেও তারা তাঁকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিত।

নীরবে সয়ে গেলেন। যখন পারলেন না, চেঁচিয়ে উঠলেন। মুখে তার এক কথাঃ—মার, মার! আমি কিছু জানিনা! দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন। দাঁত আঘাতে আঘাতে খসে পড়লো। যখন মূর্চ্ছা গেলেন, ওরা ঠাণ্ডা জল ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো। জোর করে গলায় ঢেলে দিলে জল, কখনো বা এক ঘটি জলই ঢেলে দিলে। তারপর আবার গলায় আঙুল দিয়ে বমি করিয়ে ফেললে। বাঁশ-ডলা দিলে পায়ে। মাথায় আগুনের তাঁত লাগালে। সবই সইলেন চিয়েন। যখন জ্ঞান ফিরে আসতো, মনে হোত এ দিনগুলি বুঝি আর ফুরোবে না। আবার জ্ঞান হারালে দিনগুলি যেন মুহূর্তে কেটে যেত। নির্যাতনে-নির্যাতনে তাঁর ইচ্ছাশক্তি আরো দৃঢ় হয়ে উঠলো।

বিচারের প্রহসনও নিত্য-নতুন। জেরার ঢঙও আলাদা, নির্যাতনের উপায়ও তাই। জাপানীরা নিজেরাই জানেনা, কি তাঁর অপরাধ। কিন্তু গ্রেফ্‌তার করে ফেলেছে, এখন তো আর এমনি-এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া, তাঁর মতো বুড়ো মানুষকে নির্যাতন করে ওরা আনন্দই পায়। বেড়াল সব সময়েই ইঁদুর ধরে না, সুন্দর সুন্দর পাখীও ধরে। তারপর তাকে নিয়ে বহুক্ষণ ধরে খেলা করে। এও যেন তাই।

তাঁর কামরার সাথী বদল হচ্ছে। তারা ক'জন তাই তিনি জানেন না। যারা চলে যাচ্ছে, তারা কি ছাড়া পাচ্ছে না কোতল হচ্ছে, তাও তাঁর অজানা। মাঝে মাঝে বেহুঁশ হয়ে পড়েই থাকেন, যখন চোখ খোলেন, দেখেন ঘরের সাথী বদল হয়েছে। তাঁর অবস্থা দেখে, ওরা কথা বলতে সাহস পায় না। কিন্তু সামর্থ্য থাকলে তিনি তাদের উৎসাহ দেন, মনে করিয়ে দেন ঘৃণার কথা—প্রতিশোধের জন্য তৈরি হতে বলেন। এই তো তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি আর সবকিছু ভুলে গেছেন।

সেদিন সূর্য ডুবছিল পশ্চিম দিগন্তে। তিনি সবে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। চোখ খুলে দেখলেন, ফিটফাট একটি লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। চিয়েন আবার চোখ বুজলেন। লোকটি যেন কি প্রশ্ন করলে, তিনি কি উত্তর দিলেন মনে নেই। শুধু মনে আছে, লোকটি তাঁর হাত ধরলো। এ যেন সহানুভূতির ছোঁয়া। হঠাৎ মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল, হাতের উষ্ণ স্পর্শ মন ছুয়ে গেল। লোকটিকে বলতে শুনলেন, ওরা ভুল করে আমাকে গ্রেফ্‌তার করেছে। কিছুদিনের ভিতরেই আমি ছাড়া পাব। আপনাকে আমি বাঁচাতে পারি। আমি গুপ্ত সমিতির মানুষ। আপনাকে আমাদের দলে চাই! আসবেন? তারপরে কি হোল মনে নেই।

এলোমেলো স্মৃতি। একখানা খাতায় যেন বুড়ো আঙুলের টিপ সেই দিলেন। তারপর যখন আলো জ্বললো, তাঁকে একটা মস্ত ফটকের ভিতর থেকে ঠেলে বাইরে বার করে দেওয়া হোলো। তিনি পড়ে রইলেন বাইরে। আধ-ঘুমন্ত, আধ-জাগ্রত তাঁর অবস্থা।

হেমন্তের ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁকে বার বার জাগিয়ে দিয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার। ছায়ার মতো দু-একটা মানুষ চলেছে। দূরে আলোর সার। কুকুরের ঘেউ ঘেউ। সবটুকু শক্তি জড়ো করে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক

পা এগিয়ে গেলেন। যেন প্রাণপণে এগুচ্ছেন। হাত যখন অবশ হয়ে পড়ছে, শুয়ে পড়ছেন মাটিতে। তিনি মরেন নি, কিন্তু পা যেন আর নড়ে না। ঘুমিয়েই বুঝি পড়বেন। হঠাৎ তিনি একটা লোককে স্পষ্ট দেখতে পেলেন—প্রভাতপদ্ম কুয়ান!

জলে-ডুবি মানুষ যেমন কয়েক মুহূর্তের ভিতরে ছায়াছবির মতো জীবনের ঘটনার মিছিল দেখতে পায়, তেমনি তাঁরও মনে পড়লো সব কথা। প্রভাতপদ্ম কুয়ান তাঁর জীবনের এই জটিলতার জন্য দায়ী। কোথা থেকে এল শক্তি তিনি জানেনও না, মাথা তুলে পিছনে চেয়ে দেখলেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে হামাগুড়ি দিয়ে চললেন। প্রভাতপদ্ম তো পশ্চিমেই থাকে।

হামাগুড়ি দিয়ে চলেছেন তো চলেছেনই। কখনো বা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছেন। রক্ত আর ঘাম ঝরছে। ক্ষতমুখে ঘাম জমে টাটাচ্ছে। তবু এগুচ্ছেন। তাঁর চোখের সামনে ভাসছে শুধু কুয়ানের মুখখানা।

খুদে খাটালে যখন পৌছলেন, তখন তাঁর শক্তি নিঃশেষিত। নিজের ফটকের ভিতরে ঢুকে তিনি নির্জীবের মতো পড়ে রইলেন। বাড়ির ভিতরে যাবারও তাঁর শক্তি নেই। আবার যখন চেতনা ফিরে এল, তখনো প্রভাতপদ্মের মুখখানা ভাসছে তাঁর সুমুখে।

আস্তে আস্তে চারিপাশের সবাইকে চিনতে পারলেন, কি হয়েছিল তাও মনে পড়লো। রে সুয়ান, সেজ ওয়াঙ আর ন'গিন্নির উপর তিনি কৃতজ্ঞ। তাদের সেবাযত্নে একটু সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু একটা কথাই মনে তোলপাড় করছে। গ্রেফ্‌তারের সময় থেকে জেলখানা থেকে বেরুনো অবধি আদ্যোপান্ত ইতিহাস তিনি মনে করতে চেষ্টা করলেন। দিনর পর দিন এই ইতিহাস সংগ্রহে কেটে গেল। যত সুস্থ হচ্ছেন, ততো যেন মনে পড়ছে। হাঁ, হাঁ, কাহিনীতে আছে ফাঁক--কিন্তু আস্তে আস্তে কাঠমোটা গড়ে উঠলো মনে। একটা বিশেষ ঘটনা মনে পড়ে যায়, আর তিনি তা অন্য ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেন।

রে সুয়ান তো কতবার জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু তিনি বলতে নারাজ সে-ইতিহাস। শত্রুর কাছে কথা দিয়ে এসেছেন, তার জন্যে তো নয়। কাহিনী যেন তাঁর কাছে এক মহামূল্য সম্পদ। কাউকে দেখাতেও তিনি

চান না। কাহিনী কৃপণের মতোই তিনি লুকিয়ে রেখেছেন বুকে, আর রেখেছেন নিজের প্রতিশোধের পরিকল্পনা।

বন্দী জীবনের কাহিনীর শুধু একটা কথা মনে নেই। যে তাঁকে বাঁচালো সে কে? মানুষটি দেখতে কি রকম শুধু আবছা মনে পড়ছে। কিন্তু নাম-ধাম-পেশা কিছুই জানেন না।

ছেলে আর স্ত্রীর কথাও মনে পড়ে, কিন্তু তাঁরা যেন বন্দীজীবনেরই অঙ্গ। তাঁদের তিনি একই সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন, এতে তাঁর ঘৃণা আরো বেড়ে যায়।

তাঁর পরিকল্পনাকে তিনি কাজে লাগাবেন, কেউ তাঁকে রুখতে পারবে না। শুধু ছেলের বৌয়ের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ব্যবস্থা হয়েই যেত, কিন্তু সে গর্ভবতী। চিয়েন সব কিছু ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু নাতি বা নাতনি আসছে, একথা তো ভুলতে পারেন না। তিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন, কিন্তু বংশধরের কথা তো ভাবতেই হবে।

ঘৃণার আর এক প্রান্ত বুঝি ভালবাসা। দুটি প্রান্তকে মিলিয়ে তো বৃত্ত সৃষ্টি হতে পারে।

মেয়ে শোন! তিনি ডাকলেন।

ছেলের বৌ কাছে এল। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হাঁটতে পারবে মা? আমি তোমার বাবাকে ডেকে আনতে বলছি।

সে রাজি হোল। শরীর এখন তার ভালো। মুখের রঙ ফিরেছে। বুকের ক্ষত এখনো শুকোয় নি, কিন্তু সন্তান তার গর্ভে, তাই সে কাঁদবে না ঠিক করেছে।

সে চলে যেতে চিয়েন উঠে বসলেন। সেজ ওয়াঙ তাড়াতাড়ি চলে আসুন। কিন্তু ছেলের বৌকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে বারণ করা তো হোল না।- মনে সেই ভাবনা ঘুরছে। তারপর নিজের মনেই বললেন, ও নিজেই সাবধানী মেয়ে। আহা বেচারী। কয়েকবার বললেন কথাটা, তারপর হাসতে লাগলেন, ঠিক বুড়ি দিদিমার মতো করছেন। যে লোক প্রতিশোধ নেবে—সে তো এমন কোমল হয় না। অন্তত তাই তো মনে হয়।

ছেলের বৌ এক ঘণ্টা পরে ফিরে এল বাপকে নিয়ে। সেজ ওয়াঙের লাল মুখ ঘামে জবজবে। হাঁটার মেহনতে নয়, মেয়ের সঙ্গে এক'পা-দু'পা

করে চলায় তিনি চটে গেছেন। ঘরে ঢুকে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বাবা! ওর সঙ্গে এক দিনের পথ হাঁটলে তো রেগেই মরে যাব!

মেয়েটি কথা কম কয়, তবু বাপের সঙ্গে কথা কইতে তার তেমন বাধে না। তাই সে বললে, আমি তো জোরেই হেঁটেছি।

বেশ, বেশ, গিয়ে এখন একটু জিরোও মা, চিয়েনের চোখে দরদ ফুটে উঠলো। তিনি আগে ওকে এত ভালবাসতেন কিনা জানেন না। সে ছিল তাঁর ছেলের বৌ। শ্বশুর আর ছেলের বৌয়ের ভিতরে ছিল একটা আড়াল-আবডাল। পর্দা। কিন্তু এখন তো করুণাই হচ্ছে, আবার শ্রদ্ধাও দেখা দিয়েছে। আর সবাই মরুক, কিন্তু ওকে বেঁচে থাকতে হবে। ও আনবে আর এক জীবনকে। সে জীবন মৃতকে বাঁচাবে।

সেজ কর্তা, তোমার কাছে আমি একটু অনুগ্রহ চাইছি। টেবিলের নিচের ঐ বোতলটা বের করে নিয়ে এস না!

সেজ ওয়াঙ ভদ্রতার বালাই না রেখে বললেন, যেই একটু সুস্থ হয়েছ, অমনি মদ গিলতে বসে গেছ? যাহোক তিনি মদের বোতল আর দুটো পেয়ালাও নিয়ে এলেন। আধ পেয়ালা মদ ঢেলে চিয়েনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এর বেশি কিন্তু পাবে না!

চিয়েন অসহিষ্ণু। না, না, বোতলটা আমাকে দাও!

সেজ ওয়াঙ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পেয়ালা ভরে বেয়াইয়ের দিকে দিলেন এগিয়ে।

তুমি?

আমিও নেব?

চিয়েন মাথা নাড়লেন। নেবে বই কি। পুরো এক পেয়ালাই নেবে।

সেজ ওয়াঙ এক পেয়ালা মদ ঢেলে নিলেন।

চিয়েন পেয়ালা তুলে বললেন, খাই বেয়াই!

এই—একটু আস্তে আস্তে গেল! সেজ ওয়াঙ উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

না, না, এতে কিছু হবে না। দু-চুমুকে পেয়ালা শেষ করলেন। তলাটা দেখিয়ে দিয়ে তাঁর খাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেজ ওয়াঙ এরই মধ্যে শেষ করে ফেলেছেন। চিয়েন এবার চেঁচিয়ে উঠলেন,

সেজ কর্তা! তারপর হাতের পেয়ালাটা আছড়ে ফেললেন দেয়ালে। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো পেয়ালা।

সেজ ওয়াঙ চমকে উঠলেন, কি হোল বেয়াই?

আজ থেকে আর আমি মদ ছোঁব না! চিয়েন চোখ বুজলেন।

সেজ ওয়াঙ একটা টুল নিয়ে এসে বিছানার কাছে বসে বললেন, বেশ তো, ভাল কথা!

চিয়েন বেয়াইকে বসতে দেখে গড়িয়ে নিচে নেমে এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন।

সেজ ওয়াঙ ব্যস্ত হয়ে বেয়াইকে তুলতে গেলেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ একি হচ্ছে বেয়াই? তাড়াতাড়ি তাঁকে উঠিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিলেন।

সেজ কর্তা বোস! বোস! চিয়েন বললেন।

সেজ ওয়াঙ বসতে তিনি আবার বললেন, তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে। তোমার পায়ে ধরেছি বটে, কিন্তু তোমার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। ইচ্ছে করলে তুমি আমার কথা রাখতেও পার, নাও রাখতে পার।

আরে বেয়াই, বলই না! তোমার ব্যাপার তো আমারই ব্যাপার। সেজ ওয়াঙ তাঁর মস্ত পাইপটায় তামাক ভরতে লাগলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু তুচ্ছ নয়।

সেজ ওয়াঙ হাসলেন, আগেই ভয় পাইয়ে দিও না বেয়াই।

আমার ছেলের বৌ গর্ভবতী। আমি তার শ্বশুর, তাকে যত্ন করার আমার সামর্থ্য নেই। তাই আমি—

ও-বাপের বাড়ি যাক, এই তো তোমার কথা! হাঁ, তাই বল! তা এ ব্যাপারে এত হাত-পা ধরার ঘটা কেন? সে তো আমারই মেয়ে। কথাটা বলে ফেলে সেজ ওয়াঙ নিজেকে বুদ্ধিমান ঠাওরালেন।

না, তার চেয়েও জটিল ব্যাপার বেয়াই। সে ছেলে বা মেয়ে যা-ই প্রসব করুক, সেই শিশুকে চিয়েন পরিবারের হয়ে তুমি লালন-পালন করবে। আমি তোমার উপর আমার পুত্রবধূ আর বংশধরের সমস্ত ভার সঁপে দিচ্ছি। পুত্রবধূ এখনো যুবতী। তিনি যদি বিধবার জীবন না কাটাতে চান, তাঁকে আবার বিয়ে দিও। আমার কাছে জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। কিন্তু যদি তিনি

আবার বিয়ে করেন, সন্তানটিকে তোমার কাছেই রাখবে। তোমার নাতির মতোই পালন করবে। তার কাছে তুমি গল্প করে শোনাবে, কি করে তার দাদু, বাবা, আর কাকা মারা গেলেন। সেজ কর্তা, তোমার কাছে যা ভিক্ষা চাইছি, সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। কথা দেবার আগে ভেবে দেখ। যদি কথা দাও, তাহলে জানবে আমার পূর্বপুরুষরা তোমার কাছে চির-কৃতজ্ঞ হয়ে রইলেন। আর যদি কথা না দাও, আমি তোমাকে খারাপ ভাববো না। ভেবে দেখ, বুঝে-শুনে কথা দাও!

সেজ ওয়াঙ মাথামুণ্ডু কিছু ভেবে পেলেন না। চুপ করে পাইপ টানছেন। হিসেবে তিনি দড়, কিন্তু ভাবনায় তিনি কাণা। মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া, তার সন্তানকে পালন করা, এ কাজ তিনি করতে পারেন। কিন্তু এর পেছনে এত কি আছে, ভেবেই পাচ্ছেন না। বেশিক্ষণ বসে থাকাও তাঁর দায়, তাই বললেন,

তুমি কি করবে বেয়াই?

নেশা চড়ছে, চিয়েনের মুখখানা লাল। তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। আমার কথা ভেবো না। আমার নিজের পরিকল্পনা আছে। যদি মেয়েকে তুমি নিয়ে যাও, আমি ন'কর্তাকে ডেকে যে ক'খানা আসবাবপত্র আছে বেচে দিতে বলব। তারপর পিপিং ছেড়ে চলে যাব। হয়তো ছোট একখানা কামরা ভাড়া নিয়ে এখানেও একা থাকতে পারি। যাহোক, নিজের ব্যাপার আমিই ঠিক করে নেব। সে সব ঠিক করে রেখেছি।

তাই বলে কি তোমাকে নিয়ে আমার ভাবনা চলে যাবে বেয়াই? সেজ ওয়াঙের নেশা কেটে এসেছে। তুমিও আমার বাড়ি চল! পঞ্চাশ বছর তো পার হয়ে গেছে। আমারও প্রায় ষাট হোল। দুজনে নিরিবিলিতে বসে রোজ দু-এক পাত্তর টানবো, আরামে থাকবো।

সেজ কর্তা, সে সময় আর নেই। আমাদের পথ এখন আলাদা। যাহোক, এখন বলতো, আমার কথা রাখবে কি রাখবে না?

আমি কথা দিচ্ছি, কিন্তু তুমি কথা দাও, আমার বাড়ী যাবে?

চিয়েন মিছে কথাই বললেন। কষ্টই হোল, কিন্তু বলতে তিনি বাধ্য। তিনি জানালেন, বেশ তো, তাহলে এই কথা থাক। আমি আগে নিজের

পরিকল্পনা কাজে খাটিয়ে দেখি। যদি সুবিধে না হয়, তোমার ওখানে গিয়েই উঠবো।

সেজ ওয়াঙ মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তিনি উঠে পড়ে পাইপের ছাই ঝেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এবার ঢুকলেন গিয়ে মেয়ের ঘরে।

চিয়েন বসেই রইলেন। আর ছেলে আর স্ত্রীকে দেখতে পাবেন না। পুরনো বন্ধু আর পুত্রবধূর কাছেও শেষ বিদায় নিচ্ছেন। এখনো যে বংশধর ভূমিষ্ট হয়নি, তার কাছেও বুঝি বিদায় নিচ্ছেন। মদের বোতলটার দিকে তাকালেন। আর একটু খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু স্পর্শ করা তো নিষেধ। তাঁকে রাখতে হবে প্রতিজ্ঞা। পানপত্র তো চুরমার করে ফেলেছেন।

এবার ইয়ে-পণ্ডিত এসে ঢুকলেন ঘরে। তিনি এসেই বললেন, কি এখন বসতে পারেন? খুশিই হলেন ইয়ে-পণ্ডিত।

চিয়েন হেসে বললেন, শীগ্‌গীরই ছুটে বেড়াব পণ্ডিত।

বেশ, বেশ! ইয়ে-পণ্ডিত গলে গেলেন খুশিতে।

আগের চেয়ে ইয়ে-পণ্ডিতের চেহারাটা অনেক ফিরেছে। এখনো মুখে তেমন মাংস লাগেনি, তবু ফ্যাকাসে ভাবটা আর নেই। নতুন কামিজ গায়ে, নতুন জুতো তাঁর পায়ে। ভগ্নীপতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি কোটের পকেট হাঁতড়াচ্ছেন। অনেকক্ষণ হাঁতড়ে পনেরো ডলারের এক নোট বার করলেন। এবার হেসে নোটখানা রাখলেন বিছানার উপর।

ও কি? - চিয়েন জিজ্ঞেস করলেন।

আপনি কিছু কিনে খাবেন, ইয়ে-পণ্ডিত আস্তে আস্তে বললেন। তাঁর ভয়, ভগ্নীপতি বুঝি টাকা নিতে রাজি হবেন না। তিনি আমতা-আমতা করে বললেন—আমি একটা ভাল চাকুরী পেয়েছি কিনা। নতুন সরকার বসেছে।

কোন্ নতুন সরকার?

ইয়ে-পণ্ডিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, বোনাই, আপনি তো আমাকে জানেন! মেরুদণ্ডহীন মানুষ আমি নই। কিন্তু আট-আটটা ছেলেপুলে,

তার উপরে রোগা বৌ—কি করি বলুন তো? বসে বসে কি ওদের না খেয়ে মরতে দেখবো?

চিয়েন তাঁর দিকে তাকালেন।

তাই বুঝি জাপ-তাঁবেদার সরকারে চাকরা জুটিয়েছ?

ইয়ে-পণ্ডিত মুখ নিচু করে বললেন, আমি চাইতে যাইনি। লজ্জা আমারও আছে। ওরা নিজেরাই এসে বললে, ওদের সাহায্য করতে হবে। আমার বিবেক ঠিকই আছে।

চিয়েন আস্তে আস্তে নোটখানা তুলে ইয়ে-পণ্ডিতের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন। যাও, বেরিয়ে যাও! তোমার মত লোক আমার আত্মীয় নয়! যাও! তাঁর হাত কাঁপছে। তিনি হাত দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

ইয়ে-পণ্ডিত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বোনাই, আমরা—লজ্জায় বেদনায় কথা গলায় বেধে গেল। তিনি মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন।

চিয়েন তাঁকে ডাকলেন, দাঁড়াও!

ইয়ে-পণ্ডিত দাঁড়িয়ে পড়লেন। এখনো তাঁর মাথা হেঁট হয়ে আছে।

এস, ঐ তোরঙটা খোল! ওখানে দুখানা ছোট ছবি আছে। এক-একখানা তিন-চারশো ডলার দামে বিকোবে। এই আমার সবচেয়ে দামী পুঁজি। যাও, বিক্রী করে কিছু টাকা নিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে দাও! বাদাম ফেরি করতেই বা দোষ কি! শত্রুর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়ার চেয়ে ঢের ভালো!

চিয়েনের রাগ যেন কমে গেল। তিনি ইয়ে-পণ্ডিতকে তাঁর জ্ঞানের জন্য ভালবাসেন, তাঁর অভাবের কথাও জানেন। তাঁকে সাহায্য করতে পেরে খুশিই হলেন। যাও, নিয়ে যাও! আমি তো খেলনার মতো পুঁজি করে রেখেছিলাম। আর খেলনায় মন নেই। নিয়ে যাও!

ইয়ে পণ্ডিত নেবেন কি নেবেন না, ভাবতে সময় পেলেন না। তাড়াতাড়ি তোরঙ্গটা খুলে ফেললেন। ভিতরে ছবি নেই।

কি, পেলে না? চিয়েন শুধালেন।

ঐ জঞ্জালগুলো নিয়ে এস। বিছানা চাপড়ে বললেন, দেখি তো খুঁজে।

ইয়ে-পণ্ডিত সযত্নে তোরঙ্গ থেকে জিনিসগুলো একে একে একে বার করে বিছানার উপর রাখলেন। চিয়েন তন্ন তন্ন করে খুঁজে ছবি দু'খানা পেলেন না। এবার ছেলের বৌকে ডাকলেন, মা এদিকে এস তো!

স্বর শুনে সেজ ওয়াঙ মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন।

বিছানার উপর জিনিসপত্রের কাঁড়ি দেখে ওয়াঙ বললেন, কি ব্যাপার?

ছেলের বৌ ইয়ে-পণ্ডিতকে সম্ভাষণ করতে যাবে, এমন সময় শ্বশুর বলে উঠলেন, ছবি দুখানা ছিল, কোথায় গেল?

কোন্ ছবি?

তোরঙ্গে যে ছিল, খুব দামী ছবি!

ছেলের বৌ অবাক হয়ে বললে, আমি তো জানি না বাবা।

ভেবে দেখ মা! কে তোরঙ্গ খুলেছিল?

সেজ ওয়াঙের মনে পড়লো। কাগজের একটা বাণ্ডিল ছিল না?

হাঁ, হাঁ। কাগজের বাণ্ডিলেই ছিল ছবি দুখানা। বাঁধানো হয়নি বলেই অমনি রেখেছিলাম।

বেয়াই, তোমার বড় ছেলের কফিনের ভিতরে সেই বাণ্ডিলটা পুরে দেওয়া হয়েছে।